প্রতিসর্গ

(গল্প সম্ভার)

প্রথম প্রকাশ ঃ   ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

প্রকাশনায় ঃ   প্রণতি সরকার
ব্লক-সি, ফ্লাট-৬ পি-৫৩, কাজী নজরুল ইসলাম এভিঃ
(সি. আই. টি. স্কীম ৭-এম), কলি-৫৪

সম্পাদক ও } নন্তু সরকার
সংকলক } জয়ন্ত রসিক

সহযোগিতায় ঃ   ত্রিদিব কুমার বর্মন, মধু মিশ্র

মুদ্রণে ঃ   তরুণ প্রেস
৩৮/৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলি-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ   অলকময় দাস

স্বর্গত সাহিত্যিক

রুদ্রাক্ষ ব্রহ্মচারীর (বিধান ভট্টাচার্য্য)

স্মৃতির উদ্দেশে—

প্রতিসর্গ ঃ সম্পাদনা—নন্তু সরকার ও জয়ন্ত রসিক

যে সব লেখক-লেখিকা সুপ্রতিষ্ঠিত নন, অথচ যাঁদের অনেকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে তাঁদেরই কয়েক জনের ছোট গল্পের সংকলন। তাঁদের গল্পে হয়তো পরিণত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বেশি জায়গায় পাওয়া যায় নি, কিন্তু বেশ কয়েক জনের লেখায় জীবন সমস্যা সম্পর্কে গভীর সচেতনতার নিদর্শন রয়েছে এবং বর্ণনায়, চরিত্রচিত্রণে অনেকেই শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য বেশ কয়েকটি গল্পে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য এবং বাঁধুনির শিথিলতা রয়েছে। কোথাও তিক্ত ব্যঙ্গ এবং হতাশার সুর থাকলেও জীবন সম্পর্কে আস্থা, প্রত্যয় ও আশার সুরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্বনিত হয়েছে। জীবনের ভালো মন্দ, আলো ও অন্ধকারের অনেক দিকই গল্পগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কোথাও ফর্মুলা বাঁধা জীবন ও তার পরিণতি দেখানো হয়নি, কোনো তাত্ত্বিক মতবাদ প্রচার কোথাও প্রধান হয়ে ওঠেনি। বিচিত্র জীবনের রঙ, ছবি, চেহারাই গল্পগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। অধিকাংশ গল্পই আকারে খুব ছোট, সেজন্য গভীর বিশ্লেষণ ও চরিত্রের বিস্তার ও জটিলতা দেখানোর সুযোগ হয় নি। গল্পগুলি সেজন্য অনেক ক্ষেত্রেই ঝলকিত কয়েকটি ছবি হয়ে উঠেছে।

গল্পগুলির মধ্যে তরুণ মনের ভাবনা, যন্ত্রণা, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান পারিবারিক জীবনের জটিলতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে চিরাচারিত মূল্যবোধের সংঘর্ষ, অর্থনৈতিক সমস্যার ফলে প্রিয় সম্পর্কের মধ্যে ফাটল, একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের ক্ষয়, পণ প্রথার নিষ্ঠুরতা, অর্থের অপরিমিত লোভ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে দয়াহীন, মায়াহীন মানুষের নৃশংসতা আবার অন্যদিকে বিরল হয়ে এলেও প্রেম, ত্যাগ ও সততার মহিমা বিচিত্র গল্পগুলিব মধ্যে ফুটে উঠেছে। মনুষ্যেতর প্রাণী ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভলোবাসার প্রীতিকর সম্পর্কও কয়েকটি গল্পে বর্ণিত হয়েছে। গ্রাম-কেন্দ্রিক গল্পগুলিতে মাটির সঙ্গে নিবিড় যোগ। সহজ সুখ ও দুঃখের ছোট ছোট আবর্ত, নিপীড়িত মানুষের অসহায় বেদনা ইত্যাদি চিত্র রয়েছে। মধ্যবিত্ত মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের আলেখ্যই গল্পগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। সেজন্য ছোট ও ঘরোয়া পরিবেশ। সাধারণ লোকের ব্যক্তিগত জীবনের অবস্থা ও মানসিকতাই গল্পগুলির মধ্যে উপস্থাপিত। বহু মানুষের ভিড়, উচ্চস্তরের মানুষের অর্থ প্রতিপত্তির সংঘাত, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের মদমত্ত রূপ, চমকপ্রদ ঘটনার আড়ম্বর গল্পগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে না।

সমাজের বহু পুরাতন ও বহুনিন্দিত পণপ্রথা এখনো যে অতিমাত্রায় বর্তমান তা কয়েকটি গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। নন্তু সরকারের সবলায় আত্ম-মর্যাদায় উদ্দীপ্ত কন্যার এই পণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বরের বাবার নিষ্ঠুর নীচতা ও বরের লুব্ধ ক্লৈব্যের একটি চিত্র পাওয়া যায় গল্পটিতে। ধূসর গোধূলিতে চায়না রায় দেখিয়েছেন কন্যা সন্তান এখনো আমাদের পরিবারে কিভাবে অবাঞ্ছিত। কন্যা-সন্তান প্রসব করলে মাতার যে

কোনো মূল্যই থাকে না তাও গল্পটির মধ্যে উদ্‌ঘাটিত। আকাঙ্ক্ষা গল্পটির মধ্যে সেই পণ প্রথার সমস্যাই প্রতিফলিত। দীপ্তি দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন আজ শাশুড়ী হয়ে যিনি বৌয়ের উপর অন্যায় চাপ দিচ্ছেন তিনি যখন বৌ হয়ে এসেছিলেন তখন তো একই সমস্যার মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছিল।

স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবনের অনেক প্রশ্ন, অনেক জটিলতা, মনস্তত্ত্বের দুজ্ঞের্য় রহস্য কয়েকটি গল্পে বর্ণিত। এখনকার নরনারীর মধ্যে দেহ ও মনের মিল নেই, তাই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সীমার দেহ দিতেও আপত্তি নেই। উজ্জ্বলের সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্নে দেহকে পণ্য করতে আপত্তি নেই। এটাই জয়ন্ত রসিকের সেলাই মেসিনের মধ্যে বর্ণিত। কিছুটা স্থূল ও রোমাঞ্চকর অশোকা পাঠকের জবানবন্দী গল্পটি। স্ত্রীর অর্থলালসা ও সুখসম্ভোগের নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে অধ্যাপক ও পরে কনট্রাকটার স্বামী স্ত্রীকে খুন করে। শঙ্কর প্রসাদ দাশগুপ্তের প্রতিঘাতে আজকের যুবকদের ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতার শোচনীয় অভাবের কথাই বলা হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তির সমঅস্তিত্ব কয়েকটি গল্পে ফুটেছে। ত্রিদিব কুমার বর্মনের অমিলে মিল গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালোবেসেও পূর্ব-প্রণয়ের স্মৃতি মনের মধ্যে লালন করছে। বিউটি মজুমদারের অনঙ্গপ্রেম, রূঢ় বাস্তবরসের অস্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক গল্প। পার্বতী স্বামীর সন্তান আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারেনি। কিন্তু তার মনপ্রাণ, সেবা-যত্ন সবই স্বামীকে দিয়েছে। ক্যান্সারে স্বামী পুরুষাঙ্গহীন হ'য়ে পড়েছে। তাতে তার একটা সান্ত্বনা, স্বামীকে তো ভালোবাসার নীড়ে বাঁধতে পারবে। সেই আশাও তার নিষ্ফল হ'ল। সব সমস্যার উপরে ভালোবাসার জয়ও দেখানো হয়েছে কোনো কোনো গল্পে। দোঁহা লাগি দুঁহু বিউটি মজুমদারের একটি উপভোগ্য ঘনীভূত রসের গল্প। ইন্দ্রানী তার বাক্‌পটু সুদর্শন স্বামীকে প্রতিষ্ঠিত করবার সব রকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে যখন বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে সেই মুহূর্তে আবার সেই বাক্‌পটু স্বামীর করুণ আবেদনে তার কাছে ধরা দিয়েছে। অজন্তা ও পলাশ পরস্পরকে ভালোবাসে। অজন্তা কয়েকটি নর-পশুদের দ্বারা বলাৎকৃত হবার পরেও সেই ভলোবাসার জয় কি ভাবে হয়েছে তা মধু মিশ্র এক ফোঁটা শিশির গল্পে দেখিয়েছেন। রীণা দে'র হৃদয়ের দাগ গল্পে বিবাহ ও প্রেমের অমিল দেখানো হয়েছে। সুশিস্মিতা গল্পের মধ্যেও প্রমত্ত মুহূর্তে ভালোবাসার ব্যাভিচার বর্ণিত হয়েছে। অস্বস্তির মধ্যে বিবাহিত জীবনের আগেকার স্মৃতিচারণ রয়েছে।

সব চেয়ে জঘন্য ও নিষ্ঠুর মানুষের চিত্র রয়েছে সুনীল পালের শকুন গল্পে। অর্থ ও সুখ সম্ভোগের বিকৃত লোভ। মা-বাবার প্রতি নিষ্ঠুরতম আচরণ, ধূর্ততা ও কপটতার শয়তানী ব্যবহার অতি বাস্তব রূপ পেয়েছে গল্পটিতে।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের ডাঙামাটি রাঙা মনে বাঁকুড়ার ভাষাকে সনার কৃষিজীবনের সমস্যা ও তার সমাধানের চিত্র আঁকা হয়েছে। স্টোনম্যানের ভয়ে যে গ্রাম্য লোকটি ভীত তাকেই স্টোনম্যান ব'লে ধ'রে নিয়ে গেল শাঙাল খুরুপু গল্পে। একটি ঝাঁকামুটের সততার চিত্র ফুটেছে মহাত্মা গান্ধী রোডের মহাত্মা

গল্পটিতে। আগাছা ভেবে বাবা যার সব আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই কিভাবে একটি ফলবান বৃক্ষে পরিণত হল তার পরিচয় পাওয়া গেল সুজিত মুখোপাধ্যায়ের আগাছা গল্পে। ঝাড়বাতির কান্নার মধ্যে সুন্দর বর্ণনা ভঙ্গিতে ঝুপড়ীর একটি প্রাণময়ী মেয়ের কান্নার চিত্র দেওয়া হয়েছে।

মানুষের সঙ্গে একটি পাখীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ফুটেছে তিতুর মধ্যে। তিন কিশোরীতে তিনটি বিড়ালের কৌতুকময় কাহিনীর বেদনাজনক পরিণতি। প্রভু-ভক্ত কুকুরের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা মানুষের উপরে স্থান পেয়েছে কেদার গল্পে। বন্ধু-বিয়োগের মধ্যে গাছের প্রতি মানুষের স্নেহ বেদনাসিক্ত ভাষায় রূপ পেয়েছে।

সব গল্পের মধ্যেই জীবনের কোনো রঙীন অনুভূতি কোনো কান্নাভেজা মুহূর্ত, ক্ষণিকের মধ্যে কোনো স্থায়ী আবেগ ধরা পড়েছে।

—অজিত কুমার ঘোষ

: সূচীপত্র :

সবলা

নন্তু সরকার

"বর এসে গেছে।'

খবরটা শোনামাত্রই সর্বাণী শঙ্খ নিয়ে সদর দরজার দিকে ছুটল। তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেল বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা। বরকে বরণ করে ঘরে আনা হল। এদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে সৌদামিনী দেবী বিয়ের জোগাড়ে মনোনিবেশ করলেন। কারণ, লগ্ন সন্ধ্যা সাতটা থেকে সোয়া আটটার মধ্যে। কনে ইন্দ্রাণীর মামা বিপুলবাবু অতিথিদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত।

চা-জলখাবারের পর্ব মিটে গেলে বরের বাবা কালীপদ নন্দী সৌদামিনী দেবীকে ডেকে বললেন—এই যে দে-গিন্নী, ছেলে বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি গুলো একবার দেখিয়ে-বুঝিয়ে দিন।

গয়নাগাটির সঙ্গে নগদ টাকার কথা উঠতেই সৌদামিনী মনে মনে প্রমাদ গুণলেন। কারণ, ছেলে শশাঙ্ক বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান হবে না। জামাইয়ের ঘড়ি-আংটি আর মেয়ের হাতে-কানে-গলায় এই তিন পদ গহনা সহ নগদ কুড়ি হাজার টাকা পণ দিতে হবে। কিন্তু নগদ পুরো টাকা এখনও জোগাড় হয়নি। দুপুরের পর পরই শশাঙ্ক শেষ চেষ্টায় বেরিয়ে এইমাত্র খবর পাঠিয়েছে—টাকার ব্যবস্থা হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টাকা নিয়ে ফিরছে। চঞ্চল হয়ে সৌদামিনী কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঘর-বার করলেন। অতঃপর ক্লান্ত পদবিক্ষেপে পাশের ঘরে ঢুকলেন। এ ঘরে মেয়েরা ইন্দ্রাণীকে যত্ন সহকারে সাজিয়ে তার রূপের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুলছে।

সৌদামিনী একমুহূর্তে দাঁড়িয়ে মেয়েব রাজ-রাজেশ্বরী রূপ দেখে মনে মনে গর্বিত হলেন। পর মুহূর্তে মনে মনেই বললেন, হায়রে বিয়ের বাজারে এমন মেয়েরও কদর নেই, যদি বাবা-মায়ের অঢেল পরিমাণে টাকা না থাকে! অতঃপর সসংকোচে উচ্চারণ করলেন - মা ইন্দু, গয়নাগুলো পরে ফেলেছিস? একবার খুলে দিবি মা?

ইন্দ্রাণীব অবাক হবার পালা—কেন?

—ওরা একবার দেখতে চায়।

—দেখতে চায়! তার মানে?

এক ছাত্রীর মা সুপর্ণা বৌদি ইন্দ্রাণীর চিবুকে পাউডারের প্রলেপ বুলিয়ে মুচকি হেসে বলল—তার মানেটা বুঝলে না? কোন্‌টা আসল দিলে, কোন্‌টা নকল দিলে, সোনার মধ্যে কতটা খাদ্ মেশানো হয়েছে এ সকল পরখ করে—যাচাই করে নেবে না?

কথাটা শোনামাত্রই ইন্দ্রাণীর মনটা বিষিয়ে গেল। সে ছোট বোন সর্বাণীকে ধমক দিল—থাক্ আমাকে আর সঙ সাজাতে হবে না! দিদির কথা শুনে সর্বাণী চন্দনের রেকাবীখানা মাটিতে নামিয়ে রাখল। মামী বিন্দুবাসিনী কাছে এসে ইন্দ্রাণীর গায়ে হাত বুলিয়ে বোঝালেন—মা ইন্দু, অমন করতে নেই, বিয়ের আগে এসব হয়েই থাকে, এতে দোষ ধরতে নেই।" মামীর কথায় ইন্দ্রাণীর মন কিছুটা শান্ত হতে সে একে একে গয়নাগুলো খুলে মায়ের হাতে দিল। সৌদামিনী সেগুলো হাতে নিয়ে ধীর পায়ে পাশের ঘরে গিয়ে কালীপদবাবুর সম্মুখে রাখলেন।

কালীপদবাবু প্রথমে গলার হারটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—এ আটআনা না ছ'আনা ওজনের? কালীপদবাবুর শ্যালক অধরবাবু মন্তব্য করলেন—"ওই আনা ছয়েকেরই হবে।"

দু'জনের মন্তব্য শুনে সৌদামিনী যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে উত্তর দিলেন—নন্দীমশাই, এই কি আপনাদের আন্দাজ?

প্রত্যুত্তরে নন্দী মশাই বললেন—ছ'আনা নাহোক আট আনা ; এর এক তিল বেশি হবে না তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

—না নন্দীমশাই, আপনার আন্দাজ ঠিক হলো না। আমরা বড়লোক নই, আমাদের দেবার সাধ্যিও কম ; তাই বলে মিছে কথা বলব কেন ? গয়নার দোকানে ওজন করিয়ে দেখবেন ওতে পুরোপুরি এক ভরি সোনাই আছে।

—যাক হারের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু এই কানপাশা ? এত হাল্কা কানপাশা আমি বাপের জন্মে দেখিনি, আপনার মেয়ে দুদিনও পরতে পারবে না।

—কি করি বলুন, আমাদের ইচ্ছে থাকলেও সাধ্যি কোথায় ? হাল্কা হলেও ওতে তিন আনা সোনা আছে···

—আচ্ছা কানপাশাও না হয় ধরছি না—কিন্তু চুড়ি ক গাছা ? এতে সোনাটোনা কিছু আছে তো ? নাকি শুধুই ব্রোঞ্জের উপর রঙ করা ?

—না নন্দীমশাই অমন মিথ্যে সন্দেহ করবেন না। দু আনা করে আটগাছা চুড়িতে মোট এক ভরি সোনা দেওয়া আছে।

—কি আছে আর নেই সে এখন কি করে জানব ? পরে দেখা যাবে দু'মাস যেতে না যেতেই রঙ চটে গিয়ে ওর আসল রূপ বেরিয়ে পড়েছে !

—না নন্দীমশাই, তেমনটি হবে না, আমরা পরিচিত বিশ্বাসী দোকান থেকে গয়না গড়িয়েছি ; ওরা ফাঁকি-যুকির কারবার করে না।

—ওদের আর দোষ কি, কম চিনি দিয়ে কি বেশী মিষ্টি আশা করা যায় ? যাক্ এসব কথা, মেয়ের হাতের বালা কই ?

—বালা ? বালা দেব কোথা থেকে বলুন ? বালা দেবার কথা তো কিছু হয়নি··· ··

—না দেবার কথাও তো কিছু হয়নি। দলে আপনার

মেয়েই পরবে, হাতে মানাবেও বেশ। যান, বালা জোড়া নিয়ে আসুন।

নন্দীমশাইএর কথা শুনে সৌদামিনী অথৈ জলে পড়লেন। মুখে বললেন—সাধ্যি থাকলে কি আর না দিয়ে পারতাম বলুন? উনি মারা যাবার পর আমাদের কি ভাবে দিন কাটছে তা যদি জানতেন ·· ····

কালীপদবাবু মিষ্টি হেসে বললেন—দে মশাই কি আর কিছু না রেখেই মারা গেছেন? তাহলে এতকাল চাকরি করে তিনি কি করলেন? তিনি নাইবা দিলেন—আপনার মেয়ে তো এতকাল চুটিয়ে টিউশানি করে, সেলাই করে কত টাকা কামিয়েছে, এক জোড়া বালা কি আর করে নেয় নি? আচ্ছা আপনার ছোট মেয়ের হাতে যে বালা জোড়া দেখলাম তা কি ঝুটো? জিনিষপত্তর যা দিয়েছেন সব তো মিউজিয়ামে রাখার মতো!

এই সময় অধরবাবু যোগ করলেন—খাট বিছানা যা দিয়েছেন তা তো স্বর্গযাত্রীর উপযোগী!

কথাটা শুনে সৌদামিনীর বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। দশ বছর আগে বড় মেয়ে চন্দ্রাণীর বিয়ের রাতের স্মৃতি সমূহ মানস-পটে ভেসে উঠল। তিনি চোখ বন্ধ করে দম নিলেন। মানসিক অবসাদে ভেঙে পড়লেন।

২

ইন্দ্রাণীর বাবা শচীন্দ্রনাথ দে রাজ্য সরকারের প্রেস বিভাগে কম্পোজিটর পদে চাকরি করতেন। চারটি সন্তানের লেখাপড়া ও সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে তিনি তেমন কিছু সঞ্চয় করে যেতে পারেন নি। সরকারী 'লোন' নিয়ে দু'খানা ঘর বিশিষ্ট এই বাড়িখানা করতে গিয়ে তিনি আরও ধার-দেনায়

জড়িয়ে পড়েছিলেন। এর ধকল সামলাতে মাঝে মাঝেই তাকে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার করতে হয়েছে। ফলে যে তলানিটুকু পড়েছিল তা নিতান্তই সামান্য। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন সরকারী লাল ফিতের ফাঁস ছিঁড়ে তাঁর প্রাপ্য পেন্সনটুকু চালু হতে পারেনি। তারপর হঠাৎ একরাতে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে পরলোক গত হওয়ায় শুরু হবার মুখে পেন্সনটি বন্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর সৌদামিনীর বিধবা পেন্সনটুকুও চালু হয়নি। স্বামীর গ্রাচুইটি এবং ছুটি বিক্রয়ের দরুণ যে টাকা পেয়েছিলেন তা সবই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। একমাত্র ভরসা কমুটেশনের দরুণ এবং বকেয়া পেন্সন বাবদ কিছু টাকা যা সরকারের ঘরে জমা রয়ে গেছে। পরিবারের বড় ছেলে শশাঙ্ক বি-কম পাশ করে পেপারমিলে চাকরি পেয়েছিল। কপাল মন্দ। কিছুদিন যেতে না যেতে সে মিল বন্ধ হল তো হলই—তা আর খুলল না। এরপর শশাঙ্ক স্থানীয় জুটমিলে বদলি ওয়ার্কার হিসাবে ঢুকেছিল। কিন্তু মাস তিনেক যেতে না যেতে সে মিলের দরজায়ও তালা ঝুলল। এখন সে গোটা তিনেক টিউশানি করে। মেয়ে ইন্দ্রাণী বি-এ পাশ করার পর অবসর বিনোদন না করে সেলাই-এর ডিপ্লোমা নিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে দাদার মতো টিউশানি ধরেছিল। টিউশানির টাকার একাংশ সঞ্চয় করে সে নিজেই সেলাই মেশিন কিনে ঘরে বসে পাড়ার মেয়েদের এটা-ওটা ছোটখাট অর্ডার সেলাই করে যৎসামান্য উপার্জন করে এবং সবটাই মায়ের হাতে তুলে দেয়। শশাঙ্ক আর ইন্দ্রাণীর সামান্য উপার্জনে সৌদামিনীর সংসার খুঁড়িয়ে চলছে। এদিকে স্বাস্থ্যবতী মেয়ে ইন্দ্রাণীর বয়স বেড়ে যাচ্ছে অনুভব করে মায়ের চোখে ঘুম নেই। তিনি মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভেবেছিলেন সামান্য গহনা এবং নগদ যা ঘরে আছে তার সঙ্গে স্বামীর প্রাপ্য টাকাগুলো পেলে

কোনক্রমে ইন্দ্রাণীর বিয়েটা হয়ে যাবে। তাই আশায় আশায় তিনি শশাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে গত দেড়বছর যাবৎ স্বামীর অফিস, ব্যারাকপুর ট্রেজারী এবং স্থানীয় ব্যাঙ্কে বহুবার হাঁটাহাটি করেছেন এবং আশ্বাসও পেয়েছেন কমুটেশনের টাকাটা শীঘ্রই ব্যাঙ্কে চলে যাবে। এদিকে ইন্দ্রাণীর বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে। বিয়ের আর মাত্র দিন তিনেক বাকী তখনও কোন টাকা ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্টে জমা না পড়ায় সৌদামিনীদেবী ফাঁপড়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে শশাঙ্ক ধার-দেনা করে কেনাকাটা শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু নগদ কুড়ি হাজার টাকার কোন ব্যবস্থা করা যায়নি। শশাঙ্কর মামা বিপুলবাবু আটহাজার টাকা জোগাড় করেছেন। কিন্তু এখনও বাকী রয়ে গেছে বারোহাজার এবং আনুসঙ্গিক আরো কিছু। উপায়ন্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ক বাড়ির দলিল বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে তৎপর হয়েছে।

৩

খানিক আগে সংবাদ এসেছে শশাঙ্ক টাকার জোগার করেছে। সঙ্গে নিয়ে ফিরতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। লগ্নের সময় যাতে অতিক্রম না হয়ে যায় এই ভেবে বিপুলবাবু এসে কালীপদবাবুকে বললেন—নন্দীমশাই, যদি অনুমতি করেন তাহলে বরকে ছাদনাতলায় নিয়ে যেতে বলি। পুরুতমশাই তাড়া দিচ্ছেন।

কালীপদবাবু বিরক্ত ভাবে উত্তর দিলেন—দাঁড়ান মশাই, আগে দেনা-পাওনার ব্যাপারটা মিটে যাক!

—গয়নাগাটি তো দেখলেনই—যা যা কথা ছিল সবই দেওয়া হয়েছে। নগদ টাকাটাও কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝে পাবেন, এ লগ্ন ধরতে না পারলে……

—বেশ তো, টাকাটা আগে মিটিয়ে দিন—তারপর বরকে যেখানে খুশি নিয়ে যান, পাঁচ-দশ মিনিটের তো মামলা !

—নন্দীমশাই, আপনাকে খুলেই বলি, জামাইবাবুর কমুটেশনের টাকাটা এখনও হাতে পাওয়া যায়নি, সম্ভবত আগামী সপ্তাহে পাওয়া যাবে। এটা নিতান্তই দিদির দুর্ভাগ্য। আমাদের হাতে এখন আটহাজার আছে, বলেন তো এখনই দিতে পারি। বাকী বারো হাজারও জোগাড় হয়ে গেছে—শশাঙ্ক টাকা নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।

—না মশাই, একটি পয়সা বাকী থাকতে আমি ছেলের বিয়েতে অনুমতি দেব না। আগেই বলে দেওয়া হয়েছে আমাদের কি কি চাই, সাধ্য না থাকে আপনার দিদি কথা দিলেন কেন ?

তর্ক করলে কথা বেড়ে যাবে, সময় অতিক্রম হবে। লগ্নটা যাতে বয়ে না যায় এই উদ্দেশে বিপুলবাবু পুনরায় হাত জোড় করে অনুনয় সহকারে বললেন—নন্দীবাবু, আপনাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি এ সময় 'না' করবেন না, বিয়ে বসে যাক এরপর আমরা তর্ক-ঝগড়া করার যথেষ্ট সময় পাব। আমাদের উপর বিশ্বাস রাখুন, আপনাকে আমরা এক নয়া পয়সা ঠকাব না। অতঃপর তিনি পাত্র সন্দীপনকে অনুরোধ করলেন—চলো বাবা, আর মাত্র মিনিট কুড়ি সময় হাতে আছে।

সন্দীপ নির্লিপ্ত উত্তর দিল—আমাকে নয় আগে বাবাকে রাজী করান, উনি বললেই আমি তৈরি আছি।

—বাবাজী এতক্ষণ সবই শুনেছ, তুমি তোমার বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলো। তোমরা এ যুগের উদার স্বাধীন যুবক, তোমাদের মতের মূল্য আছে, একটু বুঝিয়ে বললেই তোমার বাবা রাজী হবেন। বাবা, তুমি এ বাড়ির জামাই হতে চলেছ, জামাই পুত্রের সমান—তোমাকে কি আমরা ঠকাতে পারি বাবা ?

বাবা উঠে এসো, আমরা শুভ কাজটা শুরু করি। বাবা তোমার উপরে আমাদের অনেক আশা-ভরসা…

সন্দীপ বিপুলবাবুর কথার কোন উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মজা উপভোগ করতে লাগল। সে কিছুতেই বিপুল-বাবুর কথার উপর ভরসা রাখতে পারে না—যা পাওয়া যায় এই শুভ লগ্নেই হাতিয়ে নিতে না পারলে··

এই সময় প্যান্ডেলের মধ্যে বরযাত্রীদের খাবার জায়গায় একটা সোরগোল শোনা গেল। সৌদামিনী দেবী এবং বিপুলবাবু তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটে গেলেন।

৪

রাত্রি প্রায় আটটা বাজে। সন্ধ্যার পর থেকে কনে রূপী ইন্দ্রাণী কার্যত গৃহবন্দি। ঘণ্টাখানেক আগেই তার সাজগোছ হয়ে গেছে, এতক্ষণ ধরে তার বিবাহিত বান্ধবীরা দাম্পত্যজীবনের নানা স্থূল-রসালো ঠাট্টা ইয়ার্কিতে জর্জরিত করেছে। বলা বাহুল্য এ সকল উপদ্রব সে পরম কৌতুকেই উপভোগ করেছে। ভাবী স্বামী সন্দীপকে তার যে খুব একটা পছন্দ হয়েছে তা নয়, কিন্তু নারী জীবনে পছন্দ অপছন্দের কোন মূল্য নেই—অন্তত বিবাহের ক্ষেত্রে। ভারতবর্ষে শতকরা নিরানব্বইটি মেয়েকেই বাধ্য হয়ে অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। পাত্র রাজী হলেই পাত্রীর বাবা-মা বর্তে যায়। সন্দীপ শিক্ষা বা চেহারায় ইন্দ্রাণীর সমতুল্য নয়—তবে সে পুত্র সন্তান এবং সরকারী চাকরি করে, এগুলিই তার গর্বের মূলধন। যাই হোক মনকে এক রকম বুঝিয়ে সুজিয়ে ইন্দ্রাণী রাজী করিয়েছে এবং ভাবী স্বামী সন্দীপকে ঘিরে তার অন্তর্জগতে প্রণয়ও দাম্পত্য সুখের নানা চিত্রমালায় সাজিয়ে রাখছে। প্রতীক্ষায় ছিল কতক্ষণে বিবাহের আনুষ্ঠানিক

পর্ব সমাধা হয়ে প্রিয়তমের সান্বিধ্য লাভ করবে। কিন্তু লগ্ন শুরু হবার এক ঘণ্টা পরেও যখন ছাদনাতলায় যাবার ডাক পড়ল না তখন এক অজানা আশঙ্কার কালো মেঘ তার মনের আকাশ আবৃত করে ফেলল। আর একটা ব্যাপারেও তার মনটা ভালো নেই। সে জানত বাবার অফিসের টাকায় তার বিবাহের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে মামী বিন্দুবাসিনীর কথা থেকে জানতে পেরেছে, টাকাটা পাওয়া যায়নি। দাদা বাড়ি বন্ধক রেখে তার বিয়ের খরচ—পণের টাকা সংগ্রহে গেছে। হঠাৎ ইন্দ্রাণী মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার ভাবনার গতি বাঁক নেয়। এখনও ছোট বোন সর্বাণী কলেজে পড়ছে। দাদার চাকরি নেই, মা অসুস্থ, তাঁর পেন্সন চালু হয়নি। এমত অবস্থায় ধার-দেনায় ডুবিয়ে রেখে সে শ্বশুর বাড়ি চলে যায় কি করে? এদের দিন চলবে কি ভাবে? তাছাড়া গয়না এবং পণের টাকা নিয়ে ওরা যে ব্যবহার করছে তাতে কিছুতেই ওদেরকে ভদ্রলোক বলা যায় না। যারা পণের টাকা একঘণ্টা দেরি করে নিতে ভরসা পাচ্ছে না বিশ্বাস করছে না—কোন্ বিশ্বাসে তাদেব হাতে ইন্দ্রাণী নিজের জীবন সঁপে দেবে? এতক্ষণ ধরে তার বিধবা মা এবং মামার অনুনয়-বিনয়ে কি ফল হল? মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে কি মান-মর্যাদা বলে কিছু থাকতে নেই? ইন্দ্রাণীর চোখ ফেটে জল এলো। মনে পড়ল দশ বছর আগে বড়দি চন্দ্রাণীর বিয়ের রাতের কথা। মাত্র দু'হাজার পণের টাকা কম পড়ায় বর বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে গিয়েছিল। লোক লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে দিদিকে জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। ওই একই কারণে সেদিন বহরমপুরে তার মাসতুতো দুই বোন পুরবী আর করবী আত্মহত্যা করল। ছেলে পক্ষের পণের দাবির শিকার হয়ে দরিদ্র ঘরে মেয়েদের কি চিরকালই এমনি করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে? নাঃ

সে আত্মহত্যা করবে না। ইন্দ্রাণী চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসল।

৫

টাকা হস্তগত হতেই শশাঙ্ক রিক্সায় বসে তাড়া দিল—ভাই জলদি চলো, যা চাইবে তাই দেব, হাতে সময় নেই। বেশী ভাড়ার আশ্বাসে রিক্সাচালক যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু আলো-আঁধারের পথে তেমন জোরে চালাতে পারছে না। বাড়ির সদরে পেঁছে শশাঙ্কর কর্ণগোচর হল প্যাণ্ডেলের মধ্যে গোলমাল হচ্ছে। সেখানে ছুটে গিয়ে দেখল পরিবেশনের ত্রুটি উল্লেখ করে বরযাত্রীদের একাংশ আহার বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। অথচ পরিবেশনকারীদের বক্তব্য, কিছু বরযাত্রী মাংস চেয়ে নিয়ে খাওয়ার পরিবর্তে মাটিতে ফেলে দেওয়ায় পরিবেশনকারীদের একজন আপত্তি করেছিল—বচসার সূত্রপাত সেখানেই। শশাঙ্ক, সৌদামিনী এবং বিপুলবাবু একযোগে পুনঃপুন হাতজোড় করে ক্ষমা চাওয়ায় বচসার নিষ্পত্তি হল—ওরা পুনর্বার আহারে মনোনিবেশ করল। এই সময় ঘড়ি দেখে শশাঙ্ক একছুটে কালীপদবাবুর কাছে গিয়ে বলল—শীগ্‌গির বরকে ছাদনাতলায় নিয়ে যেতে বলুন—আর সময় হাতে নেই।

কালীপদবাবু তেতে উঠে বললেন—আগে পণের টাকাটা মিটিয়ে দাও তবে না!

—আমি এখুনি দিচ্ছি, আগে সন্দীপকে ছাদনাতলায় পাঠান, লগ্ন বয়ে যাচ্ছে—শশাঙ্ক হাত জোড় করে অনুনয় জানায়।

—দ্যাখো বাপু, পণের টাকা বুঝে না পেলে আমি ছেলেকে ছাদনাতলায় পাঠাব না এই আমার সাফ্ কথা—তাতে লগ্ন থাকুক আর যাক!

—এই নিন। শশাঙ্ক টাকার বাণ্ডিলটা কালীপদবাবুর কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে সন্দীপের হাত ধরে মিনতি জানাল, ভাই চলো, আর সময় নেই।

সন্দীপ বলল—দাঁড়ান আগে টাকাটা গোণা শেষ হোক।

—ভাই লগ্নটা পার হয়ে যাবে যে!

সন্দীপ একথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে বাবার টাকা গোণা দেখতে থাকে।

এই সময় স্বয়ং ইন্দ্রাণী সেখানে উপস্থিত হয়ে শশাঙ্ককে সম্বোধন করে দৃঢ়স্বরে বলল—দাদা, ওর হাত ছেড়ে দাও। বোনের কথা কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে ইন্দ্রাণী হুকুমের সুরে বলল—আমি বলছি ওর হাত ছেড়ে দাও!

শশাঙ্ক কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে কিঞ্চিৎ রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করল—কেন?

—কারণটা পরে শুনো, আগে টাকার বাণ্ডিলটা ফেরৎ নাও।

এবার শশাঙ্ক নরম সুরে বলে—ইন্দু, তুই কি বলছিস আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না দিদি…

—বললুম তো আগে টাকার বাণ্ডিলটা ফেরৎ নাও তারপর বলছি। তবুও শশাঙ্ক তার কথা মানছে না দেখে ইন্দ্রাণী বলল, লগ্ন পার হয়ে গেছে দাদা…

—আরও তো লগ্ন আছে দিদি—অবশ্য রাত তিনটের পরে।

—কি আছে আর কি নেই সে সব পরে দেখা যাবে—এখন যা বলছি তাই আগে শোনো।

কালীপদবাবু আঙুলে থুথু মাখিয়ে ধীরে-সুস্থে টাকা গুণছেন পাছে ভুল না হয়। অল্প সময়ে এতগুলো টাকা গুণে শেষ করতে বিলম্ব হচ্ছে। এক সময় শশাঙ্ক হঠাৎ হাত বাড়িয়ে চিলের মতো ছোঁ মেরে টাকার বাণ্ডিলটা একরকম কেড়ে নিয়ে

নিজের পকেটে ঢোকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাণী গর্জে উঠল। কালীপদবাবুকে লক্ষ্য করে বলল—দাদা, এই চশমখোর অভদ্র লোভী অমানুষের ঘরে আমায় বিয়ে দিতে চাও? দেড় ঘন্টা ধরে মা আর মামা কত অনুনয়-বিনয় করে ওঁর পায়ে সেধেছেন, একটু অপেক্ষা করুন সব টাকা পেয়ে যাবেন, আগে ছেলের বিয়ে দিন লগ্নটা পার হতে দেবেন না—কিন্তু কিছুতেই মন গলল না। উনি জিদ্ ধরে বসে আছেন একটি টাকাও কম থাকলে ছেলের বিয়ে দেবেন না। আমাদের প্রতি যাঁদের কিছু মাত্র সহানুভূতি নেই, দয়ামায়া নেই, বিশ্বাস নেই—কোন্ বিশ্বাসে আমাকে তাঁদের বাড়ির বউ করে পাঠাতে চাও? অতঃপর ইন্দ্রাণী সন্দীপকে দেখিয়ে বলল—ওই বিবেকহীন ব্যক্তিত্বহীন নরপশুর হাতে আমাকে তুলে দিতে চাও কোন্ ভরসায়? জানো আমার গা থেকে গয়না খুলিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে, জিনিসপত্র সব দেখে কি বাজে মন্তব্য ওরা করেছে যা কানে শুনলে গা জ্বলে যায়। খেতে বসে ওরা কি অসভ্যতা করল তা তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ! দাদা মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে সমাজে আমাদের মান-মর্যাদা বলে কিছু নেই? বিয়েটা যেন শুধু আমার একার প্রয়োজন—আর ওর বুঝি স্ত্রী ছাড়া—মেয়েমানুষ ছাড়াই জীবন চলবে! আমাকে কৃতার্থ করতে এসেছেন! দাদা, তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ো না। আমার আর সহ্য হচ্ছেনা, ওদের এখুনি চলে যেতে বলো কথাগুলো শেষ করে দৃঢ় পদক্ষেপে গিয়ে ইন্দ্রাণী নিজের হাতেই ছাদনাতলার কলাগাছ উপড়ে ফেলে দিল।

জবানবন্দী

অশোকা পাঠক

"ধর্মাবতার—মানসীকে আমি খুন করিনি। না-না-না আমার স্ত্রী মানসী রায়কে আমি হত্যা করিনি।" আদালতকক্ষে কারো মুখে কোনো কথা নেই। নিস্তব্ধ নিশ্চুপ বিরাট আদালত-কক্ষ। একটি সূচ পড়লেও বুঝি তার শব্দ শোনা যাবে। অভিযুক্ত আসামীর দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে সারা আদালতকক্ষ যেন গম্ গম্ করে উঠল। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শহরের এক বিখ্যাত কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শুভ্রবিকাশ রায়। গম্ভীর ভাবলেশহীন মুখে বিচারক স্বর্ণকমল সেনগুপ্ত আসামীর বক্তব্য শুনছেন।

দুপক্ষের শুনানী শেষ হয়েছে। সাক্ষীদের সওয়াল জবাবও সব সারা হয়েছে। ফরিয়াদী পক্ষের উকিল জ্বালাময়ী ভাষায় তার বক্তব্য আদালতে পেশ করেছেন। "বধূহত্যা নামক যে সংক্রামক ব্যাধিটি বর্তমানে আমাদের সমাজ জীবনে প্রবেশ করেছে তারই একটি ছোট্ট বীজ এই শিক্ষিত সুদর্শন অধ্যাপকটির মধ্যেও একদা কোন এক অশুভ ক্ষণে প্রবেশ করেছিল তা কেউ জানতে পারেনি। তারপর ধীরে ধীরে সেই ছোট্ট বীজ একদিন মহীরূহ রূপে আত্মপ্রকাশ করল আর তারই পরিণতিতে একটি সরলা নিষ্পাপ বধূকে এই সংসারে থেকে অকালে অসময়ে চিরবিদায় নিতে হল। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু একটিই যে, আসামী এই নৃশংস ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডটি তার পরিবারের অপর কোন আত্মীয় স্বজনদের সহযোগিতা ব্যাতিরেকেই সংঘটিত করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায়, পরপর তিনটি গুলি সে রিভলবার থেকে ছুঁড়েছিল।

প্রথমটি মানসী রায়ের হাতে লাগে, দ্বিতীয়টি তার কপালে এবং তৃতীয় গুলিটি হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করে। এত নিষ্ঠুর-ভাবে যে মানুষ নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে সে মানুষ নামের যোগ্য নয়। মনুষ্য সমাজে সে এক চরম কলঙ্ক। তার উপযুক্ত শাস্তি বিধানের আবেদন জানিয়ে ফরিয়াদী পক্ষের উকিল তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

আসামী পক্ষের উকিল আদালতকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, সুস্থ স্বাভাবিক মন নিয়ে আসামী এই জঘন্য ঘৃণিত কাজ করেন নি। বেশ কিছুদিন হল তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এজন্য তিনি শহরের বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার কে, জি বাসুর চিকিৎসাধীনে ছিলেন। ডাঃ বসুও আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে একথার সত্যতা স্বীকার করেন। মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য বড় বিচিত্র, বড় জটিল। আসামীর মনের সেই জটিল জটগুলো আগে ছাড়ানো দরকার। একথা ভুললে চলবে না যে, আসামী শুধুমাত্র একজন শিক্ষিত ব্যক্তি তাই নয়—একজন মার্জিত রুচির ভদ্র ও সজ্জন ব্যক্তি—যিনি তাঁর মধুর স্বভাবের জন্য অভিজাত সমাজে সকলের কাছেই প্রিয় ছিলেন। কেন তিনি হঠাৎ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে স্বভাব-বহির্ভূত এমন কাজ করে ফেললেন তাঁর মনোবিকারের সেই উৎসটিকে আমাদের সবার আগে খুঁজে বার করতে হবে। মাননীয় আদালতে যেন সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত বিষয়টি বিচার করেন এই আবেদন জানিয়ে আসামী পক্ষের উকিল আসন গ্রহণ করলেন।

কিন্তু আসামী শুভ্রবিকাশ রায়কে মনোবিকারের রুগী বলে আদালত গ্রহণ করল না। কারণ, তাঁর কথাবার্তা বাচনভঙ্গি সব কিছুই এত সুস্থ ও স্বাভাবিক মনের পরিচয় বহন করছিল যে তাঁকে কিছুতেই মনোবিকারের রুগী বলে গ্রহণ করা যায় না।

আসামীকে যখন প্রশ্ন করা হল "Are you guilty ?"

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উদাত্ত কণ্ঠস্বরে আসামী জবাব দেয়—"আমি জানিনা আমি দোষী কি নির্দোষ। আমার বিশ্বাস আদালতের বিচারই যথার্থ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

—আপনার স্ত্রী মানসী রায়কে কি আপনি হত্যা করেছেন ?

আসামী জবাব দেয়—না, মানসীকে আমি হত্যা করিনি। নিজের হৃৎপিণ্ড কি কেউ নিজে হাতে উপড়ে ফেলতে পারে ? জানি, আজ হয়তো আপনারা একথা শুনে উপহাসের হাসি হাসছেন কিন্তু মানসীকে আমার হৃৎপিণ্ড ছাড়া আমি আর কিইবা বলতে পারি ? আজ থেকে দশ বছর আগে প্রথম মানসীকে দেখেছিলাম বিখ্যাত শিল্পপতি বি, কে, মজুমদারের বাড়ীতে—তাঁর ছেলে বিপ্লব আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই সুবাদে ও বাড়ীতে আমার স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল। সেদিনও ঢুকতে যাবো কানে এলো একটি করুণ সুরের মূর্ছ'না—আমার সমস্ত চেতনাকে যেন অবশ করে দিচ্ছিল "অশ্রুনদীর সুদূর পারে ঘাট দেখা যায়—আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। সঙ্গীতের মধ্যে যে বেদনার পরশটুকু রয়েছে সমস্ত হৃদয় দিয়ে যেন তাকেই অনুভব করতে লাগলাম। এক সময় গান শেষ হলো। আমি লন পেরিয়ে ততক্ষণে 'হলে' এসে ঢুকছি। বিপ্লব পরিচয় করিয়ে দিল গায়িকার সঙ্গে—তার মামাত বোন মানসী মিত্র। আমার মনে হলো যেন সুর-সরস্বতী। সেই শুরু। ধর্ম্মাবতার, আমি আপনার বেশী সময় নেবো না। সংক্ষেপেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, ভালোবাসা—তারপর বিবাহ। প্রচলিত নিয়মের ছকবাঁধা পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে আমরাও একটা সুষ্ঠু পরিণতির মধ্য দিয়ে পরস্পরকে কাছে পেলাম। কিন্তু কী পেলাম ? সেদিন প্রদোষের কনে দেখা আলোয় যাকে মনে হয়েছিল একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম—পরে দেখলাম সে পদ্ম শুধুই কাগজের, তাই সংসারের কোনো তাপ

কোনো ঝড় জলকেই সে সহ্য করতে পারল না। সরস্বতীর কৃপাধন্যা মনে করে যাকে সেদিন সাদরে বরণ করে নিলাম পরে দেখলাম—নাঃ সে আসলে লক্ষ্মীর কৃপাপ্রার্থী। তার সেই অনেক প্রত্যাশায় চাওয়া ছলোছলো চোখের মধ্যে যে আমারই সর্বনাশের বীজ লুকিয়ে রয়েছে প্রথম পাওয়ার উন্মাদনায় তখন তা বুঝিনি।

মনের আবেগে শেক্সপীয়র, শেলি, রবীন্দ্রনাথ থেকে কত কবিতা আবৃত্তি করে যাই, প্রাক্-বিবাহ পর্বে যা শুনলে ও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত কিন্তু নাঃ এখন সেগুলি তার কানের মধ্যে দিয়ে মনের গভীরে আর প্রবেশ করে না। নিজের বাপের বাড়ীর ধনী আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে অর্থের প্রতিযোগিতায় সে যে অনেক পিছনে পড়ে থাকছে এই হীনমন্যতার অবসাদে মানসী বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আমি বুঝতে পারি, কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাই না।

কিন্তু যেদিন দেখলাম বিবাহ বার্ষিকীতে একটা বড় রকমের উৎসবের আয়োজন করতে না পারার জন্য মানসী উদ্বেলিত কান্নার আবেগে লুটিয়ে পড়ল সেদিন ঐ ঢেউ খেলানো অশ্রুসিক্ত তনুদেহটির দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় অক্ষম আর অপদার্থ মনে হলো। আমার আর কিছু ভালো লাগে না। **Shakespeare** আর **Wordsworth**এর বইগুলোতে ধীরে ধীরে ধুলো জমতে লাগল। লক্ষ্মীর বরপুত্র হবার সাধনায় প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করলাম। অধ্যাপনা ছেড়ে দিলাম। কন্ট্রাকটারী ব্যবসা আরম্ভ করলাম। মনে শুধু এক চিন্তা—কেমন করে আমার মানস প্রতিমার ঐ ছলোছলো চোখে টলটলে হাসিটি আবার ফুটিয়ে তুলতে পারবো।

বিপ্লব এই সময় আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল। বড় বড় **Party**র অর্ডার সে আমাকে যোগাড় করে দিতে লাগল। প্রথম

দিকে ব্যবসা ভালোই বলতে লাগল। উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত পাড়া ছেড়ে আমি দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত পাড়ায় পাড়ি জমালাম। আধুনিক উন্নতমানের জীবনযাত্রার সব বিলাস উপকরণে আমার ফ্ল্যাট ক্রমশঃ সুসজ্জিত হয়ে উঠতে লাগল। মানসীর মনের মেঘও কেটে যেতে লাগল। পিয়ানোর সামনে বসে সে যখন টুং টাং আওয়াজ তোলে তখন তার সেই হাসি হাসি মুখের দিকে চেয়ে নিজের অন্তরের সব দৈন্যকে আমি ভুলে যেতে চাইলাম।

হঠাৎ একটা দশ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট ধরে ফেললাম। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত বিজয়ের উল্লাস। যে কোনো মূল্যেই হোক অর্থ-কৌলিন্যে আমাকে সমাজের ওপরতলায় উঠে দাঁড়াতে হবে। আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছি। কাজটা যেন নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় সে জন্য আমার ক্লান্তিহীন প্রয়াসের বিরাম নেই। নির্দিষ্টসময়ে Partyকে অর্ডার মাফিক সমস্ত মাল ডেলিভারীও দিলাম।

সামনেই মানসীর জন্মদিন। এই উপলক্ষে আমি একটা বেশ বড় রকমের উৎসবের আয়োজন করেছি। বহু ধনী এবং অভিজাত ব্যক্তিদের আগমনে সেদিন আমার ফ্ল্যাট জমজমাট। মনে হলো অনেকদিন পরে মানসীকে আজ যেন আমি ভালো করে দেখছি। আকাশ-নীল রঙের বালুচরী শাড়ী পরে সে যখন ঈষৎ আনতভঙ্গিতে জন্মদিনের কেক্ কাটছিল তখন তাকে ঠিক সাগর-কন্যা বলে মনে হচ্ছিল। বহুদিন পরে আমার কবিতা মনে পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের "সাগরিকা"। আর ঠিক এমনি সময়েই একটা ফোন এল।

আজ্ঞে হ্যা ধর্ম্মাবতার, ফোন আমিই ধরেছিলাম। ডিফেক্টিভ বলে Party আমার সমস্ত মাল ফেরৎ দিয়েছে। চোখের সামনে

শুধু একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সমস্ত অনুভূতিকে যেন গ্রাস করতে চাইছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে ক্রমশঃ রাত্রি এল। অতিথিরা সবাই বিদায় নিলেন। উৎসবের আলো একে একে নিভে এল। আমি একা—অন্ধকারে আমার শোবার ঘরের ব্যালকনিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। মাথার ওপর তারা ভরা অন্ধকার অনন্ত আকাশ। এমনি সময় মানসী এল। চোখে বিরক্তি, মুখ গম্ভীর।

—"তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো? কত গেস্ট এলেন, কারো সঙ্গে তো ভালো করে কথাই বললে না।"

আমি সে কথার কোনো জবাব দিলাম না। নিঃশব্দে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোটার সুইচ টিপে মানসী জ্বেলে দিল। আমি এইবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওর মুখোমুখি হয়ে বললাম "আজ আমি নিঃস্ব, রিক্ত, পরাজিত। কবিগুরুর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে ...

মানসী ওর চাঁপার কলির মত আঙুলগুলো আমার মুখের সামনে মেলে ধরে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল।

"থাক্ থাক্ রাতদুপুরে আর তোমায় কাব্য করতে হবে না, তোমার ঐ কাব্যরোগের পাগলামী একবার শুরু হলে তো আর থামবে না। অনেক রাত হয়েছে এখন দয়া করে খাবে চলো।

মানসীর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ যেন আমি সর্পিনীর ফোঁসফোঁসানি শুনতে পেলাম। এই প্রথম মনে হল আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জীবনের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার শরিক আমার অর্ধাঙ্গিনী নয়—মায়ামমতাহীন নীল বিষে ভরা এক কালনাগিনী। বিরাট একটা বারুদের স্তুপকে মনের অতলে নিঃশব্দে বহন করে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে তাতে বিস্ফোরণ ঘটাল। ঐ ছোট্ট একটি কথা—কাব্য রোগের পাগলামী—সেটাই

আমার সমস্ত মনের মধ্যে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। মনে হল কার জন্য লক্ষ্মীর পদতলে আমার সমস্ত সারস্বত সাধনাকে বিসর্জন দিলাম? কার সুখের জন্য আমি অর্থের নেশায় উন্মাদের মত ছুটে বেড়ালাম? কার জন্য? কার জন্য?

মাথার মধ্যে যেন শত শত বৃশ্চিক আমায় দংশন করছে—আমি আর সে জ্বালা সহ্য করতে পারছি না।

দ্রুতপায়ে রাইটিং টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ড্রয়ারটা খুলে রিভালবারটা ক্ষিপ্রহাতে বার করে নিয়ে এসে মানসীর দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম—পর পর তিনটে গুলি। হ্যাঁ! তারপরই মানসী রক্তাক্তদেহে আমারই সামনে লুটিয়ে পড়ল।

তবু বলবো—না, ধর্ম্মাবতার না—আমি মানসীকে খুন করিনি। তাকে আমি খুন করতে চাই নি। তার মধ্যে যে লোভ আর লালসা, ধনী হবার জন্য যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা আর উচ্চাশার পোকাগুলো বাসা বেঁধেছিল, ঐ সুন্দর তনুদেহটির অভ্যন্তরে যারা শেকড় গেড়ে বসেছিল, আমি শুধু তাদেরই হত্যা করতে চেয়েছি—আমার মানস-প্রতিমাকে নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মানসীকে। অশ্রুনদীর সুদূর পারে দাঁড়িয়ে যে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। যেখানে গেলে লোভ আর লালসা, অর্থের নেশা আর উন্মাদনা আমাদের মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না।

আমার ঘাট দেখা যাচ্ছে—ধর্ম্মাবতার, আপনি আমায় ওপারে যাবার আদেশ দিন·

—

শাঙাল খুরুম্পা

জয়ন্ত রসিক

চৈত্রের শেষ অথচ সারা আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপটিপে বৃষ্টিতে পরিবেশটা ভীষণ স্যাঁতসেতে। বাবুঘাট অঞ্চলটা জনশূন্য বললেই চলে। গাছে লাগানো সিমেন্টের বেঞ্চিটাতে বিছিয়ে রাখা কম্বলটা যথাসম্ভব ছোট করে গাছের পেটে লুকিয়ে যাবার চেষ্টা করে শাঙাল খুরুম্পু। তবুও ফোটা ফোটা জল তার চুলে ও শরীরের এখানে ওখানে পড়তে থাকে। দক্ষিণে হুগলী নদীর উপর অসমাপ্ত দ্বিতীয় সেতু ক্রমশঃ অন্ধকারে হারিয়ে যায়, আর ওপারে হাওড়া স্টেশনের সারিবদ্ধ আলো ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে হাওড়া ব্রিজটাও। সেদিকে তাকিয়ে বাবুঘাটের এই গাছের গোড়াতে বসে ভিজে ভিজে রাতটা কাটাতে হবে শাঙাল খুরুম্পুকে। তবুও ভালো লাগছে তার। কারণ, আর একটা মাত্র রাত, তারপরই তার কলকাতার অভিশপ্ত জীবনের ইতি। উৎকণ্ঠা, প্রতীক্ষা, অনাহার আর মৃত্যু ভয়ের পরিসমাপ্তি। এই একটা রাত সে যদি পাথুরে, খুনীটার হাত থেকে বেঁচে যায় তাহলে সে ভয় তার আর থাকবে না। কারণ, বন্দর কর্মীদের দীর্ঘদিনের ধর্মঘট আজ মিটে গেছে। কাল এম, ভি, হর্ষবর্ধন পোর্ট-ব্লেয়ারের উদ্দেশে রওনা হবে। শাঙাল খুরুম্পু অনেক পরিশ্রম করে নিজের জন্য একটা টিকিট কাটতে পেরেছে। সে জানে, চিলি খুরুম্পু এক মাস ধরে বেরেন দ্বীপের উঁচু পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে তার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সেও চিলির কাছে ফিরে যাবার জন্য প্রতিদিন মেরীন হাউসের গেটে এসে দাঁড়িয়ে

থেকেছে। হয় তো আজ ধর্মঘট মিটে যাবে, হয় তো কাল জাহাজ ছাড়বে। এমনি করে একটানা চল্লিশ দিন ধরে সে ধর্মঘটের মীমাংসার প্রতীক্ষা করেছে, আজ সেই প্রতীক্ষার শেষ দিন।

তবুও ভয় যায় নি তার। একে তো দু'দিন আগে শিয়ালদা না কোথায় সেই পাথুরে খুনীটা কোন এক ভিখারীর মাথা থেঁতলে দিয়ে গেছে। পুলিশ নাকি তার পায়ের ছাপ পর্যন্ত পেয়েছে, জোর খুঁজছেও; কিন্তু ধরতে পারেনি তাকে আজও। আর ধরতে পারেনি বলেই শাঙাল খুরুস্পুর যত দুশ্চিন্তা। কলকাতায় তার পা রাখার পর থেকে সেই পাথুরে খুনীটা দু গণ্ডা মানুষের মাথা ভেঙেছে। আর সব কটা মাথাই তার মত ফুটপাথ বাসীর। না; আজ রাতটা সে কিছুতেই ঘুমাবে না—বসে বসে কাটিয়ে দেবে রাতটা। তারপর সকাল হলেই এম. ভি. হর্ষবর্ধনে চড়ে পোর্ট ব্লেয়ারের পথে পাড়ি দেবে। সেখান থেকে বেরেন যাবে, চিলির সাথে মিলবে, তার দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাবে। শাঙালের দৃষ্টিটা হাওড়া ব্রিজের উপর গিয়ে পড়ে। প্রথম দিনের মত আজও সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

সে যেদিন প্রথম বাবুঘাটে দাঁড়িয়ে একবার হাওড়া ব্রিজ আর একবার তার সোজাসুজি ওপারের দিকে তাকিয়ে হুগলী নদীর পরিধি মাপার চেষ্টা করছিলো এবং কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না ঐ পাহাড়ের মত ব্রিজটা নদীর ওপার থেকে এপার পর্যন্ত কেমন ক'রে ঝুলে রয়েছে। ঠিক তার দিন কয়েক আগে থেকেই লাল-বাজারের বড়কর্তারাও বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কেমন করে পাথুরে খুনীটা কলকাতার এত বড়ো বিচক্ষণ বাহিনীকে বুড়োআঙুল দেখিয়ে একের পর এক ফুট-পাথ-বাসীর মাথা থেঁতলে চলেছে। পিকেট, প্যাট্রোল, ফ্লাইং ওয়াচ, স্পেশাল রাউণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ ব্যর্থ ক'রে তার পাথুরে অপারেশন অব্যাহত রেখেছে।

শাঙাল খুরুশপুর অবাক হবার পালা অবশ্য অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে, সেই যেদিন সে চিলি খুরুশপুর কাছে বিদায় নিয়ে বেরেন দ্বীপ থেকে পোর্টব্লেয়ারের উদ্দেশে রওনা হয়েছে সেদিন থেকে। বেরেনের পাথরের উপর দাঁড়িয়ে চিলি খরুশপু চলন্ত বোটটার দিকে তাকিয়ে থেকেছে, অশ্রুচোখে হাত নেড়েছে। শাঙালও বোটটার মাথায় দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা গেছে তাকেই দেখেছে। ক্রমশঃ বোটটা তার আর চিলির ব্যবধান বাড়িয়েছে। তারপর চিলির জলভরা চোখ থেকে শুরু করে সমস্ত চিলি এমন কি বেরেন দ্বীপটা পর্যন্ত ছোট হ'তে হ'তে একসময় হারিয়ে গেছে। চিলি হয়তো সেখানে তারপরও দাঁড়িয়ে থেকেছে। লাস, রিচীস, হেবলক প্রভৃতি দ্বীপকে ডানে বাঁয়ে ফেলে সে যখন পোর্ট-ব্লেয়ারের হাইডো ডকে এসে পৌঁচেছে তখনও হয়তো সন্ধ্যার অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করে সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাওয়া বোটটার পথের দিকে চোখ দুটিকে মেলে রেখেছে চিলি।

আর শাঙাল? এম, ভি, হর্ষবর্ধনের বুকে চড়ে পোর্টব্লেয়ার থেকে কলকাতার পথে রওনা হয়েছে। তিন দিন তিন রাত একটানা জলের বেপরোয়া দাপাদাপি রুদ্ধশ্বাসে হজম করে, খিদিরপুরের বাইশ নাম্বার ডকে মাটি ছুঁয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে তার। মেরিন হাউসের পাশ কাটিয়ে প্রিন্সেপ ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে। সমান মাপের দু'লাইন গাছের মাঝ দিয়ে বিস্মিত চোখে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে এই বাবুঘাটে, এই গাছের গোঁড়ায় দাড়িয়ে হাওড়া ব্রিজটা প্রথম তার চোখে পড়েছে। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে, বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে সেদিকে। চিলির কথা মনে পড়েছে তার, বেরেন দ্বীপের কথা, পোর্টব্লেয়ার থেকে কলকাতার পথটা, এমন কি কলকাতা আসার কারণটা পর্যন্ত।

না খুব বেশি কাজ নিয়ে আসে নি শাঙাল, মাত্র দু'টো কাজ

তার : এই শহরের বড়ো ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিলির জন্য ওষুধ নেবে। কারণ, তাদের একটা সন্তান চাই। আর তার নিজের জন্য একটা কাজ ঠিক ক'রে ফিরে যাবে। চিলিকে নিয়ে বেরেন দ্বীপ থেকে কলকাতা পালিয়ে আসবে। এ ব্যাপারে সে সিন্‌হা সাহেবের সাহায্য পাবে। শুধু সিন্‌হা সাহেবকে খুঁজে বের করতে পারলেই তার কাজ শেষ।

পেটে পান-সিগারেটের দোকান সাজিয়ে এগিয়ে যাওয়া লোকটিকে ধরেছে শাঙাল···

—বাবু··· ?

পান-ওয়ালা থমকে দাঁড়িয়েছে, নিজের ছিন্ন জামা-প্যান্টের দিকে চোখ বুলিয়ে শাঙালের দিকে প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়েছে—পান ?

—'নাই বাবু।' মাথা নেড়েছে শাঙাল।

—সিগরেট ?

—নাই বাবু।" আবার মাথা নেড়েছে শাঙাল।

—'ধুত্তোর, যতো সব আপদ! বিরক্তিভরে পা চালিয়েছে পানওয়ালা, শাঙাল অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে আর এক পথচারীকে ধরেছে।

—বাবু ?

—বলুন !

—সিন্‌হা সাইবের বাড়িটা কোন দিকে ?

—কত নাম্বার ? জানতে চেয়েছে লোকটি, নাম্বারের কথা শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে শাঙালের মুখ। নাম্বার আবার কি ? বোকার মতো লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকেছে সে। লোকটি তার নিরুত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধর্মতলার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে। সেও উদ্যম নিয়ে এগিয়েছে। একটু একটু করে বড় রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সাঁ সাঁ

গতিতে এগিয়ে যাওয়া গাড়ীর অফুরন্ত লাইন দেখে অবাক হয়ে গেছে সে। রাস্তা পার হবার দুঃসাহস তার হয়নি। গাড়ীর লাইনটা শেষ হওয়ার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থেকেছে, কিন্তু লাইন শেষ হয়নি। সূর্য ডুবে গেছে। হাজার হাজার বাড়ী, লাখ লাখ গাড়ী আর মানুষের শব্দ চিৎকারে দিশাহারা হয়ে গেছে শাঙাল। তবুও সিন্‌হা সাহেবের বাড়ী খুঁজে বের করার প্রত্যাশা তার তখনও যায়নি। যেমন করেই হোক সেই বাড়িটা তাকে পেতেই হবে। তা না হলে সে কোথায় থাকবে? কি খাবে? কোথায় ওষুধ পাবে? কোথায় কাজ পাবে? একের পর এক পথচারীকে ধরেছে শাঙাল, পাগলের মত সেই বাড়ীটার সন্ধান জানতে চেয়েছে, কিন্তু কেউ তাকে সেই বাড়ীটার সন্ধান দিতে পারেনি বরং ঘুরিয়ে শাঙালের কাছেই তারা বাড়ীটার নাম্বার, ঠিকানা, পাড়া, বস্তি, অফিসের কথা জানতে চেয়েছে। শাঙাল কাউকে তার অসহায়তার কথা বোঝাতে পারেনি। তার কথা বুঝবে, তাকে সাহায্য করবে, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে এমন একটি লোকের সন্ধানে শাঙালের অসহায় চোখ লক্ষ লোকের মুখে পাক খেয়েছে, কিন্তু তেমন লোকের চোখে চোখ পড়েনি তার। চিলির কথা মনে পড়েছে। হঠাৎ আসবার আগের দিন শেওড়া পাতার ঘরে তার বুকে মুখ গুজে চিলি কত কেঁদেছিলো, শহরে আসতে বাধা দিয়ে বলেছিলো—"সিথা কত্তো লোক, তু হারাই যাবি, তুকে যাতি হবেনে।"

কিন্তু শাঙাল, তার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল ..

—"দূর্ পাগলী, আমি সিথার কত্তো লোক চিনি। সিন্‌হা সাইব, ঘোষ বাবু, মণ্ডল বাবু।"

কিন্তু বেরেনের কত্তো লোকের সাথে কলকাতার কত্তো লোকের তফাৎটা সেদিন সে বুঝতে পারে নি। তবুও সিনহা

সাইবের মতো মস্তো লোকটাকে কেউ চিনবে না সেটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। একমাস তার সাথে কাজ করে শাঙাল তাকে চিনেছে, জেনেছে। এক লণ্ড লোকের মধ্যে সেই তো বড়ো সাহেব। ক্যামেরা, তাঁবু, বাক্স, পোষাক পরিচ্ছদের সেই তো মালিক। ডানডীজ, রিচীস, লাস, হেবলক, সব জম্বুদ্বীপে সেই সাহেবের হুকুমেই তো সে একমাস ধরে খুঁটি পুঁতলো, তাঁবু গড়লো, ভাঙলো। অতো বড়ো সাহেবটাকে এখানে কেউ চেনে না? সব গোলমাল হয়ে যায় শাঙালেব। মাথাটা যন্ত্রণা করে ওঠে, কি করবে ভেবে পায় না সে। ইডেন গার্ডেনেব লোহাব বেড়াটাতে ঠেসা দিয়ে বসে পড়ে। ক্লান্ত অবসন্ন শাঙাল একসময় হাতের পুঁটুলিটাকে বালিশ করে শুয়ে পড়ে। হঠাৎ লোকেব চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙে তাব। মাত্র কযেক হাত দূরে মাথা থেঁতলানো রক্তাক্ত লোকটাকে দেখে শিউরে ওঠে শাঙাল। স্টোনম্যান নামের কে যেন খুন করে গেছে লোকটাকে।

পরেবদিন সকালে বায়োস্কোপের কথা বলতেই সিন্‌হা সাহেবেব খবর জানতে পেরেছে সে। টালিগঞ্জে যাবার জন্য পাতাল রেলের কাছে পেঁছাতে গিয়ে ডাইনে বামে পাক খেয়ে খেয়ে কতো নিচে নেমেছে অনুমান করতে কষ্ট হয়েছে তার। ঝক ঝকে পাথরের মেঝে, মাইকের গান, বায়োস্কোপ, ঠাণ্ডা হাওয়া…আশ্চর্য্য—সুন্দর জায়গাটাকে দেখে চিলির কথা মনে পড়েছে তার, জায়গাটা চিলিকে না দেখাতে পারার জন্য কষ্ট হয়েছে অসম্ভব। ট্রেন এসেছে, টালিগঞ্জের স্টুডিওটাও পেয়েছে, শাঙাল, কিন্তু তার সিন্‌হা সাইবকে পায়নি। তিনি বোম্বাই গিয়েছেন। সে জায়গা নাকি তার বেরেন দ্বীপ আর কলকাতা যতদূর তার থেকেও বেশিদূর। ঘোষবাবু, মণ্ডলবাবুর খবরও কেউ বলতে পারেনি। ও নামের বাবুর নাকি কলকাতায়

ছড়াছড়ি। এবার কি করবে শাঙাল? মরিয়া হয়ে লোকের কাছে কাজের জন্য হাত পেতেছে সে। সে কাঠ কাটতে পারে, মাটি কাটতে পারে, মাছ ধরতে পারে, তাঁবু গড়তে পারে। কিন্তু তার কথা শুনে লোক হেসেছে, বিদ্রুপ করেছে তাকে, কাজ পায়নি শাঙাল। ডাক্তার দেখানোও হয়নি তার। বাবুঘাটে ফিরে এসেছে সে। বেরেন পালাতে হবে। কিন্তু মেরীন হাউসে গিয়ে জানতে পেরেছে জাহাজ চলাচল বন্ধ। জাহাজের লোকেরা নাকি কাজ করছে না। কবে কাজ করবে তাও কেউ জানে না। এবার কি করবে শাঙাল? কোথায় যাবে? কোথায় থাকবে? অস্থির অসহায় শাঙাল এই গাছটার গোড়াতে এসে দাঁড়িয়েছে। চিলির মুখটা আবার মনে পড়েছে। মনে হয়েছে কত যুগ সে দেখেনি চিলিকে, মরুভূমির মত হাহাকার করে উঠেছে তার বুক। গাছের গোড়াতে ঠেস দিয়ে বসেছে। দিন চলে গিয়েছে · রাতও। সকালে শুনেছে সেই পাথুরে খুনীটা নাকি কোন পথের ধারে কার মাথা থেঁতলেছে আবার। সমস্ত শরীর শিউরে উঠেছে তার, ছুটে মেরীন হাউসে গিয়েছে। কিন্তু তখনও কাজ বন্ধ, জাহাজ বন্ধ। আবার পরের দিন গিয়েছে, আবার আবার কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।—জাহাজ চলার খবর পায়নি শাঙাল, কিন্তু সেই পাথুরে খুনীটার খুনের খবর পেয়েছে অনেক।

চায়ের দোকানে জল তুলে, লাক্সারী বাসের মাথায় মাল তুলে, মাল নামিয়ে তার দিন কেটেছে। কিন্তু রাত পার হ'তে চায়নি। এই বুঝি খুনীটা তার মোটা পাথর দিয়ে তার মাথা থেঁতলে দিলো! রাতে মাথার কাছ দিয়ে মানুষ পেরিয়ে গেলে তার বুক কেঁপে উঠেছে। তার সব সময় মনে হয়েছে···সেই পাথুরে খুনীটা তাকে মারবার জন্য তার আশপাশেই ঘুর ঘুর করছে, ওৎ পেতে ব'সে আছে, সুযোগ পেলেই তার উপর পাথরটা আবেগের ছুঁড়ে দেবে; আর বুঝি তার বেরেন দ্বীপে

ফিরে যাওয়া হবে না, আর বুঝি চিলির সাথে দেখা হবে না তার।

কিন্তু সে সব ভয়ের আজ পরিসমাপ্তি। স্টোনম্যান তাকে মারতে পারে নি। ডকে আবার কাজ শুরু হয়েছে। এম, ভি, হর্ষবর্ধন আবার চলতে শুরু করবে। শুধুমাত্র আজকে রাতটা তাকে পার করতে হবে, তারপর কাল সকালে হর্ষবর্ধনের বুকে বসে পোর্টব্লেয়ারের দিকে এগিয়ে যাবে—এগিয়ে যাবে চিলির দিকে।

আকাশের দিকে তাকায় শাঙাল। একটা একটা করে তারা বেরিয়ে আসছে মেঘের ভেতর থেকে। কম্বলটা স্যাতসেতে হয়ে গেছে তার; কিন্তু বৃষ্টি আর পড়ছে না। পশ্চিমের হাওয়া তার গায়ের উপর দিয়ে পুবের দিকে বয়ে চলেছে। কেমন যেন ভালো লাগছে আজ শাঙালের, গান গাইতে ইচ্ছা করছে তার। পুঁটলি থেকে ন্যাকড়া বের ক'রে বেঞ্চিটাকে ভালো ক'রে মোছে শাঙাল। তারপর পুঁটুলিটা মাথায় দিয়ে হুগলীর দিকে মুখ ক'রে বেঞ্চিতে গা-টা এলিয়ে দেয়। অনেকদিনের অনেক উৎকণ্ঠার আজ শেষ। কম্বলটা তুলে বুকের উপর চাপিয়ে নেয় সে। বসন্তের মৃদু বাতাস যেন তার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। বড্ড আরাম লাগছে তার, কিন্তু সে আজ তবুও ঘুমুবে না। হুগলীর জলের দিকে তাকায় শাঙাল। ভাঁটার টানে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে। এই জল নাকি সাগরে গিয়ে পড়বে, আন্দামানের ছোট ছোট দ্বীপে, যেখানে চিলি তার প্রতীক্ষায় দিন গুণছে—সেখানে গিয়ে ধাক্কা খাবে। চিলি বুঝতেও পারবে না যে এই জল তার শাঙালের চোখের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। চোখ বন্ধ করে চিলিকে দেখবার চেষ্টা করে। জল বয়ে যাবার শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে থাকে। পশ্চিমের হাওয়া শাঙালের জেগে থাকবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ে শাঙাল।

ভোর চারটে নাগাদ পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়ায় বাবুঘাটে, জোর তল্লাসী চলছে কলকাতা জুড়ে। আজও স্টোন-ম্যান একজনের মাথা থেঁতলে দিয়েছে। শিয়ালদহের খুনের দিন পুলিশ স্টোনম্যানের পায়ের ছাপ পেয়েছে, বাম পায়ের বুড়ো আঙুলটা তার অসম্ভব বড়ো। রতন দারোগা ক্যানিং স্ট্রীট থেকে শুরু করে অক্‌ল্যাণ্ড রোড পর্যন্ত আঙুল তল্লাসী চালিয়ে বাবুঘাটে পা ফেলেছে। সঙ্গে তার কনস্টেবল রামসুধীশ পাণ্ডে আর জগদীশ তেওয়াড়ী। যেমন করেই হোক স্টোন-ম্যানকে তার চাইই। পুলিশ বিভাগ, রাজ্য সরকার, এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের, কাছে সে একটা নয়া নজির সৃষ্টি করতে চায়। রিওয়ার্ড চায়, রেকমেন্ডেশন চায়। খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে দুদিকে চোখ বুলিয়ে এগিয়ে চলেছে রতন দারোগা, সঙ্গে দৈত্যবৎ সঙ্গীদ্বয়। সহসা চাপা স্বরে চিৎকার করে ওঠে পাড়েজী—

—হুজুর।

সঙ্গে সঙ্গে রতন দারোগা আর তেওয়াড়ীজী তার দিকে তাকায়। পাঁড়েজী তর্জ্জনী তুলে বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে দেয়। সেদিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির সকলেরই। অস্বাভাবিক বড়ো বুড়ো আঙুল। কম্বল টেনে মাথা ঢাকতে গিয়ে বুড়ো আঙুল সমেত ডানপায়ের পাতাটা কম্বলের বাইরে এসে গেছে এবং পাঁড়েজীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তা দেখতে ভুল করেনি। রতন বাবু খুশিতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, সকালে তাদের নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে। রিওয়ার্ড পাবে, প্রমোশন পাবে। ডি, সি, কমিশনার, এমনকি সি, এম,-এর পর্যন্ত নেক-নজরে পড়বে সে। খবরের কাগজে ছবি বেরোবে, টি, ভি,-তে সাক্ষাৎকার। আনন্দে বুকটা নেচে ওঠে তার, উচ্ছ্বসিত আবেগের সাথে বলে ওঠে —স্টোন ম্যান!"

আধো ঘুমের ঘোরে স্টোনম্যান শব্দটা শাণ্ডালের কানে গিয়ে

ধাক্কা খায়। মনে হয় স্টোনম্যান বুঝি তার মাথায় পাথর তুলেছে। তাই স্টোনম্যান শব্দটা কানে ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই বিদ্যুতের গতিতে সে লাফিয়ে ওঠে।

অপরদিকে হঠাৎ স্টোনম্যানের লাফিয়ে ওঠা দেখে তেওয়ারী আর পাঁড়েজী দু'পা পিছিয়ে যায়। রতন দারোগা মুহূর্তের মধ্যে কোমর থেকে রিভলভার টেনে শাওালের বুকে ঠেকিয়ে ধরে। চিৎকার ক'রে বলে ওঠে—

—হিলোমাৎ, গুলি চালাদুঙ্গা—।"

শাওাল পাথরের মত দাঁড়িয়ে যায়, একটি কথাও তার মুখে জোগায় না। তেওয়ারী আর পাড়েজী তাকে টানতে টানতে এনে গাড়িতে তোলে। বুড়ো আঙুলটার দিকে তাকিয়ে খুশিতে কেঁপে ওঠে পাঁড়েজী। কারণ, সেই-ই প্রথম দেখেছে আঙুলটা। শাওালও তাদের সাথে তার অস্বাভাবিক বড়ো বুড়ো আঙুলটার দিকে তাকায়, কিন্তু বুঝতে পারে না যে, তার ঐ ডানপায়ের বুড়ো আঙুলটার জন্যই তাকে পুলিশ ধরেছে। কনস্টেবল দু'জন এমনি কি রতন দারোগা পর্যন্ত যেমন স্টোনম্যানের বাম-পায়ের বুড়ো আঙুলের সাথে শাওালের ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের তফাৎটা উত্তেজনা ও তাড়াহুড়োতে বুঝে উঠতে পারে না, ঠিক তেমনি।

গাড়ি লালবাজারের দিকে চলতে থাকে। চিলির কথা মনে পড়ে শাওালের। সে বুঝতে পারে না চিলির সাথে তার আর কোনদিন দেখা হবে কি না। এম, ভি, হর্ষবর্ধন চলে যাবে, বেরেনের পাথরের উপর দাঁড়িয়ে চিলি তার প্রতীক্ষা করবে— আর সে…? হয়তো হাটুতে পুলিশের লাঠি-লাথি খেয়ে চিলির কাছে ফেরার স্বপ্ন দেখবে।

(শাওাল খুরুস্পুর কাহিনীটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

সেলাই মেসিন

জয়ন্ত রসিক

হাতের অবশিষ্ট সিগারেটটা নদীর জলে ছুঁড়ে দিয়ে মুখের ধোঁয়াটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উপর দিকে ঠেলে দেয় অচিন। তাকিয়েও থাকে তারই দিকে, ধোঁয়ার গোলক পিণ্ডটা একটু উপরে উঠতে না উঠতেই মাতলা নদীর মাতাল হাওয়া তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। ধোঁওয়া থেকে তার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ে নদীর জলে, জল থেকে ওপারের চরে, চর থেকে সবুজ মাঠ পেরিয়ে হালকা মেঘের উপর। ওখানে চোখ রেখেই সে উদাসভাবে বলে—'হবে, সব হবে।'

কয়েক গজ দূরে গুটি কয়েক স্টীমার মাতলার জলে ভাসছে, তার উপর দাঁড়িয়ে কয়েকজন লোক যাত্রী ধরার চেষ্টায় সমানে চিৎকার করে চলেছে—'বাসন্তী গোসাবা সুন্দরবন।' সুন্দরবনের নাম শুনে সীমার চোখে ভেসে ওঠে সুন্দরবনের এক কল্পচিত্র। শুধু গাছ আর গাছ, অসংখ্য ফুল, অগণিত পাখি, হরিণ। উজ্জ্বলের হাত ধরে মেয়েটি সেই বনে মাতামাতি করছে, উজ্জ্বল ক্র্যাচ বগলে ঠিকমত চলতে পারছে না, কেমন এক অসহায় চোখে সে সীমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক সেই সময় অচিনের "হবে, সব হবে" কথাটা আচমকা সীমার কানে গিয়ে ধাক্কা খায়। সে সুন্দরবন থেকে ফিরে আসে মাতলা নদীর পাড়ে। ডান পাশে মুখ তুলে তাকায়, উজ্জ্বল নয়, অচিন। সুন্দরবনের দি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতই তাকে খুবলে খুবলে খাবার জন্য জিভ শাঁনাচ্ছে। সীমার দৃষ্টিটা অচিনের উপর থেকে আকাশ…ওপারের চর এবং

নদীর জল হয়ে ফিরে এসে পায়ের পাতায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে চোখ রেখেই খুব মিনমিনিয়ে সীমা বলে—"কবে হবে?"

'বেতন পাই।' ছোট্ট উত্তর অচিনের।

সীমা তার পায়ের পাতা থেকে দৃষ্টিটা তুলে ধরে অচিনের মুখে, তার কথার সত্যটা পড়ে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু সংশয় কাটে না। মনের মধ্যে একটি প্রশ্নই তোলপাড় করতে থাকে, 'হবে তো? তার ইচ্ছা করে আরও একবার অচিনকে বলতে। কিন্তু পারে না, পাছে অচিন তাকে লোভী ভাবে, তার ভালবাসার অভিনয়টা ধরা পড়ে যায়, অথচ মেশিনটা তার খুবই দরকার। ওটা না পেলে উজ্জ্বলকে নিয়ে তার ঘর বাঁধা হবে না। সবাই পঙ্গু বলে। সে নিজের পায়ে চলতে পারে না, তবু সীমা তাকেই ভালবাসে। উজ্জ্বল তার চোখভরা মায়া দিয়ে সীমাকে বেঁধেছে। আর সীমা-? সীমা তার অসহায় মুখটার দিকে তাকিয়ে সব কিছু করতে পারে। তাই তো আজ তার নির্ম্মল মুখে কালি ঘসে নিতেও দ্বিধা নেই। যেমন করেই হোক তার একটা সেলাই মেসিন চাই, পেলেই সে উজ্জ্বলকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। সেলাইয়ের কাজ করবে। আর সন্ধ্যা হলেই উজ্জ্বলের বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু অচিন যদি মেসিনটা কিনে না দেয়? ধক্ করে ওঠে সীমার বুকটা, এক ঝাঁক আহত নিঃশ্বাস শব্দ তুলে বেরিয়ে যায়। সে আর একবার কথাটা না বলে কিছুতেই থাকতে পারে না,—"তোমার বেতনের খুব দেরি?"

"মাগীতো ভারি চালাক' মনে মনে বিশেষণটা প্রয়োগ করে অচিন, তারপর সীমার শ্যাম অঙ্গের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। বাঃ বেশ মেয়েটি! হঠাৎ তার মনে হয় মেয়েটির দাবি খুব একটা বেশি নয়—চারশো কেনো? ভাল পার্টির হাতে পড়লে সাতশো টাকা পর্যন্ত দাম উঠতে পারে। দেবে; সেও দেবে, কিন্তু আগে তার পাওনা কড়াই গণ্ডায়

বুঝে নেবে। সীমারও অবশ্য তাতে আপত্তি নেই। জেনে শুনেই সে সুদূর শ্যামনগর থেকে তার সাথে ক্যানিংএর বসন্ত কেবিন পর্যন্ত এসেছে। মাথায় লিপ্‌স্টিক ঘষে সিঁদুর বানিয়ে নিয়েছে। কে জানে সে ঐ সিঁথিতে এই নিয়ে কতবার লিপ্‌স্টিক লাগিয়েছে আর মুছেছে হাজারবার হোক, তাতে অচিনের আপত্তি কিসের? সে তো আর ফুল-চন্দন দিয়ে তাকে ঘরের বৌ করতে যাচ্ছেনা। যে কটা দিন তার ভাল লাগবে…সে খুশির ফোয়ারা ছোটাবে। বিনিময়ে একটা সেলাই—

—'কি ভাবছো?'' সীমার প্রশ্ন।

—'কই কিছু না তো?'' অস্বীকার করার চেষ্টা করে অচিন, কিন্তু কোথায় যেন একটু জড়তা থেকে যায়।

—'নিশ্চয় ভাবছো।'' জোর দিয়ে বলে সীমা। অচিন এড়িয়ে যেতে পারে না, ধরা পড়ে যায় সীমার কাছে, চিন্তিত মুখে বলে—''হোটেলের রেজিস্টারে বাবার নামটা কি যেন লিখলাম, কিছুতেই মনে পড়ছে না।''

—''বাপের নাম ভুলে গেছ? খিল খিল করে হেসে ওঠে সীমা। তার সে হাসি অচিনের বুকে ধাক্কা খায়। মেজাজ গরম হয়ে ওঠে তার। কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে—''তুমি হাঁসছো? যদি পুলিশ আসে?''

পুলিশের নাম শুনে ভীষণ ঘাবড়িয়ে যায় সীমা, চারিদিকে তার ভীতু দৃষ্টিটা এক পাক্ ঘুরে পুলিশ খুঁজে ফিরে আসে। মুখটা যেন রক্ত শূন্য হয়ে আসে তার, মনটা খারাপ হয়ে যায়। আকাশের রঙটা ক্রমশঃ কেমন যেন বদলে যায়। হাল্কা হতে ঘন, উজ্জ্বল হতে অন্ধকারে। একটু পরেই তারা এই মাতলার পাড় হতে বসন্ত কেবিনে ফিরে যাবে, তারপর চলতে থাকবে মরা গরুর উপর শকুনের আক্রমণ।

অচিনও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে আকস্মিক রেগে যাওয়াটা

ঠিক হয়নি বলে মনে হয় তার, পরিবেশটা হাল্কা হাওয়া উচিত এটাও বুঝতে পারে সে, কিন্তু কেমন করে, সেটা ঠিক করতে পারে না। সীমা গুমোট ভাবটা কাটানোর জন্য অচিনের সাথে খুব ঘন হয়ে বসে। তার ডান হাতটা অচিনের বাম পায়ে রেখে বলে—"রাগ করনা লক্ষ্মীটি, আমি অতসব ভেবে বলিনি।"

—"আমার ঘরের বৌরে, লক্ষ্মীটি সাজাতে এসেছে "ঠোঁটের ডগাতে এসে গিয়েছিল কথাটা, সামলে নিয়ে সীমার মুখের দিকে তাকায় অচিন। সূর্যের শেষ আভা সীমার মুখে, চারটি চোখ একই সমান্তরালে স্থির হয়ে থাকে কিছুক্ষণ, অচিন ইচ্ছা করেই মুখ ফেরায় না, সীমার দৃষ্টিটা অচিনের মুখ হতে গা বেয়ে নিচে নেমে আসে।— 'কি দেখছো ?' আব্দারের ঢঙে সীমার প্রশ্ন।

—'তোমাকে।' সিনেমার নায়কের মতই অচিনের উত্তর।

—'কি আছে দেখার মত ? সীমার স্বরে তাচ্ছিল্য।

—'বিশ্বাস কর সীমা, তোমার মুখটা খু-উ-ব মিষ্টি।" আবেগের সুরে বলে অচিন। সীমা হোঁচট খায়। ঠিক এই কথাটাই সে উজ্জ্বলের মুখে বার বার শুনেছে। উজ্জ্বলের শিশুসুলভ মুখটা সীমার চোখে ভেসে ওঠে, নিজেকে বড় অপরাধী—বলে মনে হয় তার। মনে হয় উজ্জ্বলের প্রতি এ এক নির্মম অবিচার। অথচ উজ্জ্বলকে পেতে হলে মেসিনটা —

'কি ? বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি ?' তোমার এই মুখটা মানুষকে পাগল করতে পারে সীমা।"

সীমার থুতনিতে হাত নিয়ে তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয় অচিন। চোখ ডুবিয়ে দেয় তার নিটোল মুখমণ্ডলে। ঘৃণায় সীমার সমস্ত শরীর ঘিনঘিনিয়ে ওঠে। ইচ্ছা করে এক ঝাপটায় অচিনের হাতটা তার চিবুক হতে সরিয়ে দিয়ে চলে যেতে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘর বাঁধার বুনো লোভটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। উজ্জ্বলের বুকে মাথা রেখে ঘুমানোর তৃষ্ণাটা তার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাই সে পারে না, পারে না অচিনের কাছ থেকে উঠে চলে যেতে, অচিনের হাতটা চিবুক হতে সরিয়ে দিতে, চেপে ধরতেই হয় তার যে মেশীনটার খুবই দরকার।

—

আকাঙ্ক্ষা

দীপ্তি দাশগুপ্ত

"আর তো কিছু আমি চাইনি, শুধু তো একটা গাড়ীই চেয়েছিলাম। কালার টি, ভি, ফ্রিজ তো আমার আছে। শুধু ভি,সি, আর, ওয়াশিং মেশিন আর ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এনেছে। এ সব তো আজকাল সবাই দেয়। হোকনা দুটো বোন, দুটো ভাইও তো আছে, ইচ্ছে করলে অনেক আনতে পারবে চন্দনার বাবা" ঝাঁঝালো সুরে সুমনাদেবী বললেন।

মিঃ দেব অর্থাৎ কোমল দেব একটু নরম করার চেষ্টা করে বললেন—"আঃ সুমনা তোমার একি হোল? একটা সুন্দর উপযুক্ত মেয়ে নিয়ে এসেছি। সে-ই একদিন এই সংসারকে মাধুর্যে ভরিয়ে দেবে। এটাই কি বড় পাওনা নয়? আমি তো কিছু চাইনি তাও ওর বাবা বড়লোক বলে মেয়েকে এত কিছু দিয়েছেন!

মিঃ দেব ভাবলেন যে উনি শান্তভাবে বললেই এই অস্বস্তিকর কথাবার্তার অবসান হবে কিন্তু ফল উল্টো হেলে, সুমনাদেবীর এতে বিরক্তি আরো বাড়ল।

এবার একটু উঁচু স্বরেই সুমনাদেবী বললেন—"হ্যাঁ, খুব দিয়েছে বড়লোক বাবা! জানো মিসেস প্রসাদের ছেলেকে একসাথ টাকা দিয়েছে। অন্যান্য জিনিস তো সঙ্গে আছেই। মিসেস পান্ডের ছেলেকে একটা বাড়ীই দিয়েছে, মিসেস কুন্ডুর ছেলেকে এ্যামবাসাডর দিয়েছে। আমাকে ছোট একটা মারুতি দিলেই হোত। মারুতি আজকাল সবাই দিচ্ছে। আর আমার দাবি তো এমন কিছু অন্যায্য নয়: আমার ছেলেও একজন কস্ট এ্যাকাউন্ট অফিসার। তাকে তৈয়ারী করতেও তো আমার কম খরচা হয় নি।

আমার তো ঐ একটাই ছেলে—আর গাড়ী একখানা থাকলে যাওয়ার খরচাও বাঁচে। আমিই তো একা গাড়ী চড়ব না।"

মিঃ দেব একটু আপত্তি জানাবার চেষ্টা করেন। "আহা গাড়ী তোমার ছেলেই না হয় আস্তে আস্তে কিনে নেবে। তাই বলে বৌমার বাড়ীর উপর কি নির্ভর করা উচিত?" কোমল দেব ভাবলেন এই মোক্ষম কথাটা বললেই তার স্ত্রী চুপ করে যাবেন।

কিন্তু সুমনা দমবার মেয়ে নন। আজ তাঁর কাছে কোন কথাই মোক্ষম নন। আর ঐ একটি মাত্রই ছেলে। তার পজিশনেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে। স্বামীর উপর যথেষ্ট বিরক্ত হলেন তিনি। যেমন নাম তেমনি স্বভাব। কিন্তু না, তিনি নরম হলে তো চলবে না। এইবার নরম হলে তিনি তো আর সুযোগ পাবেন না। তাই কড়া মেজাজেই বললেন—"খোকাই গাড়ী কিনবে? কেন ওনাকে নিয়ে সোহাগ করার জন্য? আর আমার রুমু ঝুমু দুই মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে না? তাদেরকেও তো আমায় গুছিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া বাড়ীটাও তো আমি করেছি। এ তো আমি নিয়ে যাব না—সবই তো ওদেরই থাকবে।" তারপর গলাটা নামিয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে আবার বলতে লাগলেন। "সংসার চালাই আমি, তুমি কি বুঝবে? তোমরা তো টাকা এনেই খালাস। কথা বাড়িও না। দাতা-কর্ণ সেজে এলেন উনি তোমাকে পাঠানোই আমার ভুল হয়েছে। এত পাখীপড়া করানো সত্ত্বেও তোমার দ্বারা কোন কাজই হোল না। আমাকেই যদি সংসার চালাতে হয় তবে আমি যা উচিৎ মনে করব সেই ভাবেই করবো"।

মিঃ দেব একটু আমতা আমতা করে বলতে চেষ্টা করলেন "কিন্তু সুমনা তুমি একবার……"

"তুমি থাম", এক ধমকে সুমনা কোমল দেবের কথা বন্ধ করে দিলেন। অগত্যা কোমল দেব চুপ করে থাকাটাই যুক্তি সঙ্গত মনে

করে চুপ করে উপরে উঠে গেলেন। কবে যে প্রতিবাদ করেছিলেন আর কবে যে চুপ করে গেছিলেন তা তিনি সব ভুলেই গেছেন। যেদিন থেকে তিনি চুপ করে গিয়েছিলেন সে দিন থেকে বাড়ীর সবাই বুঝেই নিয়েছিল যে, সুমনার কথার উপর কারো কথা বলার ফল ভালো হবে না। কাজেই সেই ভাবেই চলছিল সংসার।

কিন্তু গণ্ডগোল শুরু হোল ছেলে অরূপের বিয়ের পর থেকে, এই চন্দনা আসার পর থেকে—অর্থাৎ চন্দনা যতই শিক্ষিত, সুন্দরী, মার্জিত রুচি সম্পন্না মেয়ে হোক না কেন, একখানা ঝকঝকে সুন্দর মারুতি গাড়ী সঙ্গে না আনায় সুমনার একমাত্র আশার বলি—সুমনা সহ্যই করতে পারছিলেন না। নিজের রাগের ঝাঁঝ চন্দনার উপর ক্ষণে অক্ষণে প্রকাশ্যে বা অলক্ষ্যে বর্ষিত হতে লাগল। ইতিমধ্যে অরূপকে তিন মাসের জন্য ট্রেনিংএ বম্বে যেতে হোল। আর সুমনাদেবীর কটু ব্যবহারও বাড়তে লাগল। চন্দনা শিক্ষিতা, নম্রস্বভাবের, নতুন পরিবেশে মাতৃস্থানীয়ার এই আচরণে হতবাক।চোখ ভরে জল আসত। কিন্তু গুরুজনের মুখের উপর জবাব দেওয়া বিবেকে বাধছিল। সুমনার রাগ তাতে আরো বেড়ে যাচ্ছিল। চন্দনা কথার উত্তর দিচ্ছে না বলে তিনি ভাবতেন তাঁরই বুঝি হার হয়েছে ও হচ্ছে। তিনি আরো বেশী করে বিরক্তিকর ব্যবহার করতে লাগলেন।

জামাই ট্রেনিংএ গেছে শুনে চন্দনার বাবা-মা এসেছিলেন মেয়েকে কয়েকদিনের জন্য নিজের বাড়ী নিয়ে যাবেন বলে। তখনতো সুমনা পাঠালেনই না। কয়েকদিন পরে পাঠাবেন বললেন। বেয়াইমশাইকে বললেন—"আপনি কারুর কাছ থেকে একটা প্রাইভেট গাড়ী নিয়ে এসে মেয়ে নিয়ে যাবেন এবং ঐ গাড়ীতেই ফেরৎ দিয়ে যাবেন। আমার পাড়াপড়শীরা জানে আপনার গাড়ী আছে। পরে যাই হোক প্রথম প্রথম সবাই লক্ষ্য করবে, বৌমা কিসে আসছে কিসে যাচ্ছে।"

কথাটা শুনে চন্দনার চোখ ফেটে জল এলো। ওর বাবাও খুব বিস্মিত ও মর্মাহত হলেন। বাপের বাড়ী থেকে ফিরে আসার পর চন্দনার রুটিন আগের মত চলতে লাগল। ঘরের সমস্ত ঝাড় পোছ, সকলকে খাবার দেওয়া, ননদদের ছোটখাট ফাইফরমাস খাটা সবই করতে হোত চন্দনাকে। অরূপ আসার এখনও একমাস বাকি। মন খারাপ লাগলেও এদেশের আর পাঁচসাতটা মেয়ের মতো চুপ করে রুটিনমাফিক কাজ করে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনায় চন্দনাকে একদিনেই যেন অনেক সাহস ও ব্যক্তিত্ব এনে দিল।

বইএর আলমারী ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ একটা বই থেকে একটা চিঠির খাম পায়ের কাছে পড়ে গেলো। লেখাটা দেখে কৌতূহল হোল, চিঠিটা খুলে বিস্ময়ে হতবাক। চিঠিটায় লেখা ঃ

"আপনাকে কি বলে সম্বোধন করব ভেবে পেলাম না। যাই হোক আমি দুচার কথায় আপনাকে একটা বিষয়ে লিখছি। আপনি অনুগ্রহ করে চিঠিটা পড়লে বাধিত হবো। আপনার মা-বাবার দাবী—পঞ্চাশ ভরি সোনা যৌতুক হিসাবে দিতে হবে। আপনি একজন শিক্ষিত উদার ব্যক্তি, আপনিই ভেবে দেখুন আমরা চারটে বোন, আমার বাবার পক্ষে কি সম্ভব এক এক জনকে পঞ্চাশ ভরি করে সোনা দেওয়া ? আপনি অনুগ্রহ করে একটু বিবেচনা করে দেখবেন।—ইতি সুমনা চৌধুরী"

চিঠিটা পড়ে চন্দনা হতবাক। কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতো চিঠিটা হাতে নিয়ে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিল তার খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ সুমনাদেবীর তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চিঠিটা লুকিয়ে ফেললো। মুখের চোয়ালও শক্ত হোল। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গেল। তারপর জামাকাপড় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। শাশুড়ির অনুশাসন আসতে লাগল উপর থেকে। তাতে চন্দনা কান দিল না। হঠাৎ ব্যক্তিত্বের নতুন

বিকাশ ঘটল তার মধ্যে। কখন ফিরে এলো সুমনাদেবীর খেয়াল নেই। পুত্রবধূর এইভাবে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়াতে শাশুড়ির মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। প্রথম থেকেই এই বেপরোয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সে তো আর কোনদিন তাকে মানবেই না। কাজেই আজই ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এসব এখানে চলবে না। এই ব্যাপারটা স্বামীকে অবগত করাবার জন্য সুমনাদেবী নিজের ঘরে ঢুকলেন। মিঃ দেব এক কোণে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। ঝাঁঝালো সুরে তিনি কিছু বলতে যাবার আগেই স্বামী তাঁকে বলে ওঠেন—"টেবিলের উপর তোমার একটা চিঠি আছে, দেখ।"

"আমার চিঠি, কে লিখলো?" বলে এগিয়ে এসে সুমনাদেবী খামটা তাড়াতাড়ি খোলেন। ওর মধ্য থেকে জেরক্স করা ওঁরই লেখা ছাব্বিশ বছরের পুরানো গোপন বয়ান বেরিয়ে পড়ে। বিস্ময়ে চোখ তুলে বলেন "কি করে এলো এ চিঠি?" মিঃ দেব আস্তে আস্তে কেটে কেটে বললেন—"বোধ হয় চন্দনা রেখে গেছে। এ ঘরে এসেছিল, দেখেছিলাম।"

সুমনাদেবীর চোখে লজ্জা ও অপমানের জলে জ্বালা। স্বামীর দিকে তাকান। মিঃ দেব উঠে আসেন। আস্তে করে স্ত্রীর হাতটা নিজের হাতে তুলে নেন, তারপর ধীর গলায় বলেন, "সুমনা মনে পড়ে কিভাবে তোমায় আমার বাবার আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছিলাম? চন্দনাও তো আমাদের প্রিয় সন্তানেরই সহধর্মিনী। তুমি কি . " বলতেই সুমনাদেবী স্বামীর মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে বলে ওঠেন "প্লিজ, থাক আর বলো না।"

প্রতিঘাত

শঙ্কর প্রসাদ দাশগুপ্ত

পরিমল মজুমদার খুব সুখী। অন্ততঃ দেখে তাই মনে হয়। পরিমল থাকে সাউথ ক্যালকাটার সাদার্ন এভিনিউতে। ছোট খুব সুন্দর বাড়ী। বাইরে নানা ধরনের পাতাবাহারের টব আর অজস্র ফুলের সাজানো পাত্র। নানা রংএর ফুল ফোটে সিজনে সিজনে। সামনের ছোট সবুজ লনের এক পাশ ঘেঁসে একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ। কাণ্ডটা সোজা উঠে গিয়ে চারিদিকে সবুজ পাতা ভরা ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে ছাতার মত দাড়িয়ে আছে। পাশে যুঁই ফুলের গাছটা বাঁশের খাম্বাকে ভর করে গন্ধরাজের ছাতার নিচে বাঁ দিক ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা গন্ধ বিলাতে ব্যস্ত। এগুলোকে সামনে রেখে সাদা রংএর দালান বাড়ীটা দোতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। নিচের তলার ফ্লোরিং মার্বেলের বসবার ঘর, পড়ার ঘর, রান্নার ঘর, খাবার ঘর সব নিচে। ড্রয়িং রুমটার দেওয়ালে নামী আর্টিষ্টএর দামী ছবি। তা ছাড়া প্রায় সব ঘরেই একখানা দুখানা নাম করা লোকের আঁকা ছবি। উপরটা আরো সুন্দর। দামী ফ্লোরের মোজাইক। দেওয়ালে সুন্দর স্নিগ্ধ রংএর ওয়ালপেপার।

এই বাড়ীতে থাকে পরিমল মজুমদার ও তার স্ত্রী রমা। পরিমল পঞ্চাশ উর্দ্ধে, রমা চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। এই বয়সেও পরিমল স্বাস্থ্য রেখেছে অটুট। বাইরে থেকে কারো মনে হবে না এত বয়স। যারা তার সঠিক বয়স জানে তারা বলে "হবে না কেন, অত পয়সার মালিক। ভাল খাওয়া দাওয়া। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন। কেন বয়স অল্প দেখাবে না"? কিন্তু পরিমল-রমার মনে

কোথায় যেন একটা অশান্তি। একটা অস্বস্তি। ভিতরে ভিতরে গুমড়ায়। হাসিখুশিতে থাকা সত্ত্বেও এই অস্বস্তি কখন-সখনও রাগে বা অসন্তোষে প্রকাশ পেয়ে যায়। তখন লোকে বলে "জানি জানি কেন অমন হয়। টাকার গরম। টাকা আছে বলে মানুষকে মানুষ বলে ভাবে না। ধরাকে সরা জ্ঞান করে।" আবার যারা জানে তারা বলে, "আরে না না ওসব কিছু নয়, সারা জীবন একা একা বয়ে গেল। ছেলে মেয়ে হয়নি। তাই এরকম এমন একটু আধটু হবেই, তাতে আর বিচিত্র কি।"

অথচ পরিমল আর তাঁর স্ত্রী এমন ছিল না। ছুটিছাটা বা সুযোগ পেলে নির্দিষ্ট কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সাথে ভারত দর্শনে বেরিয়ে পড়ে। তখন সবার প্রাণে একটা অদ্ভুত সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারে এই দম্পতি। ভ্রমণ সঙ্গী বাংলার প্রফেসর ব্রজেন চ্যাটার্জী আর তার লেকচারার স্ত্রী সীমা কথা, কাহিনী আর ছন্দে ভ্রমণটাকে চিরনতুন করে রাখে। বিখ্যাত বেহালা-বাদক নিত্যগোপাল সরখেল আর তার স্ত্রী নন্দা যন্ত্রসঙ্গীতে হাত দিলে উষর মরুভূমিকে উর্বরা করে তোলে। আর সাথে থাকে এক জোড়া কবি বিভূতি ও জ্যোৎস্না বর্মন। জীবনের প্রাত্যহিক অস্বস্তি কাটিয়ে সবাইকে নিয়ে চলে অমৃতলোকের পথে। এই সংসর্গে সবাই এক সাথে খায়, ঘোরে, মজা করে। তবে আলাদা ঘরে শোয়। এই পরিবেশেও পরিমল-রমার অস্বস্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রায়ই মিসেস মজুমদার প্রশ্ন করে, কেমন লাগছে "এই শহরগুলো বা স্পটটা"। প্রফেসর ব্রজেন চ্যাটার্জী বলেন, "খুব ভালো, বাংলার কালচারে এসব জায়গার কন্ট্রিবিউশন কতখানি তা বুঝতে হলে পড়াশুনার সাথে দেশ দেখা অবশ্য কর্তব্য।" মিসেস চ্যাটার্জী অন্ধ্রে অনেকদিন ছিলেন। ওদের ভাষায় সংস্কৃতজ অনেক শব্দের মিল খুঁজে পান। মজা করে বলতে পারেন। সাউথ ইন্ডিয়াতে গেলে উনিই হন প্রথম ও

প্রধান গাইড। স্বরচিত কবিতা শুনতে শুনতে মজুমদার যুগল কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেত। প্রথম প্রথম নজরে পড়ার আগে সম্বিত ফিরে পেত। এখন সহযাত্রীরা প্রশ্ন করে "কি হোল?"

আজকাল তাদের মনে হয় এই ভাবটা যেন বেড়ে গেছে। ঘনঘনই চুপচাপ হয়ে যায়। কাছের লোকেরা অস্বস্তি বোধ করে। মন খুলে কাউকে কিছু বলা তো দূরের কথা স্বামী-স্ত্রী পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে মুখ খোলে না। কোন কথাবার্তা বলে না। চুপচাপ থাকে। মাঝে মাঝে দুজনেরই মনে হয় অসহ্য। অথচ মিটমাট করে নেবে তার কোন চেষ্টা নেই। কেমন যেন একটা ভয়। মিটমাটের কথা বললেই আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে না তো? জীবনটা যেন কেমন একটা রুটিনের মত হয়ে গেছে।

রমা পরিমল মজুমদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। পরিমলের প্রথম বিয়ে একুশ বছর বয়সে। রূপাকে প্রেম করে বিয়ে! প্রাক্ বৈবাহিক প্রেমের জের চলেছিল দু'বছর ধরে। পয়সার অভাব ছিল না দুপক্ষের কোন পক্ষেরই। একটু উঁচু স্তরের বলে সামাজিক মেলামেশায় কোন পক্ষেরই আপত্তি ছিল না। তাই অবাধ মেলামেশায় নতুন ফল এলো। বিয়ে হয়েছিল হিন্দু মতে। বিয়ের আট মাসের মাথায় মেয়ে মিতার জন্ম। "দেখতে খুব সুন্দর, তাই না পরি?" প্রশ্ন করে রূপা, "তা আর বলতে" মিষ্টি হেসে জবাব দেয় পরিমল। "বলতো কার মত হয়েছে? তোমার না আমার মত" পরিমল জানতে খুবই আগ্রহী। "দেখতে প্রায় তোমার মত, তবে কপাল, চিবুক আর চোখ বোধ হয় আমার মত। আমারও নাকি জন্মাবার সময় একমাথা কালো কুচকুচে চুল ছিল।" "সত্যি ওকে ছেড়ে আমার কাজে যেতে ইচ্ছে করে না। মনের গোপন অভিলাশ চায় তোমাদের সঙ্গ-সুখ উদয়অস্ত।"

কিন্তু তারপর আর দুটো বছরও অমনি করে কাটল না। অফিসে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হোত। একঘেঁয়েমির জীবন। বৈচিত্র্যহীন শূন্যতা। কাজের জন্য থাকা অথচ কাজে আনন্দ নেই। সেই সময় রমা নিয়োগী অফিসে জয়েন করে। পরিমলের দপ্তরে। একঘেঁয়েমির সুর কেটে গেল, নতুন করে হাওয়া বইতে শুরু করল। হাওয়া শুধু তার কাছে আটকা রইল না। ছড়িয়ে পড়ল। হাওয়ার দৌত্যে রূপা পেল খবর। প্রথমটা রূপা বিশ্বাস করে নি, আর করার কথাও নয়। তবু পরীক্ষা করে দেখতে চাইল সত্যিটা কি?

একদিন নিউ মার্কেটে জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে দেখে লাইট হাউসের সামনে রমা আর পরিমল। সবে বারটার শো শেষ হয়েছে। দুজনে হাত ধরাধরি করে একটা ট্যাক্সিতে উঠল। নামল গিয়ে ডালহৌসিতে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে। দুজনে এগিয়ে চলল ডাইনিং রুমে। কোণের একটা আধো অন্ধকার টেবিলে "রিজার্ভড্" লেখা একটা লেবেল ছিল টেবিলের উপর। ওয়েটার এমনভাবে নিয়ে গিয়ে বসাল ওদের টেবিলে যেন ওরা কতকালের পরিচিত। অবশ্যই খুব আস্তে রূপা চুপি চুপি ওদের অনুসরণ করে নিজের চোখে সব প্রত্যক্ষ করল।

রূপার মনটা সেদিন বিষিয়ে গেল। দিনের বেলায় একজনকে নিয়ে চলা। রাতে আমাকে নিয়ে গ্রান্ড হোটেলে। যেন কিছুই হয়নি। মেয়েকে নিয়ে কত আদর। কত ছোট ছোট জিনিসপত্র তার জন্য কিনে আনা। এসব রূপার কাছে অসহ্য লাগলো। পরের দিন তিনটা নাগাদ রূপা সোজা পরিমলের অফিসে গিয়ে হাজির। বাইরে লাল আলো জ্বলছে তাতে লেখা 'নো এডমিশন'। সে সব অগ্রাহ্য করে ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে দাঁড়ানো রমার বুকের উপর বসা পরিমলের মাথাটা আলুথালু করে এলানো।

সেই দিনই মেয়েকে নিয়ে রূপা চলে যায় তার বাপের বাড়ী। নিজেই ডিভোর্সের ব্যবস্থা নিল। কিছুদিনের মধ্যেই মামলা শেষ। খোরপোষের দাবি করল না। রূপার রুচিতে বাধল। সে মরিয়া। পরিমলকে উচিৎ শিক্ষা দেবে। সে তাকে জগতের নিকৃষ্টতম জীব বলে ঘৃণা করে। রূপা মেয়েকে দাবী করে। পরিমল কনটেষ্ট করল না। একতরফা মামলায় রূপা জয়ী।

অফিসে ডিভোর্সের খবর যথাসময়ে পৌঁছে গেল। কথা এতদূর গড়াল যে অফিসের মধ্যে চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পরিমলকে তার কামরায় ডেকে পাঠান। "ডিভোর্সের খবর কি সত্যি?" "হ্যাঁ সত্যি।" "আপনি কি অফিসের মধ্যে রমা নিয়োগীর সাথে এমন কিছু অসঙ্গত আচরণ করেন যা দৃষ্টি কটু এবং অফিসের সুষ্ঠু পরিবেশের পরিপন্থী?" পরিমল চুপ করে রইল। তখন চেয়ারম্যান তাকে বললেন, "আপনি কি চাকরী ছেড়ে দেবেন না আমরা বরখাস্ত করব?" "আমি ছেড়ে দেব।" তবে চার্জ রিপোর্টে সই করুন—"চেয়ারম্যান সাহেব একখানা কাগজ পরিমলের দিকে এগিয়ে দেন। সই করে কাগজটা ফিরিয়ে দেয় পরিমল। তারপর চলে যায়। সেদিন রমা অফিসে আসে নি ফোন করে পরিমল তাকে পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলে আসতে বলে— "বিষয় গুরুতর। অত্যন্ত দরকার। এখুনি চলে এস। সময় নষ্ট করার সময় নেই"। হন্তদন্ত হয়ে রমা ছুটে এল। পরের দিন অফিসে পদত্যাগ পত্র দাখিল। বছর খানেক বাদে পরিমলকে বিয়ে করল।

এখন বয়েস অনেক হয়েছে। সন্তানসম্ভবা সে কোন দিন হতে পারে নি। না হওয়ায় একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ আছে। চিকিৎসায় কোন সুফল হয়নি। মনের এক অন্ধকার কোণে এ ব্যথার চেয়েও একটা বড় ব্যথা লুকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ব্যথাটা বেরিয়ে আসে। অস্বস্তি হয় নিজের। অস্বস্তি হয় তাদের—যারা সে সম্বন্ধে

সেখানে উপস্থিত থাকে। কারণটা সে নিজে জানে ভয়ে, বলে না কাউকে, এমন কি পরিমলকেও না। যে পরিমল এত হাসিখুশি ছিল সে আজকাল কেমন যেন বিষণ্ণ, বিমর্ষ। মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। তার ঝাঁঝ মাঝে মাঝে রমার উপর পড়ে। রমা সব সময় সহ্য করে না। করতে আর চায় না। তার ব্যথাও কম নয়। অনেক সময় বাইরের লোকের সাথেও সে আজকাল রূঢ় ভাবে কথা বলে। নিজের উপরে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তা যেন সে আজকাল হারিয়ে ফেলছে। তার দুঃখের কথা কেউ জানে না, জানবেও না। আঁচ করতে পারলেও সাহস করে রমা তা কোন দিন জিজ্ঞেস করে নি। খোলাখুলি ভাবে রমা বা পরিমল কেউ কাউকে নিজেদের গোপন ব্যথার অস্তিত্বের রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। দুজনেরই বেরিয়ে আসে বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস।

সেদিন অফিসের পর পরিমল যখন বাড়ী ফিরছিল তখন তার পুরানো অফিসের 'বসের' সঙ্গে দেখা। 'বসের' নিজের গাড়ী খারাপ হয়ে যাওয়াতে নিজেই গাড়ীটা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ঠিক করার চেষ্টা করছিল। গাড়ীটা থামিয়ে পরিমল তার আগের 'বসের' গাড়ীটা ঠিক করে দিল। 'বস্' নানা কথা বলতে বলতে এক সময় বলে ফেলল, "জানেন, রূপার মেয়ে মিতার বিয়ে আগামী পরশু তার দাদুর বাড়ীতে।"

পরিমলের মুখখানা আজ অতি বিষণ্ণ। মন রসহীন। গলাটা শুকনো, কর্কশ, রুক্ষ। কথা শুনে রমা যেন কেমন ভয় পেয়ে গেল। চা দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?" চুপ করে রইল পরিমল। অসহিষ্ণু হয়ে রমা বারবার একই প্রশ্ন করতে লাগল, "সব খুলে বল। আমারও অনেক বলার আছে। তোমারও বলার আছে। তুমি বলবে আমি শুনব। আমি বলব তুমি শুনবে।"

রমা আর কোন ভণিতা না করে বললো, "বিয়ে করেছি অনেক

দিন। টাকাপয়সার কোন কিছুর অভাব নেই। অভাব কিসের জান? অভাব শান্তির. মনের শান্তির। আমাদের বিয়েটা ঠিক হয় নি—আমার করা উচিৎ হয় নি। বিয়ের আগে আমি যা করেছি রূপা তা সব জানে। আমি তার সুখের সংসারে জ্বলন্ত ফুলকি ফেলেছি। আমার সেদিন উচিৎ ছিল তোমাকে ছেড়ে রূপার পাশে দাঁড়ান। সেদিনের রূপার তিরস্কার আজকের গোপন ব্যথার কাছে কিছুই নয়। পারিনি তা করতে।"

"না, না তা ঠিক নয়" মনে মনে পরিমল ভাবছে—রমাও কি তাকে ডিভোর্স করে চলে যাবে নাকি? তাহলে সে কি নিয়ে থাকবে? একাকীত্বের বিড়ম্বনা। সে কেঁদেই ফেলল। এই প্রথম প্রকাশ্যে স্বীকার করল "রমা আমিই দোষী। সে সময়ে আমি রূপার উপর অন্যায় আচরণ করেছি। দেহের শান্তির জন্য ছুটে চলেছিলাম। ফলে শুধু রূপা নয়, তোমার উপরও অবিচার করেছি।"

"আজ হয়তো ঠিক বলে চলেছ" রমার তাই বিশ্বাস। "মেয়েদের জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি জান? আজ অনেক দেরীতে বুঝেছি। সেটা হোল তার নিজের আত্মসম্মান। আমি মেয়ে হয়েও আর একটি মেয়ের আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারিনি। এইজন্যই আমি সবার অলক্ষ্যে এক বেদনা সহ্য করে আসছি। তুমিও করছ, আমরা দুজনেই করছি। আমরা আলাদা আলাদা ও যৌথভাবে দায়ী। এমনি করেই বোধ হয় মানুষে প্রায়শ্চিত্ত করে।"

তারপর দুজনেই চুপ করে রইল। কিছু সময় পরে রমাই আবার কথা বলতে শুরু করল। "পরশু বলছ তোমার মেয়ে মিতার বিয়ে। যাও। সকালে যেও। সুযোগ পেলে প্রকাশ্যে আশীর্বাদ করে এসো।"

পরের দিন সকালে রূপার বাপের বাড়ীর সামনে পরিমল

এসেছিল। লোকজন চলাফেরা করছে। কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে দিল রূপার বৃদ্ধবাবা। কথা না বলে, তাকে কিছু জিজ্ঞেস না করে তিনি সোজা ভিতরে চলে গেলেন। বেশ কিছু সময় পরে তিনি ফিরে এলেন। তারপর একটু থেমে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "রূপা তোমার সঙ্গে দেখা করবে না। মিতার সাথেও দেখা হবে না। তুমি এই মুহূর্তে চলে যাও।" "হ্যাঁ আমি চলে যাব, শুধু একটি বারের জন্য দেখা করতে দিন" কাতরকণ্ঠে এক ভিক্ষুকের আবেদন।

"না হবে না এখুনি চলে যাও"। দড়াম করে দরজা বন্ধের আওয়াজ। কে যেন মনের মধ্যে বলছে "মনে রেখ পিতা হয়ে জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ করনি। আজ কেন পিতার দাবী নিয়ে এসেছ?"

মোড়ের মাথায় আসতেই রমার সঙ্গে পরিমলের দেখা। গাড়ী নিয়ে এসেছে। কাঁদ কাঁদ মুখে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারছিল না পরিমল।

"দেখা হয়নি? আমি জানতাম। আগেই জানতাম। এমনিতে যেতে দিতাম না। কিন্তু আজ তোমার যাওয়া দরকার ছিল তাই দ্বিমত করিনি।"

পরিমলের রুদ্ধগলায় চাঁপা কান্নার আওয়াজ। রূপার সান্ত্বনা "এমন করো না। অনেক কাজ করার আছে। বাড়ীঘর পার্থিব সুখের চেয়ে অনেক বড় জিনিস আছে। সেটা পেতে হলে জীবন দিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এখনো অনেক কাজ বাকী। রূপা হয়তো মিতার জন্য করেছে। আরো হয়তো অনেক মেয়ে আছে। যারা কাজ চায়। চল দ্রুত চলি। সময় বেশ প্রথম পদস্খলনই জীবনের শেষ কথা বলে মানতে আমি

—

অমিলে মিল

ত্রিদিব কুমার বর্মন

বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির দাপাদাপি। ঈশিতা দেখছিল। একনাগাড়ে বৃষ্টি! ঈশিতার মন চাইছিল না কলেজ যেতে। আজ অবশ্য ওর দুটো মাত্র ক্লাশ। পার্থও ঘরে তখন। গবেষণার থিসিস্ নিয়ে ঘাটছিল কি যেন।

ঈশিতা বাংলার অধ্যাপিকা। আর পার্থ কেমিস্ট্রির। একই কলেজ। দৈনন্দিন যাতায়াত, কলেজে অধ্যাপনার অবসরে দু'জনার ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক।

পার্থ একা থাকত। ঈশিতাই দুম করে পার্থর বাসায় এসেছিল সেদিন। বলেছিল ঈশিতা পার্থকে—এই বিশ্রী ওয়েদারে কলেজ মুখো হতে মন চাইল না। তাই চলে এলাম। উত্তরে পার্থ জানাল—তাহলে আমিও না; গল্প করা যাবে। গবেষণার বিঘ্ন ঘটল ঈশিতা আসায়।

ঘন্টা দুই এভাবে কেটে গেল দু'জনার। কখনো কথা, কখনো বা নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধতা ঘরময়। ঈশিতা ভাবে বিভোর। পার্থও নিজ খেয়ালে। মাঝে মধ্যে টিকটিকির শুধু শব্দ। ওদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে হয়তো আঘাত করল না।

পার্থ নিজের বিছানায়। আর ঈশিতা পার্থর পড়ার চেয়ারে। এত বিমর্ষতা কেন? বিষণ্ণতার কালো মেঘ ওদের দু'জনকে গ্রাস করতে লাগল কেন!

এক সময় ঈশিতারই প্রথম ঘোর কেটেছিল। চেয়ার সরিয়ে পার্থর কাছ ঘেঁসে বসে বলল—কিছু ভাবছ? এই বল না, এনি প্রবলেম!

পার্থের চমক ভাঙল—নাহ্, কোন প্রবলেম নেই।

ঈশিতার চাপা, গুমরানো কথায় ভার ভার লাগছিল যেন। পার্থর কাছে হাল্কা হওয়া যায় না! দ্বিধা সংকোচ দূরে সরিয়ে অতীতের আয়নাটাকে সামনে ধরল ঈশিতা। পার্থ ঈশিতার অতীত মুখ দেখতে লাগল। ঈশিতা বলার আগেই পার্থের জিজ্ঞাসা—আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে? তুমি অনির্বাণকে ভুলতে পেরেছো? পারলে না কেন! পার্থ ওর ডান হাতের আঙ্গুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার বলল—সত্যি বলছি, আমি কিন্তু ভুলতে পারিনি।

স্মৃতির সাগরে ডুব দিল ঈশিতা···সেদিন রবীন্দ্র সরোবরে পার্থ একটা বই নিয়ে বসেছিল। ঈশিতা বলেছিল পার্থকে—দ্যাখো, লেকের জল কেমন টলটল করছে। কি সুন্দর, তাই না? যদি ঢেউ হয়ে ভেসে যেতাম দূরে, সেই স্বপ্নপুরীর দেশে···

—তোমার কাব্যিক মন। সাহিত্যিকরা যখন তখন আবেগের অথৈ জলে ডুবে যায়। ওসব ছাড়। বাস্তবকে ধরতে চেষ্টা কর। আমরা বাস্তবকে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। করতে ভালবাসি। আবেগে হাবুডুবু খাই না। তোমার আমার গরমিল তো সেখানেই।

ঈশিতার পাল্টা জবাব—পার্থ; ভুলে যাও কেন, মানুষ মাত্রই অবেগপ্রবণ—সে বিজ্ঞানী হোক্ আর সাহিত্যিকই হোক্।

পার্থও বলতে ছাড়ল না—ঈশিতা, আজ বলতে বাধা নেই। তোমার যেমন একটা অতীত রয়েছে, আমারও তেমনি। আমার সেই অতীত প্রিয়া—মোম। ওকে ভুলতে পারছি না কিছুতেই। পাঁচ পাঁচটা বছর ওকে দেখি নি, কথা বলিনি, কোন চিঠিও না। একেবারে বিচ্ছিন্ন। অথচ আমার মন ওকে টানে। ঈশিতা; অনির্বাণকে তুমি ছেড়ে দিতে পেরেছো? পেরেছো ভুলতে?

মাঝে মাঝে দেখি তুমিও কেমন উদাসী হয়ে যাও। নিজেকে হারিয়ে ফেলো। আমার মন বলে—অনিবার্ণের মন তোমার

সর্বাঙ্গে। ওর ছায়া তোমার হৃদয়ে। আমি বুঝতে পারি। কিন্তু হিংসে হয় না আমার। তোমার মতো আমিও যে। মোমের গলনে আমিও গলি। ওর ভাবনায় আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।

ঈশিতার আঙ্গুল ঠোঁটে। বুলোতে বুলোতে বলল—অতীত বাগানের গাছ-পালা কেটে ফেলি। তবু কোথায় যেন একটা বীজ থেকে যায়। সেই বীজ থেকে আবার বাগান ভরে ওঠে। কিছুতেই সে বীজ তুলে ফেলে দিতে পারি না।

ঈশিতার চোখে জল। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে—কতবার বলি, অনির্বাণ তুমি মর। শেষ হয়ে যাও চিরজীবনের মত। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও। কিন্তু ওর বিদ্রুপ হাসি। এ হাসির অর্থ আমার মনে তার আমৃত্যু বসবাস।

পার্থ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, তারপর বলল—মোম আজো আমার মনের এ্যালবামে। ওর মরণ কামনা আমিও করি। বারবার বলি, মোম তুমি মর। গলে গলে শেষ হবে কবে! কোন মানুষ কি চিরস্থায়ী? তবে ওর শেষ নেই কেন? মোমের মুখেও বিদ্রুপের হাসি। বলে—ছবি হয়ে চিরদিন জীবন্ত থাকব। অমর। বিশ্বাস কর ঈশিতা; আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার মন তোমাকে কতবার কতভাবে দিতে চায়। কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকালে সেই স্মিত হাসিমাখা মোম যেন আমার সামনে থেকে নড়ে না। জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে। আজো আমি তিলে তিলে মরছি। জ্বলন আমার সর্বাঙ্গে।

মাথা নত করে পার্থ আরো কিছু বলল—ভুল বোঝাবুঝিটা ভালবাসার চরম শত্রু। মোম আমাকে ভুল বুঝেছিল। তখন আমি ছাত্র। ভালোমতো ম্যাচিওরড্ হইনি। কলেজে যদিও পড়তাম ওর বাবা-মা আমার খুব ঘনিষ্ঠ। সম্পর্ক জেনে নেবার পর আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। আসলে ও আমার বোন। দূর সম্পর্কের। তখন থেকে আমাদের মেলামেশা আর

হয়নি। চিঠিতে মোম শেষবারের মতো জানিয়েছিল—কাওয়ার্ড, কাপুরুষ…।

আচ্ছা বলো, আমার দোষটা কোথায়! ওকে তখন থেকেই যে বোনের মর্যাদায় বসিয়েছিলাম। এরপরও নিয়তিকে দোষ দিই কেন! মোম জ্বলে পুড়ে আমার মনটাকে দিল বিঁধিয়ে। তারপর, তারপর ভালবাসার লাটাই থেকে প্রয়োজনের সুতোকে ছিন্ন করে লাট খাওয়া ঘুড়ির মতো তলিয়ে গেলাম দু'জনে। হায় মোম; আমি তোমাকে ঠকাতে চাই নি। আমাকে দোষী করলে। এ দুঃখ রাখবো কোথায়!

কিছুটা থেমে পার্থ আবার—আমি তো আর মর্মরমূর্তি না। রক্তমাংসের একটা মানুষ আমি। আমার সম্মান তোমার মধ্যেও। কতদিন কতরাত ভেবেছি, স্বপ্নে এসেছে মোমের সেই পেলব দুটো হাত। দু'হাত ধরে খেলেছি, ছুঁয়েছি। আবার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। ঘুম ভেঙ্গে যেত। ভাবতাম। কাউকে কিছু বলতে পারতাম না। আমি জানি তুমিও আমাকে ভালবাস। তীব্র ভালবাসা আছে তোমার। কিন্তু সেটা যে কৃত্রিম, রঙ্গিন স্বপ্নের কাগজে মোড়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি আমাকে অনির্বাণ ভেবে আঁকড়ে ধরতে চাও। আমি তোমাকে মোম ভেবে। আসলে আমাদের ভালবাসার পাত্র-পাত্রী পার্থ-ঈশিতা নয়। আমরা দু'জন দু'জনকে ঠকাচ্ছি। তাই না… ?

কথার শেষটুকু ফুটো করে ঈশিতা—দ্যাখো, অনির্বাণকে যতটুকু কাছ থেকে দেখেছিলাম ওর দোষ ততটা নেই। বারবার বলেছিলাম ওকে, এদেশে পার্টি-টার্টি করা চলে না। ওর এক কথা—পরিবর্তন আসবেই। আসতে বাধ্য। ও বড্ড আশাবাদী। আগে দেশ, দেশের জনগণ—তারপর ত' তুমি! আমার বাবা-মা জানতেন। কতদিন ওর জন্য অপেক্ষায় থাকা যায়! বলো, বলো পার্থ ?

তোমাকে পেলাম। অনির্বাণের ছায়া এসে পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। উঃ কি যে করি! আমি চাইতাম তোমাকে ভালবাসা দিয়ে ভরাট করে তুলব। মন আমাকে বলে, আমরা বোধ হয় বহুদূর সরে যাচ্ছি।

পার্থ নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না। ঈশিতাও না। দু'জনের মনে উথাল-পাথাল ঝড়। ঘরের বাইরে তখন বৃষ্টির পরিবর্তন। বর্ষণের তীব্রতা। বৃষ্টির ফোঁটা জানলা গলে আসছিল। বন্ধ করল পার্থ। তারপর ঈশিতাকে বেশ জোরে ঝাঁকিয়ে বলতে চাইল—এসো না ঈশিতা; আমরা দু'জন মনটাকে শক্ত করে নিই। হারিয়ে যাই চিরজীবনের মতো। এ সংসার, এ বাসভূমি আমাদের জন্য নয়। পারবে! বলো… বলো…জবাব দাও প্লিজ্। কিছু একটা বলো চুপ করে থেকো না।

ঈশিতার দু'চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। তৎক্ষণাৎ পার্থ ঈশিতাকে হাত বাড়িয়ে দিল পটাসিয়াম্ সায়ানাইড্।

—নাও, ধরো। অমৃত পান করো। আমিও খাব। আমাদের বেঁচে থাকার অর্থ তিল তিল করে মৃত্যুর মতো। এই KCN-ই আমাদের একমাত্র স্বস্তি। মুক্তির পথ।

ঈশিতার দ্বিধামন। নিজের সাথে কথা বলল।

অবশেষে শক্ত হয়ে ঈশিতা বলল—দেখ পার্থ, আমার সব চিন্তা, সকল আবেগ, আমার হৃদয়ের সমস্ত ভাব, প্রাণের সকল বৃত্তি দিয়ে নতুন করে তোমাকে সাজাতে পারি না কি! আমার দেহের প্রতিটি কোষ, রক্তের প্রতিটি বিন্দু, সব সব যদি তোমাকে অর্পণ করি আপত্তির কি থাকতে পারে! নতুনভাবে আমরা বাঁচতে পারবো না কেন? আয়নায় অতীত জীবনের ছবি মোছা যাবে না?

পার্থ অবিচল। আয়নায় চিড় ধরলে চিড়ই থাকে। ওঠে না।

ঈশিতা আরো গলাতে চাইল— তুমি আমাকে দিয়ে যা চাও, তাই আমি হব। তোমার বিধানে আমার জীবন ধারণ আর মৃত্যুই হোক, সুখ কিম্বা দুঃখ আসুক—যা কিছু তোমার কাছ থেকে আসুক সবই স্বাগত। তোমার প্রত্যেকটি দান আমার কাছে দিব্য বর। শেষবারের মতো তোমার মনকে জিজ্ঞেস করো মত বদলানো যায় কি না।

পার্থের পায়চারি বাড়তে থাকে। তখনো হাতে ধরা KCN শিশিটি। ছিপিখানা উদোম। মুহূর্তে ঘুরে পার্থ বলল— তোমাদের মতো মেয়েদের দু'ধরণের কথাবার্তা। সুবিধেবাদী, নীতিজ্ঞানহীন। তবে, তবে কেন এতক্ষণ নাটক করলে ?

পার্থ আছাড় দিল বিষের শিশিটা। নীলকণ্ঠ মেঝে। মুহূর্তে শুষে নিল। পার্থের চোখেমুখে রাগের আস্ফালন। ঈশিতা জরিপ করল।

ঈশিতা এগিয়ে গেল। পার্থকে সোহাগ নেশায় ভরাতে চাইল। অনুরাগের ছোঁয়ায় পার্থের সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা ঈশিতার। পার্থের কাছে, খুব কাছে ঘনিষ্ঠ স্পর্শের যেন খেলা চলল দু'জনার।

ভিন্ন দুই মেরু এখন এক মেরুর প্রান্ত সীমারেখায়।

ঈশিতা পার্থের কাছে মুখ রেখে ফিসফিসিয়ে বলল—আজ থেকে তুমি আমায় মোম বলে ডেকো। মুছে দিলাম আমার আসল নাম। তুমিই আমার অনির্বাণ। মোম রইল অনির্বাণ শিখায় ....।

অনঙ্গ প্রেম

বিউটি মজুমদার

ক'দিন ধ'রে কাজের বউটি আসছে না। হাঁড়িকুড়ি মশালাপাতি জলকল নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে সোমা। কি জানি ওর স্বামীটার অসুখ বিসুখ করলো কিনা। পার্বতীর নিজের তো রোগবালাই বলে কোন বস্তু নেই। যা কিছু কামাই সব ওর স্বামীরই অসুখ বিসুখের কারণে। এবারে আবার ক'দিনের ধাক্কা কে জানে। আজকাল প্রায়ই তো কামাই লেগে আছে অথচ আগে এমনটা ছিল না। বছরে বলতে গেলে তিনশ পয়ষট্টি দিনই যথাসময়ে হাজির। বউটি বেশ কাজেরও। আর কাজকর্মও বেশ পরিস্কার। হাসিখুশী বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য নয়। তবে গোমড়া মুখ করেও থাকে না। অনেক দিন বিয়ে হয়েছে। ছেলেপুলে হয়নি। আর বোধ হয় হবেও না। ওর স্বামী কখনও ঘরামি কখনও দিন মজুরের কাজ করে। দুটিতে যা রোজগার করে তা দিয়ে দিব্যি ওদের সংসার চলছে। বরং আর পাঁচটা কাজের লোকের চাইতে অনেক ভালো ভাবে চলছে—কারণ রোজগার ওদের অনেক বেশী।

আজকাল অবশ্য পার্বতীর স্বামী নগেন্দ্র ঠিক আগের মত খাটতে পারে না। মাঝে মধ্যেই জ্বর জারিতে ভোগে, শরীরটা নাকি দুর্বল লাগে। রোজ আর কাজে বেরোয় না। পার্বতী নূতন করে আরও দু'তিনটা ঠিকে ধরেছে সেই ঘাটতি পূরণ করতে। নগেন্দ্র ওকে সাহায্য করে। টালিগঞ্জের এদিকটায় যে নূতন উপনিবেশ গড়ে উঠেছে, সেখানে কর্পোরেশনের কল নেই। সব বাড়ীতেই টিউবওয়েল। নগেন্দ্র কল পাম্প করে দেয়, পার্বতী চটপট বাসন কোসন ধুয়ে নেয়। পার্বতী ঘর দোর

মোছে, নগেন্দ্র মশলা বাটে। মাঝে মধ্যে যখন নগেন্দ্র দিনমজুরি কিম্বা ঘরামির কাজে বেরোয়, সেদিন পার্বতী নাকানি চোবানি খেতে থাকে। আর সোমাদেরও ঝামেলা বাড়ে। সময় মত সব বাড়ীতে কাজে আসতে পারে না। দুদ্দাড় করে কোনও রকমে কাজ সারে। অথচ আগে অমনটা ছিল না। কেন যে মরতে আরও কাজ জুটিয়েছে—ভাবে সোমা। কি দরকার বাবা ওদের অত টাকার। ওরা তো ফ্যান ফ্রিজ টিভির স্বপ্ন দেখে না। ছেলে পুলেও নেই। তবে অত খেটে মরা কেন।

এইরকম দিনগুলিতে পার্বতীর মুখেও সোমার ভাবনার পরিপোষক কথা। কাজ করে, আর আপন মনে গজ গজ করে—কত করে বইল্লাম আর কাজ নে দরকার নেই। আমি আর পারবো নি। গতরে দ্যায় না। তা মিনসে শুনবে? বলে কিনা দু'একটা কাজ জুটিয়ে নেও। নাহলি পরে চলবে কেমনতরা; দেখতি পাওনি হাজার রোগ ব্যামোর শরীর। বিছানায় পড়ে থাহি। শোন কথা, কি হবে অত টাকা পয়সা দে। আম্মাগের তো ছেলেপুলে নেই। কারে দে যাবো। তাহলি পরে অত খেইটে মরি কেনে। তা এখনও শখ মেটেনি বুড়োর। ছেলে পুলে নাকি এখনও হলি হতি পারে। ছেলে ছেলে কইরে মইল্ল যা। ও মল্লি পর আমার হাড় জুড়োয়!

যে মরলে পার্বতীর হাড় জুড়ায় তার জন্যে দরদের অন্ত নেই ওর। একটা ভালো জিনিষ দাঁতে কাটবে না ও সেই শত্তুরকে না দিয়ে। যা-ই দাওনা কেন সেটাই পোঁটলা করে নিয়ে যাবে বাড়ী। আসলে নিঃসন্তান নারীর বুভুক্ষু মাতৃ হৃদয়ের স্নেহধারা অনেকটাই স্বামীর উপর বার্ষিত হয়ে চলেছে।

চার পাঁচ দিন পরে পার্বতী এসে হাজির। কিছু জিজ্ঞাসাবাদের আগেই কেঁদে এসে পড়লো—ও বউদি গো, আমি আর বাঁচবোনি। আমার কি হবে গো। আমার কপালে এ-ও ছেলো!

সোমা উদ্বিগ্ন—কি হলো ? নগেন্দ্রর কি বেশী রকম অসুখ করেছে ? কি হয়েছে, জ্বর ? ডাক্তার দেখিয়েছো ?

—ওর কিছু হয়নি গো বউদি, হইয়েছে আমার। আমারই কপাল পুইড়েছে।

সোমা ধমকে ওঠে—কি হয়েছে খুলে বলবে তো। আবোল তাবোল বকছ কেন ?

—খুইলে বলার আর কী রইয়েছে। তোমাদের ঘরে তো কত ওষুদ বিষুদ আছে, বিষ থাইলে আমারে দ্যাও। বউদিগো খেইয়ে প্রাণের জ্বালা জুড়োই।

এবারে সোমা রীতিমত ক্ষিপ্ত—দেখো পার্বতী, আজে বাজে বকতে হলে বাড়ীর বাইরে গিয়ে বকো—এসব পাগলামী শোনার সময় আমার নেই। আর শুনতে ভালোও লাগছে না।

—অ বউদিগো রাগ কইরো নি, রাগ কইরো নি। কি বইলব কপ্যালের কথা ! মিনসে আরেকটা বিয়ে করার জইন্যে খেইপে উঠেছে। বলে—ছেলেপুলে না থাইলে আবার জেবন কিসির। বেঁচে থেহি লাভ কি ? আমি বইল্লাম— তা আমি কি কইরবো ? ভগমান না দিলি পরে আমরা কি কত্তি পারি ? তা বলে কি না— আমার আমার করিসনি, তুই বাঁজা, তাই আমার এই হাল। আমি আরেকটা বিয়ে কইরবো—ছেলে পুলে নে সংসার কইরবো। তোরে আমার ঘর থেহে দূর কইরে দেবো—শোনো কথা। সাতদিনে একদিন কামে যাবে, আমার পয়সায় খাবে দাবে, আবার আমারেই ঘর থেহে দূর কইরে দেবে ! এ-সব ওই হারামজাদীর কারসাজি। রাইত-দিন গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর। ও বেটিই ওর কানে মন্তর দেছে। এ আমি হলপ্ কইরে কইতি পারি। আমার কপাল পুড়ালি ওরও সব্বনাশ হইবে এই আমি কইয়ে দিলাম !

—কার কথা বলছো ? কে বুদ্ধি দিল নগেন্দ্রকে ? ব্যাপারটা খুলেই বলোনা।

—আরে ওই যে গো, আমাগের পাশের ঘরে থাহে। জবার মা। উর বইনটারে গছাবার তালে আছে। আমি তহনই····

সোমা বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করে—তা তুমি এখন কি ঠিক করলে ?

এই কয়দিন তো বুঝাইয়ে ঠাণ্ডা করিছি। বউদি তুমি আমারে হাসপাতালে নে চলো। ডাক্তার দেখায়ে আসি। মানুষডা রাজী হইয়েছে—আর দেড় দুবছর দ্যাখপে।

—সেই রাজী হলে। আজ পাঁচ ছয় বছর ধরে তোমায় বলে আসছি ডাক্তার দেখাও, ওষুধ খাও। তোমার স্বামীকে পরীক্ষা করাও। চল্লিশ বছর বয়স হতে চললো তোমার, এতদিনে তোমার টনক নড়েছে। ঠিক আছে দু-চার দিনের মধ্যেই আমি ব্যবস্থা করবো। এখন কান্নাকাটি বন্ধ করে একটু চায়ের জল চাপাও দেখি। মাথাটা তো একেবারে ধরিয়ে দিয়েছো।

—আর আমার তো মাথা ঘুইরে গেছে বউদি। ওরে ছাড়া আমি থাকতি পারবো নি। আর সতীন লইয়েও ঘর করতি পারবো নি।

কাঁদতে কাঁদতে পার্বতী চায়ের জল চাপাতে গেল। মনটা সোমার ভারী হয়ে রইল। দুদিন বাদে তোমার পঞ্চাশ বছর বয়স হবে, ফের এখন তোমার বিয়ের সাধ জাগল ? আর আজকে চব্বিশ প'চিশ বছর ধরে তোমার বউটা যে তোমার জন্যে এত করলো, সে সব কিছু নয় ?

কয়েকদিন বাদে সুযোগ মত পার্বতীকে হাসপাতালে দেখিয়ে নিয়ে এলো সোমা। ডাক্তার কোন আশাই দিলেন না। পার্বতীর কান্না আর থামে না। এ কান্না সন্তান না হবার দুঃখে যত নয়, তার চাইতেও স্বামীকে হারাবার ভয়ে। আহা বেচারী !

মাস দুয়েক পরে পার্বতী হঠাৎ একদিন বলল—সব ঠিক কইরে ফেল্লাম বউদি। সেই মেয়েডার সাথেই মানুষডার বিয়ে দে দেবো। ওর যখন অত ছেলেপুলের সাধ···।

সোমা অবাক। সে কি! এই যে বললে, তোমার স্বামী দেড়-দুবছর আরও দেখবে, আর তুমি নিজেই বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলে? বলিহারি যাই বাবা!

—কিন্তু বউদি ডাক্তার তো জবাব দে দিল। তবে আর লোকডারে ঠকাই কেনে? আমি তো বুড়ীই হইয়ে গেলাম। ওর সাধটা তো মিটুক।

এই ঘটনার পাঁচ সাতদিন পরে এসেই পার্বতী খবর দিয়ে গেল—ওর স্বামীর খুব অসুখ। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ দেখা দিয়েছে। গায়ে জ্বর। খুব কষ্ট পাচ্ছে। কাজে কাজেই পার্বতী কাজে আসতে পারবে না, ওর স্বামী ভালো না হওয়া পর্যন্ত। সোমার কাছ থেকে আগাম টাকা চেয়ে নিল ওষুধ পথ্য কেনার জন্যে। দশ-পনের দিনও যখন পার্বতী কাজে এল না তখন ওদের বস্তির একজনকে দিয়ে খবর নিল সোমা। নগেন্দ্রের অসুখ কমেনি। ডাক্তার বলেছে অপারেশান করতে হবে। শুনে মনটা ওর ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। এর দু চারদিন পরেই পার্বতী কেঁদে কেটে এসে যা বলল তার সারমর্ম এই—নগেন্দ্রের পুরুষাঙ্গ কেটে বাদ দিতে হবে। সোমাকে কিছু টাকা সাহায্য করতে হবে।

টাকা নিয়ে যাবার সময় চোখের জল মুছতে মুছতে শুনিয়ে গেল, ভালোই হইয়েছে বউদি। ও তো আর পুরুষ মানুষ থাইকবে না, বে-ও কইত্তে পারবে না। চিরকাল মানুষডা আমারই থাইকবে। তবে ওর কষ্টটা আর চোখে দেখা যায় না।

বুঝতে বাকী রইল না নগেন্দ্রর ক্যানসার হয়েছে। ক'দিনই বা বাঁচবে। কিন্তু মনে হয় পার্বতী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে পুরুষাঙ্গ ছেঁটে ফেলে নগেন্দ্র ভালো হয়ে ঘরে ফিরবে।

পার্বতীকে নিয়ে ঘর করবে। চিরকাল পার্বতীরই থাকবে। আর কারোর হবে না।

একেই কি বলে অনঙ্গ প্রেম? পার্বতী তো আর কিছু চায় না নগেন্দ্রর কাছে। না খাওয়া-পরা, না ঘরকন্নায় সহায়তা, অথবা দৈহিক মিলন। না, কিছুই চায় না সে স্বামীর কাছে। নগেন্দ্র শুধুমাত্র ওর হয়ে ওর কাছে থাক—শুধু এইটুকু।

হে ভগবান কত লোকই তো ক্যানসার নিয়ে দিব্যি কিছুদিন বেঁচে থাকে, নগেন্দ্রও যেন বেঁচে থাকে তেমনি। তোমার করুণায় কী না সম্ভব!

নগেন্দ্র হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে পার্বতী সোমার সাথে দেখা করল। বেশ খুশী খুশী, বললো—অনেক কষ্ট কইরেছ তুমি বউদি, আর তোমায় কষ্ট দেবো না। ঠিক সময় মত কাজ কইরে দে যাবো। টাকা পয়সার দরকার। লোকডার দেহ সাবাতে হইবে। আর, ওরে কোন কামকাজ কইরতে দেবোনি। রোগা মানুষ একা একা ঘরে পইড়ে থাইকবে, এটা ভাবলিই কষ্ট হয়। কিন্তু কি কইরবো উপায় তো নেই। সারাডা দিন ওর কাছে বইসে থাকলে খাওয়া জুইটবে কোথা থিকে?

চোখে জল এসে গেল সোমার, বলল—পার্বতী, তুমি সীতা সাবিত্রীর থেকে কোন অংশে কম নও। সত্যি তোমার ভালোবাসার কোন তুলনা হয় না।

পার্বতী লজ্জা পেল। বলল—কি যে বলো তুমি। ও কি আমারে কম ভালোবাসে? শুধু একটা ছাওয়াল থাইকলে কোন দিনও বে-র কথা মুখে আনত না।

কিন্তু নগেন্দ্র বাঁচলো না। কয়েকমাস পরেই মারা গেল। সোমার বাড়ী ছাড়া পার্বতী সব বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিল। সোমা জানতে চাইল, চলবে কি করে তোমার? পার্বতী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল—একটা পেট কোন রকমে চইলে

যাবে। কার জইন্যে খেইটে মরবো। যার জইন্যে খাইটতাম সে-ই তো আমারে রেইখে চইলে গেলো।

শেষ পর্যন্ত পার্বতী সোমার কাজও ছেড়ে দিল। এবারে ওর একটা পেটই বা চলবে কি করে ? জানতে চাইলে জানাল—অন্য এক বাড়ী কাজ নিছি, আয়ার কাজ, বাচ্চা রাখার কাজ।

পার্বতী আরও বলল—এ কাজই নিলাম বউদি। মানুষডা এত বাচ্চা-কাচ্চা ভালোবাইসতো…আমি তো তারে ছাওয়াল দিতি পারলাম না… একটা ছাওয়াল থাইলে তো তারে নাড়তাম-চাড়তাম, যত্ন আত্তি কত্তাম…দেইখে মানুষডা খুশী হইতো। তা তারে তো সে সুখ দিতি পাইল্লাম না। এহন না হয় পরের ছাওয়ালরে কইরবো। ওর আত্মাডার তো শান্তি মিলবে !

দোঁহা লাগি দুঁহু

ইন্দ্রাণী মাথা নিচু করে কোর্টরুমের বাইরে পা বাড়াল। অবাধ্য চোখ দুটো কেবলই জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে অজস্র লোকের গুঞ্জন, কানাকানি। এ সব যে তাকে ঘিরেই বুঝতে বাকী নেই। কিন্তু কিছুতেই আর তার কিছু এসে যায় না। কোর্টরুমের বাইরে, বারান্দায় একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে আলতো করে চোখ দুটো মুছে নিল একবার। মজা দেখতে আসা লোকগুলো ধীরে সুস্থে বেরিয়ে যাচ্ছে। নজরে এল খানিকটা দূরে রুমা, ফাল্গুনী ; ইন্দ্রনীল নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রজিৎ গেছে ট্যাক্সি ডাকতে। ফেরেনি

এখন সে অনেকটা সহজ বোধ করছে। এদিকে ওদিকে চোখ হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে যেন গলার কাছে উঠে এল। বুকের ধড়াস ধড়াস নিজের কানে শুনতে পাচ্ছে। শোভন এসে দাঁড়িয়েছে ওপাশটায়। পোসাক-আষাক তেমনি নিখুঁৎ পরিপাটি। চুলগুলি শুধু রুখু এলোমেলো। শৌখিন চশমাটা নামিয়ে চোখ মুছছে রুমালে। একি আবারও কাঁদছে নাকি! পুরুষ মানুষের পক্ষে ভারী বেমানান। ছি, ছি! আস পাশে কত লোক। ইন্দ্রনীল রুমারাও দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়। কি ভাবছে ওরা? ইন্দ্রাণীর নিজেরই কেমন লজ্জা করছে। এত সামান্য কারণে ভেঙে পড়তে আছে পুরুষ মানুষকে? কিন্তু, কারণটা কি সত্যি সামান্য? তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার মত তুচ্ছ? তা বই কি। কত সহজেই তো সব চুকে বুকে গেল। অথচ একদিন ।

সে দিনটাও ছিল এমনি ফাল্গুন মাস। মধু ঋতু যাকে বলে। দাদার শালীর বিয়েতে গিয়েছিল। সামান্য অলঙ্কার, হালকা প্রসাধনে আর তুঁতে নীল বেনারসীতে নীল আগুনের শিখার মত। উৎসব বাড়ীর অগণিত অভ্যাগতের সপ্রশংস দৃষ্টি বারে বারে ওকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। চেনা অচেনা যুবকরা স্তাবকের মত ঘুর ঘুর করছিল ওর আসপাশে। তারপর হঠাৎই সদ্য আগত একজনের মুখে ইন্দ্রাণীর মুগ্ধ চোখের চাওয়া থমকে গেল। গলানো সোনার মত রঙ। স্পর্ধিত নাক। গভীর টোলখাওয়া চিবুক। ব্যাকব্রাস করা একমাথা চুলের কয়েক গোছা এসে পড়েছে চওড়া কপালে। রিমলেস চশমার ভেতরে বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে চোখ। নীল রঙের দামী স্যুট পরনে। লালচে মেরুণ রঙের দামী টাই।

আজ পর্যন্ত সে কোন পুরুষ মানুষের দিকে এমন তারিফী চোখে তাকায়নি। চমক ভাঙল বৌদির বোন শ্যামলীর কথায়— এই যে আলাপ করিয়ে দিই, দিদির ননদ—ইন্দ্রাণী। দারুণ গায়!

ইনি হচ্ছেন শোভনদা—দুর্দান্ত আবৃত্তি করেন। সুন্দর হাত দুটোকে সুচারু ভঙ্গিতে ছুঁড়ে ইন্দ্রাণী মিষ্টি গলায় বলেছিল নমস্কার! পাল্টা নমস্কার জানিয়ে সপ্রতিভ শোভন, দারুণ পুরুষালী গলায় বলল—এই বসন্ত-সন্ধ্যায় সত্যি-কারের ইন্দ্রাণীর সাথে আলপচারী হওয়াটাকে পরম সৌভাগ্য মনে করি। যাই বলুন তারিফ করতে হয় তাঁদের, যাঁরা আপনার নামকরণ করেছিলেন। কি মনে হচ্ছে জানেন? সঞ্চারিণী নীল বিজুরী-রেহা। এমন একটা দারুণ চমক আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করে আছে, আর আমি কিনা ভীড় ভাট্টার ভয়ে না আসার মতলব আঁটছিলুম! ভাগ্যিস, সামাজিক দায়িত্ব না এড়িয়ে চলেই এলুম। নইলে আপনার সাথে হয়তো কোনদিন আলাপই হতো না।

ইন্দ্রাণী সলজ্জ হাসিতে প্রশ্ন করেছিল—তাতে কী আর হতো বলুন তো? শোভনের চট জলদি জবাব—কি আবার? দারুণভাবে আপনাকে মিস্ করতাম।

বাঃ জানতে পেতেন কি করে? আচ্ছা, আচ্ছা—একেই বুঝি বলে আপনি কি হারাচ্ছেন আপনি নিজেই জানেন না? বলে ইন্দ্রাণী হাসল রিনি রিনি। হাসল শোভনও ভরাট গলায় হো হো করে। ওদের মিলিত হাসির মধুর শব্দে অনেকেই চমকে তাকাল এদিকে।

বিয়েটা ছিল গোধুলি লগ্নে। তাই বাসর বেশ জমে উঠেছিল। আর সে আসরে ইন্দ্রাণী আর শোভন পরস্পর আরও আকৃষ্ট হলো এবং মুগ্ধও। সকলের অনুরোধে ইন্দ্রাণী গাইল—জাগরণে যায় বিভাবরী। একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন জলে।

বাঃ আপনার দেখছি রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ দুয়েতেই সমান দখল, অনায়াস বিচরণ—বলে এমন করে ইন্দ্রাণীর মুখের

দিকে শোভন তাকিয়ে রইল, ইন্দ্রাণী লজ্জায় লাল। লাল আবীর ছড়িয়ে যাচ্ছে বুকের আনাচে কানাচে। তারপর একসময় সমস্ত ঘর আর ইন্দ্রাণীর হৃদয়টা মথিত করে গমগম করে বাজতে লাগল শোভনের উদাত্ত কণ্ঠস্বর—"আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা গড়িবনা ধরণীতে।"

সেদিন অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছে ইন্দ্রাণী। মনটাকে বুঝি সাথে আনতে পারেনি। নিজের মনে একটা গানের কলি গুন গুন করেছে বারে বারে—"মন দিয়েছি প্রথম দেখাতেই।" সে রাত থেকে শুরু হয়েছে তার স্বপ্ন দেখা: অন্তরের মাটি পায়ের নিচে থেকে অনেকখানি সরে গেছে। সে যেন এক হাল্কা ডানার বিহগী। চঞ্চল পাখনায় অজানা এক ছটফটানি।

তারপর, কখন কিভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, কখন ওরা ভাবতে শুরু করেছে—'দে আর মেড ফর ইচ আদার'—সে সব কথার অনেক কিছু গেছে হারিয়ে, আর অনেক কিছু ছবি হয়ে এখনও ভেসে বেড়ায় ইন্দ্রাণীর কালো চোখের তারায়।

বেশ কিছুদিন মেলামেশার পরও ইন্দ্রাণী জানতে পারেনি, শোভনের পেশা কি। আসলে জিজ্ঞেস করার কথা মনেই আসেনি। শোভনই কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছে, পেশায় সে ডাক্তার। প্রাইভেট প্রাকটিস করে। পসার সামান্যই। আসলে খাওয়া পরার ভাবনা তো ভাবতে হয় না। চাকরি বাকরি করা পোষায় না। আর টাকা স্বর্গ টাকা ধর্ম করে প্রাকটিসের পেছনে লেগে থাকা, ছোঃ!

ইন্দ্রাণী ভেবেছে—পোষাবে কি করে? ধাতটা যে শিল্পীর। পোষাক আসাক সাজগোজ, চালচলন কথাবার্তা সবই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। কিন্তু পসার জমাতে অন্যরকম ধাত চাই। পরে নিশ্চয়ই শুধরে নেবে অনেকটা। সংসারটা ঘাড়ে চাপুক। তাছাড়া ইন্দ্রাণী এখন এম, এ পড়ছে। পাশ করে সে-ও বসে

থাকবে না। দুজনের উপার্জনে ছোট্ট সংসার ভালো ভাবেই চলে যাবে।

আসলে ইন্দ্রাণীর তখন সব কিছু খতিয়ে দেখার মত মনের অবস্থা নয়। সে তখন প্রতিদিনের দেখাশোনার ছোট ছোট সুখস্মৃতির খড়কুটো দিয়ে নীড় রচনা করে চলেছে আপন মনে। কি ভাবে যে দুটো বছর মিলিয়ে গেল চোখের পলকে। জানতে পেলনা ওরা। শুধু সান্নিধ্য নিবিড় হলো আর ওরা আরও অন্তরঙ্গ। বন্ধুমহলের মিষ্টি পরিহাসটুকু—মেড ফর ইচ্ আদার—দুজনের মনের তারে ধ্রুপদী সঙ্গীতের মত বাজতে লাগল। দুজনের জগৎ কোন বিপর্যয়েই আব আলাদা হতে পারে না—এ সত্য ওরা বিশ্বাস করল একান্ত ভাবে।

ইতিমধ্যে ইন্দ্রাণী এম. এ. পাশ করে একটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেছে। সঙ্গে এম্-এড্। আর জানতে পেরেছে, শোভন কোন পাশ করা ডাক্তার নয়। নেহাতই শখের হোমিওপ্যাথি করে। সেই প্রথম, ডানা ঝাপ্টে মাটিতে পড়ে বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল ইন্দ্রাণী। অত্যন্ত চতুর মনে হল শোভনকে। কথার ফাঁদে জড়িয়েছে' বলে কিনা—ডাক্তার! প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে। কথার কারচুপি নয়তো কি? তবে এ সব কথা জানার অনেক আগেই তো ইন্দ্রাণী মন হারিয়েছে। ওই বাক্ চতুরীতেই। এত সুন্দর করে কথা বলে শোভন—নিমেষে মন টানে। সে নিজেই তো কতবার বলেছে ওকে—শোভন না হয়ে তোমার নাম হওয়া উচিৎ ছিল—চারুবাক্।

পূর্ব বাংলার ভিটে মাটি ছেড়ে আসার সময় শোভনের বাপ-কাকারা বেশ কিছু সাথে এনেছিলেন। তাকে মূলধন করে, এখানে ঘাঁটি গেড়ে, শোভনের দাদারা লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছিলেন। আজ তাঁরা প্রতিষ্ঠিত, শুধু শোভন ছাড়া। ঐ দেবদুর্লভ চেহারা আর অফুরন্ত স্বাস্থ্যের সম্পদ নিয়ে নিতান্তই

বাক্‌সর্বস্ব। সংসার থেকে শুধু নেবে. দায় ঘাড়ে পাতবেনা এতটুকু—কেমনধারা পুরুষ মানুষ! অথচ এতদিন মেলামেশা করেও শোভনের অক্ষম পৌরুষকে সনাক্ত করতে পারেনি সে। এই উড়ো উড়ো ভাবটাকে শিল্পীসুলভ ঔদাসীন্য ভেবে আরও আকর্ষণ বোধ করেছে। কেমন একটা মোহাবেগের মধ্যে ঋতুগুলি আবর্তিত হয়েছে, স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে, চিরবসন্তের মাদকতা নিয়ে। সে সবের জন্যে কি শুধু শোভনই দায়ী? দায় নেই এতটুকু তার-ও? প্রতি মুহূর্তে সে-ও কি নিজেকে অনেক রমণীয় অনেক আকর্ষণীয় করে তুলে ধরে প্রলুব্ধ করেনি শোভনকে? এ দায় এড়ায় সাধ্য কি!

তবুও, ফিরবার কথা যে মনে জাগেনি, তা নয়। পরিচিত মহলে চাপা থাকবে না শোভনের বেকারত্ব। তখন? ফেরাতে পারেনি তা-ও নিজেকে। ফিরে আসার ভাবনাটাতেও নিজেকে ছোট ঠেকেছে। তবে কি শোভনকে নয়, ভালোবেসেছে সম্ভ্রান্ত একটা পেশাকে! হোক সামান্য পসার, তবুও তো ডাক্তার। আজ সে সব মিথ্যে হয়ে যাবার সাথে সাথে ভালোবাসাও মিথ্যে! মানুষ হিসেবে কোনই কি মূল্য নেই শোভনের! শুধু মাত্র বেকার বলে? না, না। তা কেন হবে। শিক্ষিতা স্ত্রী যদি স্বামীর রোজগারে স্রেফ পায়ের উপর পা দিয়ে দিন কাটাতে পারে, তবে উল্টোটাতে আপত্তি কিসের? কিন্তু, কেমন যেন অসম্মান-জনক মনে হয় না ব্যাপারটা। পুরুষ মানুষের পক্ষে অকর্মণ্যতা বড় বেমানান এ সংসারে। উঁহুঁ। ইন্দ্রাণী কখনই শোভনকে এমন অপদার্থের মত বাঁচতে দিতে পারে না। চরিতার্থতায় ভরিয়ে দেবে তাকে। সার্থকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেবে। কিন্তু এখনই কিছু বলবে না। বিয়েটা আগে হয়ে যাক। পরে। নয়তো শোভন ভাববে ভালোবাসায় ফাঁকি আছে ইন্দ্রাণীর। তা ভাবতে দেবে না সে। বিয়ের পরে এক স্বাচ্ছন্দ্যময় গৃহকোণের স্বপ্ন জাগিয়ে তুলবে শোভনের মনে। আর তখন…।

কিন্তু ইন্দ্রাণীর সব পরিকল্পনাকে ভেঙে দিয়ে নির্ভেজাল বেকারের ভূমিকাই পালন করে গেছে ওই অপদার্থ। দিনের পর দিন। এর কারণ হয়তো, স্বপ্নের সেই ছবি, সে নিজেই আঁকতে পারেনি শোভনের মনে। তার বদলে নিজেই বিভোর হয়ে থেকেছে রূপবান স্বামীর যৌবনমদ মত্ততায়।

শোভনের দাদারা বেকার ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারটাকে মোটেই ভালো চোখে দেখেননি। বিশেষ করে ইন্দ্রাণীকে। ইন্দ্রাণী উচ্চ শিক্ষিতা, উচ্চবিত্ত ঘরের, তায় রোজগেরে। আবার সেও কি না কলেজে অধ্যাপনা। বেকারের-পত্নী হয়েও সংসারে আধিপত্য চাইবে নিশ্চয়ই। একান্নবর্তী পরিবারের চাহিদা মেটাতে ভাইয়ের নয়—তার বউয়ের টাকা নিতে হবে হাত পেতে। সুখেরও নয়, সম্মানেরও নয়। নয়তো, দু-দুটো প্রাণীকে একেবারে নিখরচায় পোষা…।

কাজে কাজেই একটা অনাদর পরিবেশে খানিকটা মাথা নীচু করেই শ্বশুরবাড়ীতে ঢুকতে হয়েছে ইন্দ্রাণীকে। তার কাছে সেটা পীড়াদায়ক। তবুও দাম্পত্য জীবনের বাসন্তী মরশুম অনেক কিছুকেই অনায়াস করেছে, সহনীয় করেছে।

শ্বশুর-শাশুড়ি বেঁচে নেই। ভাশুররাই কর্তা। বিয়ের তিনটি মাস না ঘুরতেই, বড় জায়ের আপত্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে, তাঁরা শোভনকে পথ দেখতে বলেছেন। শোভন অবশ্যি কানে তোলেনি। অন্য জায়েরা ঠাট্টাচ্ছলে কোন অপমান করেনি তাদের মাকাল মার্কা দেওরটিকে। শোভন নির্বিকার। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করেছে ইন্দ্রাণীর। যতই নির্বিকার থাকুক, নির্লিপ্ত থাকতে পারেনি শোভন। দেওর ভাজে চলেছে বাদানুবাদ। ইন্দ্রাণীর কাছে যা মনে হয়েছে—রুচিহীন। যতই দুঃসহ ঠেকুক, না শোনার ভান করে থেকেছে দিনের পর দিন। কিন্তু, মাঝে মাঝে এই নির্লজ্জ বার্তালাপের ধারা যখন শ্লীলতার সীমা ছাড়ায়,

ইন্দ্রাণীর শরীর যে, অসহ্য রাগে পুড়তে থাকে শুধু তা-ই নয়, দুর্বিষহ ঘেন্নায় রি রি করতে থাকে। না-শোনার ভানেও জ্বালা মেটে না। ছুটে, পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। এমনতর বে-আব্রু অশালীনতায় নিজেদের প্রেমকে বড় বেশী জৈবিক, বড় বেশী ইদ্রিয়জ বলে মনে হতে থাকে। আর শোভনকে বড় বেশী সাধারণ—নিতান্ত ইতর মনে হয়। ইন্দ্রাণীর ক্লেদাক্ত মন নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, সংসারের প্রেক্ষাপট ছাড়া মানুষকে সঠিক চেনা যায় না।

শোভন যতই নিরুত্তাপ থাকুক, ইন্দ্রাণী পারেনি বেশীদিন প্রতি পলে এই অপমানের ভার বইতে, অবজ্ঞার কাঁটা সইতে। শেষ পর্যন্ত একটা ছোট-খাট বাড়ী দেখে উঠে গেছে সেখানে। সুন্দর করে সাজিয়েছে ঘর, পরিপাটি করে সংসার। এমন একান্ত করে নিজের একটা সংসার পেয়ে বেশ কিছুদিন মজে থেকেছে। আর তেমন নিতান্ত সাধারণ মনে হয়নি শোভনকে, যেমনটি শ্বশুরের ভিটেয়, বছর না ঘুরতেই আবার এলোমেলো। মনে হতে শুরু করেছে—এ কেমনতর? সমর্থ এক পুরুষমানুষ শুধু শুয়ে বসে বুলি কপচে কাটিয়ে দেবে? না এমনটা চলতে দেওয়া যায় না। তাই, চরম পত্র পেশ করেছে স্বামীর কাছে। সমান দায়িত্ব না নিলে এ সংসারে একটি শিশুর প্রবেশ নিষিদ্ধ। রাগ করেছে শোভন। এ কেমন কথা! এমনটা আশা করিনি তোমার কাছে। সংসারে সকলেই কি বাঁধাধরা ছকে চলবার জন্যে জন্মেছে? ব্যতিক্রম থাকতে নেই? কোথাও দাসত্ব করতে পারব না বলে পিতৃত্বে অধিকার থাকবে না—এত বড় কথা বললে কি করে?

অধিকার থাকবে না, তা তো বলিনি, বলেছি—দায়িত্ব ঘাড়ে করতে, কথার কপচানিতে চলবে না।

—কথার কপচানি! এই বান্দার কথার কপচানিতেই তো

পাগল হয়েছিলে। বিয়ের আগেই জেনেছিলে—আমি বেকার। তোমার বাবা, দাদা, গোটা পরিবারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে এলে কেন তবে আমার ঘরে ?

—তোমার ঘরে ? এটা তোমার ঘর ? বলতে লজ্জা করে না ?

—ও ! এ আমার ঘর নয় ? ঠিক উল্টোটি হলে, কোথাও কি বাধত তোমার, একে নিজের ঘর বলতে ?

থমকে যায় ইন্দ্রাণী। এ ভাবে তো ভেবে দেখিনি কখনো। সত্যিই তো। সমান অধিকার চাই এ যুগে, অথচ সেই পুরুষ নির্ভরতা ! হুঁ, সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব। শোভনও নিক না সমান দায়, পালন করুক না সমান দায়িত্ব। উহুঁ, এমনি ভাবে হবে না। এতদিন ইন্দ্রাণী শুধু তাগিদই দিয়েছে। আর নয়। উঠে পড়ে লাগবে।

কিছুদিনের মধ্যেই দাদাদের ধরে পড়ে ভদ্রস্থ একটা চাকরির ব্যবস্থা, ইন্দ্রাণী করেই ফেলল এক রকম। বাকী যেটুকু ফর্মালিটিস তার জন্যে আটকাবে না—এতে সে নিঃসন্দেহ।

সেদিন খুব খুশী মনে একগোছা রজনীগন্ধা আর কিছু পেস্ট্রি নিয়ে বাড়ী ফিরল। চায়ের টেবিলে খাবারের প্লেট স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে চা ঢালতে ঢালতে বলল—দারুণ একটা সুখবর আছে—আন্দাজ করো। শোভনের জিজ্ঞাসু উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল—উহুঁ, বলব না। তোমাকে বলতে হবে।

নির্ঘাৎ শীক্‌লীভ্‌ নিয়েছ কলেজ থেকে—খুশী খুশী গলা শোভনের। সেকি ! ঘাড় নাড়ছ যে ? হলো না ? তাহলে তা হ'লে,—দুজনে যাচ্ছি নাকি ভেসে কোন রামধনুর দেশে ? চল না, কাশ্মীরটাই ঘুরে আসা যাক। সামনের গরমের ছুটিতে ? থাকব কিন্তু বোটহাউসে। নিরালা ভাসমান সংসার। তোমারও থাকবে না কোন দায়, কোন ঝামেলা ঝক্কি। আঃ ! জলের

ছলছলাৎ আর দোলা। চোখের সামনে পাহাড়, বরফ ঢাকা। তার বাকি'লা চূড়ায় ভোরের আলোর সোনালী তবক, সন্ধ্যায় অস্তরাগের ভাগ। ভাবতেই রোমাঞ্চ। গেলে তো ··। থাকবে না কলেজের তাড়া, হাতেও কোন কাজ নয়। তখন তোমাকে না···।

মাঝে পথেই উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিতে ইন্দ্রাণী নিস্পৃহ প্রশ্ন করে - খরচা কোত্থেকে আসবে শুনি ?

— ও নিয়ে ভেবো না। দাদাদের সঙ্গে রফা হয়েছে। তাঁরা আমাকে শিগগীরই আমার অংশের তিরিশ হাজার দিয়ে দিচ্ছেন।

—সে কি ! কবে এসব ঠিক হল ? বলনি তো।

—টাকাটা শেষ পর্যন্ত পাই, না পাই তারই ঠিক ছিল না। দাদাদের তো না দেবারই মতলব। এতদিন আমাকে খাওয়াতে পরাতেই নাকি ভাগের টাকা উশুল হয়ে গেছে। তা বড় বৌদি জোর লড়াই চালিয়ে শেষ পর্য্যন্ত এই টাকা কয়টা দিতে রাজী করিয়েছেন ওঁদের। বড় বৌদির তো আরও বেশী দেবার ইচ্ছে ছিল। আর মেজবৌদি সেজবৌদিও ওঁদেরই দলে। বলে কিনা লর্ড ব্যারনের মত নাকি আমার পোষাক আসাক। তা বড়-বৌদির সাথে পারবে কেন—সাফ বলে দিয়েছেন—ওকে মানায়, আর এই বয়েসে শখ মেটাবে না তো কি ? সে যাকগে, যা পাওয়া যায় কি বল ? কিছু দিনের মধ্যেই পেয়ে যাব মনে হয়। তাই বলছিলাম—চল, ভূস্বর্গটা ঘুরেই আসি।

বাড়ী সম্পর্কে একটাও মন্তব্য না করে ইন্দ্রাণী বলল—বেশ তো যাব। তার আগে তুমি চাকরিতে জয়েন কর।

—তার মনে ? তুমি সব তাতেই কি শুধু-শর্ত আরোপ করে যাবে ? আগে চাকরি তারপরে বেড়ানো ? চাকরি কি হাতের মোয়া ? অমনি বলে বসলে—আগে জয়েন কর।

—হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ। হাতেরই মোয়া। সব ঠিকঠাক। ভালো মাইনে। কালই একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট করিয়ে আনতে

হবে। তুমি শুধু তোমার ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট গুলো এনে দাও ও বাড়ী থেকে।

হঠাৎ রেগে গেল শোভন—কতদিন তোমায় বলেছি, চাকরি করা আমার পোষাবে না।

—কেন এমন করছ লক্ষ্মীটি! ভালো একটা সুযোগ এসেছে। বড়দা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। নামকরা কম্পানিতে—সেলস-এ। চেহারা পত্তর, বলা-কওয়া স্মার্টনেস কোন কিছুতেই তো আটকাবে না। অসুবিধেও নেই কিছু। ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে না। অফিসে বসেই কাজ।

কিন্তু শোভনের এক কথা। এ-সবের কোন প্রয়োজন নেই আমার। যদি এতই অসহ্য হয়ে থাকি তোমার জীবনে, তা হলে দূরে সরে যাব।

ইন্দ্রাণী বিব্রত—আমি কি তাই বলেছি? এটা বোঝনা কেন, আমাদের এ সমাজ ব্যবস্থায় সমর্থ পুরুষ মানুষের ঘরে বসে থাকাটা কেউ ভালো চোখে দেখে না। দেখে অবজ্ঞার চোখে। সেটা আমি সইতে পারিনে। তাই বলছিলাম, কাজে লেগে যাও। দেখোই না কেমন লাগে। ছাড়তে আর কতক্ষণ?

—জীবনের চরিতার্থতার জন্য কি ডিগ্রির, দরকার হয়? রবীন্দ্রনাথের ক'টা ডিগ্রি ছিল? নাকি তার কাছে এ সবের মূল্য ছিল কিছু। আর এও নিশ্চিত, তাঁর সহধর্মিনী কোনও কালে স্বামীর কাছে সার্টিফিকেট তলব করেননি।

ইন্দ্রাণী হতবাক। কী স্পর্ধা লোকটার! এক অভ্রংলিহ প্রতিভার সঙ্গে নিজের তুলনা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী খোলেন নি? ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ পাঠান নি, ডিগ্রি হাসিল করতে? এ সব কথা কাকে শোনাবে ইন্দ্রাণী। এই অকর্মন্য বাক্সর্বস্ব পণ্ডিতমন্য লোকটাকে? সারাটা শরীরে তুষের আগুনের জ্বালা। ইন্দ্রাণীর আর বুঝতে বাকী নেই এই

কথার মার প্যাঁচের আড়ালে ভয়ানক সত্যটা লুকিয়ে আছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠটুকুও মাড়ায়নি শোভন। আর এমনতর একটা লোক অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণীর স্বামী। অথচ কিছুটি বুঝবার জো নেই। আলাপ আলোচনায় এ দীনতাটুকু কেউ কোনদিনই ধরতে পারেনি। আসলে লোক ঠকাবার মতন কিছুটা বাইরের পড়াশোনা আছে। অদ্ভুত এক মনের অবস্থা ইন্দ্রাণীর। কি করবে এখন। এই লোকটার জন্যে দাদাদের কাছে এক ঝুড়ি মিথ্যার বেসাতি তুলে ধরতে হবে।

এর পরের কয়েকটা দিন দমবন্ধ করা গুমোট আর প্রাণান্তকর সহাবস্থান। একান্ত ঘনিষ্ঠ দুটি নরনারী পরস্পরের কাছে কেমন অচেনা, অজানা। মেঘ জমেছে মনের কোণে। অভিমানের কালো মেঘ। ইন্দ্রাণীর মনের মেঘ অপমানের জ্বালায় অনেক বেশী বজ্রগর্ভ, দুঃখের অশ্রুজলে অনেক বেশী ভারাক্রান্ত। তবুও, হঠাৎই একদিন মেঘ কেটে গেছে। আলোয় ঝলমল করে উঠেছে দুটো উন্মুখ প্রাণ। আর ওরা কাশ্মীর বেড়াতে গেছে। ভূস্বর্গের অমর্ত্য সৌন্দর্য্য দুটো মাটির মানুষের মনকে ভরিয়ে দিয়েছে কানায় কানায়। বাস্তবের হিসেব নিকেশ সব মিথ্যে করে দিয়ে দুটো পার্থিব দেহ পেয়েছে অমৃতের স্বাদ।

হ্যাঁ, টাকাটা জুগিয়েছে শোভনই। তার পাওনাগণ্ডা বুঝে পেয়েছে সে।

ছকটা আগেই কষে রেখেছিল ইন্দ্রাণী। কাশ্মীর পরিক্রমা সেরে এসে ছোট্ট ডিস্‌পেন্সারী সাজিয়ে দিয়েছে। হোমিও চিকিৎসার চেম্বার। রাস্তার ধারে দেড়খানা ঘর। একেবারে আধুনিক কেতায় পরিপাটি। চেহারার চটক আর কথার চমক তো আছেই শোভনের। জানেও একটু হোমিওপ্যাথি। ইন্দ্রাণীর তম্বির তাগিদে আগেকার গা-ছাড়া ভাবটাও তেমন নেই। সকাল বেলাটা সম্ভব নয়। কিন্তু সন্ধ্যের দিকে অনেক কষ্টে ঘন্টা-

দুয়েক সময় বের করে নিয়েছে। সে-ও বসে তখন চেম্বারে। প্রেসক্রিপশান দেখে ওষুধের ডোজ তৈরী করে। রুগীর নাম ধাম, রোগের বিবরণ লেখে। রূপধন্য দম্পতির মিলিত প্রয়াসে পসার বেশ জমে উঠতে লাগল। ওদের চারপাশে আবর্তিত সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ওরা যেন এক আলাদা জগৎ গড়ে তুলল দুজন দুজনকে নিয়ে। হু হু করে সময় কেটে যায়। কিন্তু কঠিন হয়ে দেখা দিল পরীক্ষার সময়টা। সে মরশুমে শুধু খাতার পাহাড়। তাই হটাবে, না শোভনের সাথে সহযোগিতা করবে চেম্বারে? অমানুষিক পরিশ্রম। এত ছোট্ট সংসারে দিন রাত্তিরের লোক রাখার বিলাসিতা মনেও স্থান দেয়নি সে। মন জুড়ে শুধু একটা স্বপ্ন—শোভনের নাম হবে। পসার বাড়বে, বাড়বে প্রতিপত্তি। কারোর চোখে আর অপদার্থ ঠেকবে না। আর তখন একটি শিশুর কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠবে ইন্দ্রাণীর সংসার।

কিন্তু আশ্চর্য এই শোভন। দু'তিনটা বছর পেরুতে পেল না, পাততাড়ি গুটিয়ে আবার ঘরে।

—ভালো লাগছে না ইন্দ্রাণী। রোগ আর রোগের ফিরিস্তি। কোন চার্ম নেই। নাক্স ভোম, পালসেটিলা, রসটক্স আর সাইলেসিয়া। এর মধ্যে জীবনের রস নিঃশেষ করে ফেলার কোন মানেই হয় না। তার চাইতে বরং একটা বইয়ের দোকান দেওয়া যাক, কী বল?

কি বলবে ইন্দ্রাণী? হতবাক সে। পসার জমে উঠেছে। পয়সাকড়িও আসছে। সব চাইতে বড় কথা হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্যেও এক ধরণের রস পায় ইন্দ্রাণী। হোমিওপ্যাথিটা যেন তারও আয়ত্তে এসে গেছে অনেকটা। অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করার মধ্যে যেমন রস আছে অধ্যাপনায়, তেমনি ভিন্নতর রস রয়েছে আধি-ব্যাধি দূর করতে এই হোমিও চিকিৎসায়। কিন্তু

একবার জেদ ধরেছে শোভন, তখন আর কিছু হবার নয়। তাই একান্ত নিস্পৃহ জবাব দিল—বইয়ের দোকান? সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।

—তা ব্যবসা করতে গেলে টাকা পয়সা কিছু লাগবে বই কি।

—কিন্তু এতো টাকা···ইন্দ্রাণী ভাবনায় পড়েছে।

—ভাবছো কেন? আমার তো কিছু আছে। তার পুরোটাই ইনভেস্ট করে দাও না কেন? বাকী যেটুকু দরকার, তা না হয় তুমি দিলে। লাভের অংকটা তো দুজনেই ভোগ করব।

—হুঁ, সেটা না হয় দিলাম কিন্তু তুমি কতো দিন লেগে থাকতে পারবে? দুদিন বাদেই তো দ্বিধা কাটতে চায় না ইন্দ্রাণীর।

—প্লীজ, কিন্তু কিন্তু করো না। আর কিছু না হোক, সময়টা তো কাটবে ভালো। সারাটা দিন কলেজে কাটাও। আমার সময় কাটতে চায় না। সব কিছু বিস্বাদ লাগে। বইয়ের দোকান হলে, তোমার সাথেই বেরিয়ে পড়ব। বই পড়ে আর বই বেঁচে কাটিয়ে দেব সারাটা দিন। এমনি করে তোমাকেও কাছে পাব সারাক্ষণ। তুমিও তো কলেজে বই নিয়েই সময় কাটাও।

অগত্যা হোমিও চেম্বার পাল্টে বইয়ের দোকান। তা বই বেচা তেমন হোক না হোক, কিছু বই পড়েছিল বটে শোভন। ভালো লেগেছে ইন্দ্রাণীর। দেশী-বিদেশী সাহিত্যের আলোচনায় দাম্পত্য জীবনে একটা নূতন সুর লেগেছিল। কিন্তু সে সুরটুকু কেটে যেতে বেশী সময় লাগেনি। না এর জন্যে স্বামীকে দায়ী করতে পারবে না সে। বাদ সাধলেন স্বয়ং বিধাতা। এমনিতেই শোভনের লেন্সের দারুণ পাওয়ার। রোজ বইয়ের হরফে এতটা সময় কাটানোতে দেখা দিল চোখের ট্রাবল। ডাক্তারের নির্দেশে পড়াশোনা বন্ধ। অতএব চুকল দোকানের পাটও।

এর পরের ইতিহাস নিতান্তই গতানুগতিক। কলেজ, বাড়ী সংসারের কাজ, খাতা দেখা। কিছু পড়াশোনা। কখনো সখনো শোভনকে পড়ে শোনানো। একঘেঁয়েমির চূড়ান্ত। ঘরে একটি নবজাতক এলেও হয়তো জীবনটা ভরে উঠত। কে জানে। মা তো আর হতে পারেনি ইন্দ্রাণী। তবে এটুকু বুঝতে পারে একটি শিশুর চপলতা সংসারে অনেকটাই বৈচিত্র্য আনতে পারে। পারে জীবনকে অনেক স্বাদু করে তুলতে।

কে এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী তার হিসেব নিকেশ নিয়ে বসে থাকেনি ইন্দ্রাণী। এমন কি যিনি তার জীবনের সমস্ত বিড়ম্বনার মূলে, সেই বিধাতা পুরুষটির উপরও অভিমান পুষে রাখে নি এবং কবে কখন, সে নিজেও জানে না, তার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় শোভনকেই সেই অনাগত শিশুর জায়গাটিতে বসিয়ে আদরে সোহাগে, ভরিয়ে দিতে শুরু করেছে। সেবা যত্নে, শাসনে তর্জনে বাধা আর নিষেধে ইন্দ্রাণী হয়তো কণ্টকিতই করে তুলেছে শোভনের জীবন। আশ্চর্য্য! সব কিছু খুশী মনে মেনে নিয়েছে শোভন। আর এই মেনে নেওয়াটা একটা বিস্ময়কর সুখের চেহারা নিয়ে ধরা দিয়েছে তার মনে। তুচ্ছ হয়ে গেছে ইন্দ্রাণীর নিজের জীবন নিজের কাছে। এ নিয়ে কখনো সখনো শোভন মৃদু আপত্তি জানালে বলেছে—আমার জন্যে ভেব না। মেয়েদের শরীরে সব সয়। আমার যত ভাবনা তো তোমায় নিয়ে।

এমনি হয়তো আমরণ চলতে পারত। কিন্তু বাদ সাধল এবারে ইন্দ্রাণীর নিজের শরীর। দেখা গেল মেয়েদের শরীরেও সব সয় না। দারুণ অবসাদ। দুরপনেয় ক্লান্তি। শরীর আর বয় না। কলেজ ছেড়ে দিতে পারলেই যেন ভালো হয়! উপায় নেই। সংসার চলবে কি করে? এখনই চুপচাপ বসে গেলে সঞ্চয় তো নিঃশেষ হবে অল্প দিনেই। বুকের তল থেকে

নিঃশ্বাস উঠে আসে। আরও দীর্ঘ সময় তো কাটাতে হবে দুজনের।

মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে ছুটির দরখাস্ত করে দিয়ে বিশ্রাম নিতে চাইল ইদ্রলণী। সঙ্গে চলতে লাগল চিকিৎসা। তবু প্রয়োজনীয় বিশ্রামটুকু নেবে তার পথ কই? সংসারটা তো চালু রাখা চাই। এতদিন পরে, অসুস্থ শরীরটা নিয়ে ইন্দ্রাণীর চোখে পড়তে লাগল শোভনের হাজারো ত্রুটি, আর অন্তহীন স্বার্থপরতা। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাবে না। এতটুকু হাত লাগাবে না সংসারের কাজে। না বাজার, না হাট। হয় নিজের দেহটার উপর, নয়তো ঠিকে ঝি'র দয়ার উপর নির্ভর করে বসে থাকে। অসহ্য। ইদ্রাণীর শরীর যত বেশী বিশ্রাম খোঁজে, তত যেন শোভনের আয়েস বেড়ে যেতে থাকে। আব্দার আর অবুঝপনার শেষ নেই বুঝি।

স্বামীর যত্ন আত্তি করার নামে নিজেরই অজান্তে ইন্দ্রাণীর মনে যে বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হয়েছিল তা শুকিয়ে কাঠ। প্রথমে প্রেমের সোনাঝরা দিনগুলি তো এখন স্বপ্ন মনে হয়। রোজ খিটমিটি, বচসা। এতে করে গ্লানি আর অবসাদে আরও ভরে উঠল জীবন। অব্যাহতি খোঁজে ইন্দ্রাণী। কারণ, দিনে দিনে ওদের সম্পর্ক দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। একসাথে থাকার আর কোন মানে হয় না। তাছাড়া শোভনকে সে পুরোপুরি হারাতে চায় না। তিক্ততম পরিস্থিতির আগেই সে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। যাতে করে একাকীত্বের নিভৃতিতে, প্রথম প্রেমের দীপ্তিতে উজ্জ্বল শোভনকে নিয়ে সে আপনমনে নাড়াচাড়া করতে পারে। এই সম্বলটুকু হারিয়ে গেলে, শুধু তো পড়ে থাকবে কলহক্লিষ্ট খাঁ খাঁ শূন্যতা।

শোভন প্রথমটা গররাজী হলেও শেষ পর্যন্ত মিউচুয়াল ডিভোর্সে রাজী হয়েছে। শুধু হাজার পঞ্চাশেক টাকা চেয়েছে ইন্দ্রাণীর কাছে। ইন্দ্রাণী এক কথায় রাজী। সত্যি তো মানুষটার

চলবে কি করে। শোভন না খেয়ে মরবে, কিম্বা এতদিন পরে ভাইদের কৃপাপ্রার্থী হবে তা চায় না সে। টাকাটা দিলে ইন্দ্রাণীর ভবিষ্যৎ কিছুটা নড়বড়ে হবে সন্দেহ নেই। তবে রোজকার অশান্তির হাত থেকে তো রেহাই মিলবে। দু'একটা ট্যুইশানি নিতে হবে আর কি। কষ্ট হবে। তবুও, এই প্রেমহীন জীবনের অবসান হোক।

সেই অবসানটুকুই আজ ঘটে গেল। এইমাত্র বিচারপতি তার রায় ঘোষণা করলেন—ওরা আর স্বামী-স্ত্রী নয়। ওরা একদম আলাদা। আলাদা বৃত্তে ওদের বসবাস করতে হবে। ওদের ঘনিষ্ঠতা এখন আইনের চোখে ব্যাভিচার, গ্যারকানুনী। ইন্দ্রাণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। ওরা দুজনে একদিন মনে প্রাণে বিশ্বাস করত—ওরা একে অন্যের জন্যে। কী আশ্বর্য এই জীবন। একদিন যাকে চোখে হারাই, তাকেই কত না অবহেলায় ত্যাগ করি। খুব করে বেঁচে থাকাটা যে কি করে নিছক মরণ হয়ে দেখা দেয়!

ইন্দ্রজিৎ ফিরেছে। এগিয়ে এসে বলল—ছোড়দি, ট্যাক্সি এসেছে। অনেক কষ্টে জোগাড় করলাম। একটু দেরী হয়ে গেল।

সহসা শোভন এগিয়ে এসে ইন্দ্রজিৎকে বলল—তোমার ছোড়দির সাথে একটা কথা ছিল। তুমি যদি একটু…।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। থতমত খেয়ে ইন্দ্রজিৎ ঝট করে দূরে সরে গেল।

শোভন ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ ভরাট গলায় প্রশ্ন করল—আমি একা একা কি করে থাকব? তারপর চকিতে ইন্দ্রাণীর ডান হাতটা নিজের দুটো হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে ব্যাকুল গলায় বলল—তোমাকে ছাড়া কি করে বেঁচে থাকব। বলো, জবাব দাও।

ইন্দ্রাণী কোন কথা বলল না। ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর ইন্দ্রজিৎকে ডেকে একান্ত শান্ত গলায় বলল—তোকে আরেকটু কষ্ট করতে হবে। শোন্ আরেকটা ট্যাক্সি ডেকে আন তোদের জন্যে। আমরা এই ট্যাক্সিটাতেই যাচ্ছি।

—আমরা মানে? ইন্দ্রজিতের বিস্ময় ঠাঁই মানে না।

—আমরা মানে, আমি আর তোর জামাইবাবু।

—সে কি, কোথায় যাচ্ছ?

—কেন, আমাদের নিজেদের বাড়ী ফিরে যাচ্ছি—একান্ত সহজ গলা ইদ্রাণীর।

অনেকগুলি বিস্মিত হতচকিত চোখের সামনে দিয়ে ইন্দ্রাণী আর শোভনকে নিয়ে ট্যাক্সিটা হুস করে বেরিয়ে গেল।

——

"এক ফোঁটা শিশির"

মধু মিশ্র

হঠাৎ চোখে মুখে জলের ছোঁয়া লাগতেই ভোরের অলস ঘুম ভেঙ্গে যায় অজন্তার, তাকিয়ে দেখে, তার বিছানার পাশের জানালা দিয়ে শিশিরে ভেজা আকাশ-মণি গাছের নরম ডালগুলি মাথা নুইয়ে নুইয়ে তার কচিপাতা দিয়ে চোখে মুখে আদরছোঁয়া দিয়ে সরে যাচ্ছে, আধোঘুমে অজন্তা পাতাদের ধরার চেষ্টা করলেই, দুষ্টুমি করে পাতারা সব সরে সরে যাচ্ছে, বাতাসের ঝাপটায় তারা আবার জানালা দিয়ে এসে অজন্তার চোখে মুখে পাতায় জমে থাকা শিশিরের ছোঁয়া লাগিয়ে আবার সবাই সরে যাচ্ছে ·… ।

মায়ের কথা মনে পড়ে অজন্তার ; ছোটবেলায় তার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য মা তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিতেন ; কবির এখন কি করছে ? বোধহয় ঘুমিয়েই আছে ! বাবার বকুনি না খাওয়া পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠবেই না···, আর সেই হাড় জিরজিরে বুড়িটা তোবড়ানো ট্রামের ভেতর সেও হয়তো এখনও ঘুমিয়ে আছে, ভাগ্যিস ট্রাম কোম্পানীর ভাঙ্গা কম্পার্টমেণ্টটা এখানে ছিল। না হলে বুড়ীটা থাকত কোথায় ? এতবড় পৃথিবীতে ঐ টুকু জায়গা কি করে নিতে পারতো ?

ভীষণ মায়া হত বুড়ীটার জন্য, ওকে মুক্তি দেওয়ার জন্য 'মার্সি" মার্ডার করে ফাঁসি যেতে ইচ্ছে করত অজন্তার— । সত্যিই ! কলকাতার খিদিরপুরের সেই ভাড়াবাড়ীর কথা ভীষণ ভাবে মনে পড়ে যায়। নার্শারী সেক্শন থেকেই মা-বাবা চেয়েছিলেন নাচে, গানে, অঙ্কনে, পড়া শোনায় সব কিছুতেই প্রথম করতে—বহুমুখী চাপে তার কোন আশাই পূরণ হয়নি।

জে.ই-তেও কোয়ালিফাই হয়নি, শেষ পর্যন্ত হামাগুড়ি মাখানো কলকাতার খিদিরপুরের ভাড়াবাড়ী ছেড়ে, জলপাইগুড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে নার্সিংএর চাকরী নিয়ে সাধারণ এই হেলথ সেণ্টারে এসে জয়েন করেছে। প্রথম কয়েকদিন দারুণ অসুবিধে হয়েছিল, কিছুই ভাল লাগছিল না। এখন সব ঠিক হয়ে এসেছে, পরিচিতিও বেড়েছে, বিশেষ করে পলাশ ., সারা হৃদয় জুড়ে। দারুণ ট্যালেন্ট, ডাক্তারী পাশ করেই এই হেলথ সেন্টারে জয়েন করেছে। ডঃ পলাশ ব্যানার্জী এখন অজন্তার 'পলাশ ফুল' আর পলাশ! তার সব রঙটুকু দিয়ে হৃদয়ের ক্যানভাসে অজন্তার ছবি এঁকেছে ..। বাতাসের ঝাপটা অনেক কমে এসেছে। আকাশমণি গাছের নরম ডালগুলি ভোরের আলো-কে স্বাগত জানানোর জন্য সবাই মিলে লাইন দিয়ে মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। গোপাল এখনও জমির দিকে যায়নি। যাওয়ার সময় অজন্তাকে একবার ডাক দিয়ে যায়। কোন কোন দিন গোপালের সাথেই মর্নিং-ওয়াকে বেরিয়ে যায়। বেশ মানুষ এই গোপাল! নিজের জমির ফসল ফলানো আর পরিবার ছাড়া কিছুই ভাবতে চায় না। পৃথিবী জুড়ে কোথায় কি হচ্ছে জানার দরকার নেই। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই সে মাঠে বেরিয়ে যায়। গোপাল যেন সূয্যিমামার রথের ঘোড়া ., সে মাঠে না গেলে ভোরের আলোই ফুটে ওঠে না । বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে দূরের মেঠো পথের দিকে তাকিয়ে অজন্তা ভাবে—ঐ মেঠো পথটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে! পৃথিবীতে এত ছোট-বড় রাস্তা সবগুলোই কি একসাথে মিশেছে? ওর ইচ্ছে করে এই মেঠো পথটা ধরে যেখানে খুশী চলে যাবে, কোন বাধা মানবে না। রুটিন-মাফিক জীবনের সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবে, কোথাও থামবে না; শুধু চলা, চলা, আর চলা ·· ···· ।

—ঘুম ভেঙ্গেছে দিদিমণি ? জানালার পাশে এসে গোপাল জিজ্ঞেস করে।

—কে ? গোপাল এসে গেছ ? একটু দাঁড়াও আজকেও তোমার সাথে যাব !

—চলুন না দিদিমণি, ঐ জন্যই প্রতিদিন ভোরে আপনার ঘুম ভাঙ্গাই।

অজন্তা বিছানা ছেড়ে চটপট বেরিয়ে এসে বলে—একটু দেরী হয়ে গেল—।

— মোটেও না ! আপনি খুব চটপটে।

—গোপাল, আজ তোমার জমিতে যাবো, দেখবো কেমন ফসল হচ্ছে ?

—বেশ তো ! তাই চলুন ফসলদের সাথে আপনার পরিচয় হবে, জানেন দিদিমণি ওরা আমার সাথে কথা বলে, ওদের কখন কি দরকার আমি ঠিক বুঝতে পারি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ !

—আচ্ছা গোপাল, তোমার জমি পেরিয়ে নদীর ধারে সেই জঙ্গলে ঘেরা বিশাল বটগাছের পাশে, জাগ্রত মা-তারার মন্দির দেখেছ ?

—কেন দেখব না, তবে মন্দিরের ভিতরে কোন দিন যাইনি, শুনেছি খুব জাগ্রত দেবী, বহুদূর থেকে ভক্তেরা এসে পুজো দিয়ে যায়।

—তুমি পুজো দাও ?

—না দিদিমণি, নিজের কাজ শেষ করে উঠতে পারি না, তাছাড়া পুজো দিতে আমার ভালও লাগে না ....

—কেন ?

—সবই তো মানুষের প্রয়োজনে দিদিমণি ! দেব-দেবী

মানুষকে ভালবাসাই হ'ল দেব-দেবীর পুজো। আমার মাষ্টার-মশাই বলতেন · ·

—থাক গোপাল। ওসব তোমার নিজস্ব ব্যাপার, আমার কিন্তু খুব অবাক লাগে, শত শত মানুষ কত দূর থেকে এসে পুজো দিতে আসছে। ভাবছি কাল ভোরে একবার মন্দির দর্শনে যাব, এতদিন এখানে এসেছি কিন্তু সুযোগ হয়নি, তাই ভাবছি কাল কাকভোরেই যাব।

—আপনার পলাশফুলকেও সঙ্গে নিয়ে যান দিদিমণি, জায়গাটা খুব ভাল নয়

—না আমি একাই যাবো, তবে বলছ যখন একবার জানাব ওকে।

—দিদিমণি আমি যাই, আমার দেরী হচ্ছে! তুমি ফসল দেখবে বলছিলে, যাবে নাকি ?

—না আজ আর যাব না, অন্য একদিন—

—ঠিক আছে! তাই যাবে।

সারি সারি আকাশমণি গাছের নীচের মেঠো পথ ধরে গোপাল এগিয়ে যায়। অজন্তা হেলথ্ সেণ্টারে ফিরে আসে।

* * * *

হেলথ্ সেণ্টারে পলাশের সাথে দেখা। সে-ও মর্নিং ওয়াক সেরে একটু আগে ফিরেছে। ভোরের আলোতে পলাশের মনের আলো জ্বলজ্বল করে ওঠে। জিজ্ঞেস করে—অজন্তা, তুমি আজকাল দেরী করে বেরুচ্ছ কেন ? আগে তবু ভোর পথের দেখা হত, এখন তাও হয় না—ঘুম ভাঙ্গে না বোধহয় ?

—ঠিকই বলেছ ··

—আচ্ছা কাল থেকে আমিই ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেব।

—পারবে না···।

—কেন ?

—তুমি তো ঘুম কেড়ে নিয়েছ তাই…

—তাই নাকি ! দেখাচ্ছি মজা ।

—সাত সকালে আর মজা দেখাতে হবে না, আগামীকাল কাকভোরে নদীর ধারে ঐ মা-তারার মন্দিরে যাবো ; পারলে যেও…… ।

—আচ্ছা দেখা যাবে, বলে পলাশ তার কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে যায় । অজন্তাও ।

পরের দিন পাখিদের ঘুম ভাঙার আগেই অজন্তা বেরিয়ে পড়ে । শুধু মন্দির দর্শনের তাগিদেই নয়—শ্রদ্ধার টানেও । কত অলৌকিক ঘটনা শুনেছে মন্দিরের জাগ্রত তারা-মাকে ঘিরে যা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায় না । পাখিদের ঘুম এখনও ভাঙেনি গাঁছের পাতায় বাতাস লেগে শন্-শন্ আওয়াজ করছে । গা ছম্ ছম্ করছে । মেঠো পথ যতদূর দেখা যাচ্ছে, জন-প্রাণী হীন, ভয় জড়ানো পায়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় অজন্তা ; সামনেই গোপালের জমিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । কিন্তু ফসলদের বোঝা যায় না । মনে হচ্ছে হাল্কা নীলরঙের মাঝে গাঢ় সবুজ রঙের দিগন্ত বিস্তৃত একখানা চলমান ছবি । বাতাসে ফসলের ওঠা নামা সমুদ্রের ছোট-ছোট ঢেউএর মতো লাগছে । সত্যিই ! হাল্কা নীলরঙের উপর গাঢ় সবুজের চলমান ঢেউ-এর ছবি ! গা ছম্ছম্ ভাবটা ছবির নেশায় কেটে যায়, ধীরে ধীরে জঙ্গলে ঘেরা বটগাছটা দেখা যাচ্ছে । আবার ভয় জড়িয়ে ধরে অজন্তাকে । মনে পড়ে এ মন্দির সম্পর্কে কিছু জনশ্রুতি : শোনা যায় মন্দিরে বলিদানের পর যে কাটামুণ্ডুটি ডাকিনী-যোগিনীদের উদ্দেশে বটগাছের নীচের একটি পাথরের গুহায় ছুঁড়ে দেওয়া হয়—তা কিছুক্ষণ পর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় । শুধু তাই নয়, এমনও দেখা গেছে যেদিন মন্দিরে বলিদান হতো না, সেদিন বটগাছের

পাশ দিয়ে কোন প্রাণী গেলেই মন্ত্রচালিতের মতো জঙ্গলে-ঘেরা বটগাছের নীচে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত! সবাই বলে ডাকিনী-যোগিনীরা গিলে নেয়…। অজন্তা কথায় কথায় একদিন গোপালকে জিজ্ঞেস করেছিল, সত্যিই বলিদানের প্রসাদ না পেলে ডাকিনী-যোগিনীরা কি জ্যান্ত প্রাণী গিলে নেয়? উত্তরে গোপাল বলেছিল—হ্যাঁ ঐ রকম হয়, তবে ডাকিনী-যোগিনী নয়, ওখানে বিশাল এক সাপ আছে, নিঃশ্বাসের কাছাকাছি কোন প্রাণী এলেই চুম্বকের মতো মুখে টেনে নেয়। লোকে বলে ডাকিনী-যোগিনীরা গিলে নেয়। কেউ তো আর জঙ্গলের ভেতর যেতে পারে না—তাই সবাই এই কথা বলে।' গোপালের কথা বিশ্বাস হয়েছিল অজন্তার। অবাকও হয়েছিল, পাঠশালার দরজা পার হওয়া সরল গোপালের বাস্তব বুদ্ধির কথা ভেবে! আফ্রিকার জঙ্গলে এর থেকেও ভয়ংকর সব গল্প শোনা যায়। জঙ্গলে ঘেরা বটগাছটার দিকে তাকাতেই ভয়ে থমকে দাঁড়ায় অজন্তা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, পাশে নদীর ধার ঘেঁষে তারা মায়ের মন্দিরের চূড়াটা শুধু দেখা যাচ্ছে। অস্পষ্ট। ভোর হওয়ার সময় এখনও হয়নি। অন্ধকার ভাবটা এখনও কেটে ওঠেনি; দূরে অস্পষ্ট কিছু কথা ভেসে আসছে। ভয় কাটিয়ে, কথা লক্ষ্য করে এগিয়ে যায় অজন্তা। দেখতে পায় পাঁচ-ছয় জন অপরিচিত ব্যক্তি গোল হয়ে বসে কি সব ভাগ করছে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অজন্তাকে দেখে একজন এগিয়ে এসে বলে—একেবারে রাত থাকতেই পুজো দিতে এসেছো যে! অন্য সবাই হেসে ওঠে। ভয়ে অজন্তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। একজন আদিম সুরে বলে—'এমন পুজারিনী আর পাবি? চল সবাই মিলে প্রসাদ খাই।' কোন কিছু বোঝার আগেই, অজন্তার মুখে চাপা দিয়ে সবাই মিলে তাকে তুলে নিয়ে মন্দিরের বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়।

জীর্ণ মন্দিরের বাসা থেকে নিশাচর পাখিরা ঘৃণায় মুক্ত আকাশের দিকে পাখা মেলে।

*　　*　　*　　*　　*

অজন্তার ঘরের জানালা বন্ধ দেখে গোপাল বুঝতে পারে দিদিমণি মন্দিরেই গেছে। বড় ভাল লাগে দিদিমণিকে। তার প্রথমবারের মেয়েটা বেঁচে থাকলে ওর মতই হতো। তিনদিনের জ্বরে মারা গেল মেয়েটা। তখন এই হেলথ্ সেন্টারও গড়ে ওঠেনি। হেলথ্ সেন্টার বোধহয় বারো তেরো বছর হ'ল ; মনটা মোচড় দিয়ে উঠে গোপালের। আঠারো বছর আগের আধো আধো ডাক, পুতুল-পুতুল চেহারা, কাদা-মাটি, বালি, আলো-অন্ধকার, জমি-লাঙ্গল-ফসল সব কিছু ফেলে দিয়ে নিমেষে চলে যায় তুলসীতলায় সাদা চাদর ঢাকা দেওয়া মরা মেয়েটার কাছে। সবাই ভুলে গেছে! গোপালও। আজ আবার দিদিমণির কথা ভেবে মনে পড়ে গোপালের, মেয়েটা বেঁচে থাকলে দিদিমণির মতই হতো। আজকাল দিদিমণিকে না দেখলে মনটা যেন কেমন হয়ে ওঠে। সবাই ভালবাসে তাকে। যেমনি কথাবার্তা তেমনি সুন্দর দেখতে। দিদিমণি যে কত সুন্দর তা বোঝাতে পারবে না সে। ঠাকুমার কাছে পরীদের গল্প শুনেছে, তখন অত সুন্দর, অসুন্দর বুঝত না। এখন মনে হয়, পরীরা বোধ হয় দিদিমণির মতোই দেখতে ছিল। আর একবার দিদিমণির ঘরের বন্ধ জানালার দিকে তাকায় গোপাল। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। না জমিতে যাওয়ার আগেই সোজা মন্দিরেই যাবে সে। আকাশমণি গাছের নীচ দিয়ে মেঠো পথ ধরে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে। দূরে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। বটগাছের নীচে এখনও অন্ধকার।

শুধু বাতাসের শন্ শন্ আওয়াজ। মন্দিরের কাছে এসে

একটু থমকে দাঁড়ায় গোপাল। চিক্-ক্-ক্‌... ,শব্দ করে পায়ের কাছ দিয়ে কি একটা পালিয়ে যায়! ছুঁচো মনে হয়!

ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায় সে। বারান্দার কাছে এসে রক্ত হিম হয়ে ওঠে তার। চাপ চাপ রক্তের মাঝে নিথর হয়ে পড়ে আছে দিদিমণি। এখানে-ওখানে পড়ে আছে ছেঁড়া শাড়ী-ব্লাউজ। কি করবে ভেবে উঠতে পারে না সে। মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে গোপালের। নিজের মেয়েটার কথা মনে পড়ে তার। আঠারো বছর পর যেন তার মেয়েটাই এখানে শুয়ে আছে। তফাৎ শুধু সে ছিল তুলসীতলায় সাদা-চাদর ঢাকা দেওয়া, আর আজ শুয়ে আছে জাগ্রত তারা-মায়ের মন্দিরের বারান্দায়—এক টুকরোও কাপড় না ঢাকা দেওয়া অবস্থায়। ঝিম ঝিম করে ওঠে মাথাটা, রাগে চোখ লাল হয়ে ওঠে তার। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দিদিমণির কপালে হাত রাখে—বেঁচে আছে এখনও! অজ্ঞান হয়ে আছে। ছুটে গিয়ে মন্দিরের পাশের নদী থেকে গামছা ভিজিয়ে নিয়ে এসে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেয় বারবার।

জমে থাকা রক্তগুলোকে ধুইয়ে দেয়। অস্পষ্ট একটা গোঙানীর শব্দ বেরিয়ে আসে। আস্তে আস্তে চোখ খোলে অজন্তা। গোপালকে ঠিক চিনতে পারে না। আবার চোখ বন্ধ করে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। কি করবে ভেবে উঠতে পারে না গোপাল। হঠাৎ তার মনে হয় জীর্ণ মন্দিরের বাতাসে ভেসে আসছে একটা কণ্ঠস্বর— 'কিরে তুই দেখতে পাচ্ছিস না ?' গোপাল চারি দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। গোপাল উঠে দাঁড়ায়। আবার সেই কণ্ঠস্বর। "কিরে তুই দেখতে পাচ্ছিস না, তোর মেয়ে বিবসনা পড়ে আছে ?..." যন্ত্র চালিতের মতো ঘুরে দাঁড়ায় গোপাল; কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

বিস্ময়ে এদিক ওদিক তাকাতেই চোখ পড়ে তারা মায়ের মূর্তি'র দিকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় সে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো

মূর্তির লাল পাড়ের শাড়ী খুলে নিয়ে দিদিমণির রক্তমাখা শরীরটায় মা-তারার শাড়ীটা পরিয়ে দেয় গোপাল। তখনও জ্ঞান ফেরেনি অজন্তার। অচৈতন্য শরীরটাকে কোনরকমে তুলে নিয়ে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে গোপাল দেখতে পায় দিদিমণির "পলাশফুল" এগিয়ে আসছে। বোধ হয় গোপাল আর অজন্তাকে ঐ ভাবে দেখে বিস্ময়ে আরো তাড়াতাড়ি ছুটে এসে গোপালকে জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে গোপাল ?

কোল থেকে অচৈতন্য অজন্তাকে নামিয়ে রেখে গোপাল অল্প কথায় সব ঘটনা জানায়। পলাশ সব শুনে গোপালকে বলে,—গোপাল, তুমি একটু জলের ব্যবস্থা করো ; আমি তোমার দিদিমণিকে দেখছি।

—আচ্ছা ! কথা শেষ করে গোপাল নদীর দিকে এগিয়ে যায়। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে অজন্তার। মনের চাপা বেদনাকে ভালবাসার টানে দূর করে দেয় পলাশ। চোখে ও মুখে এবং সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দেয় ছোট শিশুর মতো। ডাক্তার পলাশ অজন্তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করে।

—ডাক্তারবাবু, জল নিয়ে এসেছি। ভিজে গামছাটা এগিয়ে দেয় গোপাল। পলাশ ভিজে গামছা থেকে অজন্তার চোখে মুখে জল দেয়। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে ওর। চোখ খুলে দেখে সে পলাশের কোলে শুয়ে। পাশে গোপাল। সব কিছু মনে পড়ে যায় অজন্তার। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে।

—চুপ করো অজন্তা। এই অবস্থায় বিশ্রাম নেওয়া দরকার, চলো হেলথ্ সেন্টারের দিকে যাই। গোপাল, দিদিমণিকে একটু হেলথ্ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া দরকার।

—চলুন না ডাক্তার বাবু, আপনাদের দুজনকে পৌঁছে দিয়ে তারপর আমি জমিতে যাবো।

অজন্তা আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

—অজন্তা চুপ করো।

—পলাশ, এই দুর্ঘটনার পরও... ।

—এটা কোন দুর্ঘটনাই নয়, এটা শুধু একটা ঘটনা মাত্র ·· । চলো হেল্‌থ্‌ সেন্টারে যাই, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কিন্তু ··· ?

—কোন কিন্তু নয়, তুমি তো জানো আমি চিরকাল, চিরদিন তোমার জন্যই অপেক্ষা করে আছি।

—তবুও··· !

—এখন বেশি কথা নয় অজন্তা, ঐ দেখ গাছে গাছে পাখিরা সব জেগে উঠেছে, ভোরের আলো ফুটে উঠতে আর দেরী নেই ; পৃথিবীর মানুষদের রুটিন মাফিক জীবন শুরু হওয়ার আগেই, গোপালের মতো মানুষ-দেবতাকে সাক্ষী রেখে জানাতে চাই, তোমার পলাশফুলের সাত সমুদ্র তেরো নদীর জলে মন ভরে না, তার চাই শুধু 'এক ফোঁটা শিশির·· '।

মহাত্মা গান্ধী রোডের মহাত্মা

অসীম চৌধুরী

"দাদা কলকাতায় ক'দিন ?"

আমি চমকে তাকালাম। কতগুলো কণ্ঠ হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

"দাদা কি গ্রাম থেকে এসেছেন নাকি ?" তীব্র শ্লেষ একেবারে কানের ভেতর দিয়ে মর্মে গিয়ে বিন্ধ করল আমার। একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠ মিলে মিশে সোরগোল তুললো।

"ছিঃ ছিঃ দাদা, আপনার একটু কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত হ'ল না। একেবারে নগদ একশো টাকার কড়কড়ে নোট—আপনি দিব্যি নিশ্চিন্তে দিয়ে দিলেন ?"

"একটু সন্দেহ পর্যন্ত হ'ল না মশাই ?"

আরে ছাড়্ ছাড়্ চল্। শালা কোলকাতায় থেকে এরকম ধুর কেউ হয় মাইরী ... !"

আমি রীতিমতো হকচকিয়ে গেলাম। মুখটা আপনা থেকেই আতঙ্কিত হয়ে গেল আমার। ফুটপাতের উপর যে বাজার সেখানেই যত গণ্ডগোল ! এর মধ্যে আবার একি কান্ডরে বাব ! আমি ভীতু মানুষ। কিন্তু তবু বাঙালী সুলভ সহজাত ব্যগ্রতায় কানটাকে আর চোখটাকে খাড়া করে ভীড়ের মাঝখানটিতে না আসা পর্যন্ত শান্তি পেলাম না যেন। সকলে সমস্বরে হেসে উঠল। দু-একজন আবার বেশ সহানুভূতি প্রবণও হয়ে উঠল। দারুণ ভীড়ে কোন একটা কিছু বুঝবার আশায় উৎকর্ণ হতেই বুকটা আমার ধড়াস করে উঠল একেবারে। ভীড় ঠেলে গিয়ে দাঁড়ালাম ভদ্রলোকের সামনে। ইস্ কি সর্বনাশই না হয়েছে ! বড় মায়া হ'ল দেখে। গরীব মধ্যবিত্ত বেচারা। রীতিমতো হাঁ করে অবাক হয়ে কুরে কুরে দেখলাম মানুষটাকে।

পা ছড়িয়ে একেবারে হতাশ হয়ে বসে পড়েছে ফুটপাতের উপরে। এই দারুণ শীতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাথায় হাত দিয়ে ঝাঁকাটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে মানুষটা। ধুতি আর জামার উপরে চাপানো একটা পুরোনো কালো কোট, নাক আর গালের মাঝে মস্ত একটা তিল। বেশ বড় করে রাখা গোঁফ, অনেকটা ঝুড়ির মতো। সারা মুখে একটা অদ্ভুত সরল বোকা বোকা ভাব। কাঁধে একটা সাইডব্যাগ। মাথায় হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে সান বাঁধানো ফুটপাতের দিকে চেয়ে কি ভাবছে তা কে জানে! একটু দূরে ঝাঁকার উপর বেশ কিছু টমেটো, সীম, পালং শাক ইত্যাদি। ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সেগুলোর দিকে।

"কি হয়েছে, কি হয়েছে দাদা?" এক ঠ্যালা মেরে দেড় হাত সরিয়ে দিয়ে বেশ মোটা চেহারার একজন একই সঙ্গে আমাকে আর আমার পাশের জনকে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে কথাটা।

"আর বলেন কেন দাদা, টাকা চুরি!"

"অ্যাঁ—! বলে কি? কে..কে ..! কি করে ... কি করে?"

"আরে চুরি না মশাই, চিটিং চিটিং! বাজার করতে এসে দশ টাকার মাল কিনে, এই ভদ্রলোক একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়েছিল চাষীটার হাতে। ব্যস, চাষীটাও 'ভাঙিয়ে আনি' ব'লে সেই যে এ ফুট থেকে ও ফুটে কোথায় সরে পড়ল—তা সে আজও গেছে আর কালও গেছে, দেখা নেই কোন।"

আমি আঁতকে উঠলাম। স্কুলে কিম্বা কলেজে আমার একাউন্টেন্সী ছিল না। ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে স্কুল আর কলেজে পড়া ইকোনমিক্স আর জেনারেল নলেজ দিয়ে অনেকক্ষণ ম্যাথেমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনে চুলচেরা হিসেব কষে দেখলাম বড়জোর ওতে আছে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকার আনাজ। বাঃ! বেশ

ভাল দাঁওই মেরেছে বেটা। গাঁয়ের চাষীদের গায়েও কেমন কলকাতার হাওয়া লেগেছে দেখে ভিক্টোরিয়াটাকে আমার একই সঙ্গে কেমন যেন সুন্দর আর কুৎসিত বলে মনে হল, সত্যিই কালে কালে দেশটার হোল কি, অ্যা ?

পা ছড়িয়ে ফুটপাতের বাজারের উপর বসে অতগুলো মানুষের অতশত আদেশ, নির্দেশ, লাঞ্ছনা, তাচ্ছিল্য, উপহাস, সহানুভূতি বেশ নির্বিবাদে হজম করছিলেন এতক্ষণ ভদ্রলোক।

বিরূপ বাক্যবাণে জর্জরিত হতে হতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তিনি, ভীড়ের মধ্যে বেশ একটা গুঞ্জন উঠল। বেশ কিছু ছেঁড়া খোঁড়া কথা কানে ভেসে এল। সকলেই এবার কেমন যেন বেশ একটু অপ্রস্তুত আব সিমপ্যাথিটিক হয়ে উঠেছে ব'লে মনে হ'ল আমার। ফ্যাল ফ্যাল করে ভদ্রলোক বেশ খানিকটা তাকিয়ে রইলেন ভীড়ের মধ্যে। বেশ খুঁজে খুঁজে তিনি ভীড় উপচে দেখতে চাইলেন কি একটা যেন কি। ভাবলেন হয়তো বা যদি ওই বেটা তরকারী আলা চাষাটাকে একবারও দেখতে পাওয়া যায় কোথাও—কিন্তু না, কোন সুফলই ফললো না। সে গুড়ে সত্যিই বালি একেবারে।

তার চোয়ালের হাড় দুটো কেমন যেন শক্ত হ'ল ক্রমশ। নাকের শেষ মাথায় গড়িয়ে আসা চশমাটাকে এক ঝটকায় যথাস্থানে পাঠিয়ে গা হাত পা বেশ ঝাড়া দিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন ঝাঁকাটার সামনে। দুহাত দিয়ে কষ্ট করে হলেও ঝাঁকিয়ে তুললেন তিনি ঝাঁকাটা। না না মাথায় নয়, একেবারে কাঁধের উপর, ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে এগিয়ে চললেন সামনে ! 'রিপন কলেজ হোস্টেল' লেখা ফুটপাত চত্বরটা থেকে হঠাৎ হৈ হৈ রই রই একটা আওয়াজ উঠল। দৌড়ে এল এক দঙ্গল ইয়াং ছেলে। ভীড়টা বেশ ফুলে ফেঁপে উঠল যেন এবার। নানা কথা দু-একটা সিটি, অনেকটা হাসাহাসি—অদ্ভুত সব কথাবার্তা আর উদ্ভট সব শব্দে নাটক তখন চরমে। ভদ্রলোক এগিয়ে চলেছেন।

সামনে আর পিছনে একটা বিরাট ভীড় চলেছে তালে তালে ট্রাম গাড়ির মত এখানে ওখানে জট পাকিয়ে। ফুটপাতের বাজারের সব মুটে মজুর বিক্রেতা আর খদ্দের যে যার বেচাকেনা সব ফেলে রেখে হাঁ ক'রে অবাক হয়ে দেখলে সে দৃশ্য।

হঠাৎ হৈ হৈ করে শব্দ উঠল একটা ওপার থেকে। অদ্ভুত বিপদজনক গতিতে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় একটা চলন্ত ট্রামকে অতিক্রম ক'রে চিৎকার করতে করতে এসে দাঁড়ালো একটা লোক। হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, কালো কালো পা আর মাথায় গামছা বাঁধা একটা গেঁয়ো মানুষ—হঠাৎ দৌড়ে এসে ভদ্রলোকের কাঁধের ঝাঁকাটাকে ধরে রীতিমত টানা-হ্যাচড়া শুরু করে দিল সমানে প্রাণপনে। কোন রকমে টানাটানি হুড়োহুড়ি করে সেটা মাটিতে নামিয়েই লোকটা ভদ্রলোকের পা-টা জড়িয়ে ধরলে একেবারে। দেশোয়ালী ভাষায় সে কি যে বললো ঠিক তা বোঝা গেল না। তবে সব ভাব ভঙ্গিমা, ভাষার ছাঁদ বাঁধুনি বাদ দিলে মনে হয় এই কথাই শুনলুম, "বাবু আমাকে মাফ ক'রে দিন বাবু। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছি আপনার নোট ভাঙানোর জন্যে, কিন্তু কোথাও পাইনি। তাই দেরী হ'য়ে গেছে। এই নিন বাবু আপনার টাকা। দয়া ক'রে আমার লক্ষ্মী, আমার ঝাঁকা নিয়ে যাবেন না। অনেকটা চিৎকার আর অনেকটা কথাবার্তার পর দেখলাম, সে তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকের হাতে নব্বই টাকা গুঁজে দিল অক্লেশে। প্রচণ্ড আক্রোশে ভয়ংকর ভাবে ফুঁসে উঠে টাকাটা হাতে পাবার পরক্ষণেই হতভম্বের মতো বোকা বোকা মুখ করে স্তম্ভিতের মতো ফুটপাতের উপর একা দাঁড়িয়ে রইলেন ভদ্রলোক।

———

ধূসর গোধূলি

চায়না রায়

অন্তিম ভাদ্রের পড়ন্ত বিকেল। গাছের পাতায় পাতায় আলোর ঝলমলানি। মাধবী লতায়—শিউলির ডালে কুসুম বালাদের বিকশিত হাসি। পাইকপাড়ার বনেদী ধনাঢ্য পরিবার শীলবাড়ির পুত্রবধূ নীলিমা অভ্যাস মতো ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে সুমুখে দৃষ্টি প্রসারিত করে। নিজেকে বিলীন করে দিতে চায় ঐ সুদূর নীলিমায়। শারদীয়া পুজোর লগ্ন সমাগত প্রায়। আকাশে-বাতাসে আগমনীর সুর ভাসে। আনন্দময়ীর আগমন উপলক্ষে এক আনন্দঘন মুহূর্ত যেন বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত। এক খণ্ড ভাসমান মেঘ সহসা পশ্চিম দিগন্তে ধেয়ে আসে। নীলিমার মনোগগনেও নানা চিন্তার জট ধুঁয়ার কুণ্ডলীর আকারে মসী ছড়ায়। বিধাতার এ কি ছলনা। এত বড় পরিবারের বধূ হয়েও সে সুখী হতে পারল না। এ-কি অন্তর্বেদনা অহর্নিশ তার মনের শান্তিকে কুরে কুরে খায়! নীলিমা স্মৃতির সরণি বেয়ে দু'হাত বাড়িয়ে খুঁজতে থাকে তার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিকে।

বাবা-মা, দুই বোন আর এক ভাই নিয়ে তাদের ছোট্ট সংসার। পূর্ববঙ্গ থেকে এসে নানা জায়গায় বিচরণ। অবশেষে কলকাতার উপকণ্ঠে কোনক্রমে থিতু হওয়া। ওর বাবা নিবারণ মুখার্জী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে করণিক পদে চাকরি করে কায়ক্লেশে পরিবার প্রতিপালনে রত। দারিদ্র্য ও অন্যান্য প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি পুত্রকন্যাদের লেখাপড়ায় যত্নবান। কারো প্রতি ছিল না অনাদর। তবে নীলিমার প্রতি বাবার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব ছিল। এ নিয়ে ভাইবোনদের মধ্যে মাঝে মাঝে খুনসুটি হত। নীলিমা

এতে মজা পেত। বাবা সংসারের ভাবে ন্যুব্জ। দারিদ্য আষ্টে পৃষ্ঠে চেপে ধরেছিল। তবুও সংসারে ছিল হাসি-খুশি-আনন্দ শান্তির পরশ। মা অমিয়বালা মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তখন নিলীমার দায়িত্ব রান্না-বান্না, ঘর গোছানো ইত্যাদি কাজ। তার মধ্যেই লেখাপড়া। নিষ্ঠাবতী মেয়ে নীলিমা একে একে বিদ্যালয়ের দুয়ার পেরিয়ে মহাবিদ্যালয়ের অন্দরে প্রবেশ করে। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপানে তার পদসঞ্চার। সসম্মানে ইংরাজীতে স্নাতকোত্তর উপাধি আয়ত্বকরণ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চত্বরেই আলাপ কমার্স-এর ছাত্র তথা ইউনিয়নের কর্মকর্তা নিখিলের সঙ্গে। বান্ধবী সুমনা বড়ই প্রগল্ভ মেয়ে। সেদিন অফ পিরিয়ডে ক্যান্টিনে যাবার পথে নিখিলকে দেখেই বলে উঠল—এই যে নিখিল, এই সেই মেয়েটি যার কথা তোমায় বলেছিলাম—যাকে বলে একেবারে গুড্‌গার্ল, ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না! এখন পর্যন্ত ওর কোন বয় ফ্রেন্ড' নেই, এখনও কেউ ওর দিকে তাকালে চিবুকের রং কাশ্মীরি আপেল হয়ে যায়। কেউ যেচে আলাপ করতে এলে ও একটা না একটা ছুতো করে সরে পড়ে। অমিও বেট লড়েছি যে, তোমার সাথে আলাপ করিয়ে দেবই বলেছি, তোমার সাথে আলাপ করা দুর্লভ ব্যাপার, দারুণ স্মার্ট ছেলে, কলেজ ডিবেটে কিংবা স্পোর্টস ইভেন্টে প্রাইজ নেবেই। কত বড়লোকের ছেলে তুমি, তোমার নাগাল পাওয়া মানেই নিজেকে ধন্য মনে করা…।

—আঃ সুমনা হচ্ছেটা কী! সদ্য পরিচিত স্বপ্ন সুন্দরীর সামনে আমার এ প্রশস্তি গাওয়াটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। কথাটা শেষ করে নিখিল স্থির দৃষ্টি স্থাপন করে নীলিমার মুখের উপর। নীলিমা নিজের হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। সারা মুখে কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। সে লজ্জা বিনম্রভাবে বলে—না-না, এতে কি আছে? সুমনার মহত্ব তো ওটাই, যার

যেটুকু প্রাপ্য তার ন্যায্য অধিকার থেকে ও কাউকে বঞ্চিত করে না।”

নিখিল হাসিমুখে প্রসঙ্গ বদলায়—ওসব বাজে কথা থাক্‌ চলুন কফি হাউসে যাওয়া যাক। আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপ-এক কাপ কফি কিংবা চা পানের মাধ্যমে মুহূর্তটা স্মরণীয় হয়ে থাক··।

নীলিমা আপত্তি জানিয়েছিল কিন্তু টিকল না। সুমনার অভিসন্ধিতে নীলিমা সেদিনই প্রথম কফি হাউসে গেল এবং দেড়টি ঘন্টা খরচ করে ফেলল। দু'জনের বাক্য এবং ভাষা বিনিময় নীলিমার নীল দিগন্তে সবুজের নেশা ধরায়। নিখিলকে এক লহমায় চিরপরিচিত মনে হতে থাকে। ওর কথা, হাসি, পোষাক-আসাক সব কিছুই যেন রমণীয় মনে হয়।

সপ্তাহখানেক বাদে ক্লাশ ছুটির পর নিখিল আউটট্রাম ঘাটে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিলে নীলিমা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। ভাদ্রের ভরা যৌবনবতী গঙ্গা। চঞ্চল-উত্তাল। পূর্ণ যৌবনবতী নারীর মতোই উচ্ছ্বল আবেগে বয়ে চলেছে। অপরাহ্ণের রবি-কিরণে চারিদিকে জল ঝিকিমিকি খেলা করছে। অদূরে পরিলক্ষিত হয় একখানা ডিঙি নৌকায় হাত ধরাধরি করে এক তরুণ-যুগল দ্বৈতকণ্ঠে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় প্রেমের বন্দনা গাইছে। নানা রমণীয় শোভা দেখতে দেখতে নীলিমার দেহ-মনে মাদকতার সঞ্চার হয়। আঃ কি প্রাণের আরাম, মনের শান্তি। উদার আকাশের তলে প্রকৃতির এই পরিবেশে নিখিলের সান্নিধ্য বড়ই কাঙ্ক্ষিত মনে হয়। আবেশ-বিহ্বল সময় গড়িয়ে চলে। নিখিলই তন্ময়তা ভাঙিয়ে বলে—“নীলু, তোমার চোখের তারায় কোন্‌ কল্পলোকের মায়া· স্বপ্নলোকের ছায়া···। তোমার প্রেমসাগরের অতলে ডুব দিয়ে আমি মগ্ন হতে চাই ··। নীলিমা অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থাকে। কোন্‌ রহস্যলোক থেকে আলোক-

কার্তিকা এসে তাকে যেন বলছে—"এস প্রণয় সলিলে ডুব দাও, অবগাহন করো, অমৃতের স্বাদ নাও, আকণ্ঠ পান করে সুখানুভূতি লাভ করো।" সহসা নিখিলের করস্পর্শে নীলিমা সচকিত হয়। তার শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে নিখিলের সুধাবর্ষী কণ্ঠস্বর—"নীলিমা, বলো তুমি শুধু আমার, একান্ত আপনার।" সে মনে মনে উচ্চারণ করে—তোমার যৌবনে আমি চঞ্চল মধুকর, তোমার মতো নারী কুসুমেরে সবটুকু সুষমা-নির্যাস নিয়ে আমি ধন্য হতে চাই।"

নীলিমা বরাবরই স্বল্পভাষী। এক সহজাত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-বোধ তাকে দূরত্বে রাখে। অথচ তার হৃদয় প্রগল্‌ভ হয়ে উঠতে চাইছে। তার হৃদয়কুঞ্জে সে যেন শুনতে পায় চিরপ্রেমিকের সুমধুর বংশীধ্বনি—তালে তালে ছন্দে ছন্দে বাজে নূপুর-কিঙ্কিণী। নীলিমা অনুচ্চরে আবেগভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করে— "প্রিয়তম তুমি এলে তাই ভাঙল মোর ঘুম। বনে বনে উঠল জেগে আনন্দকুসুম।"

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে ওদের বিবাহপর্ব সমাধা হয়ে গেল। অসবর্ণ বিবাহ। নীলিমার বাবা-মা এ বিয়ে সানন্দে মেনে নিতে পারেননি। অসবর্ণের জন্যে নয়—দুই পরিবারের আর্থিক অসাম্যের কারণে। অপরপক্ষে নিখিলের বাবা মেনে নিলেও মা মেনে নিতে পারেননি। ছেলের উপরও তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। একটা বিরাট অংকের পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে হল।

বছরখানেক নীলিমার সুখের অন্ত ছিল না। বনেদী পরিবারের একমাত্র পুত্রের বধূ। দাসী-চাকরের ছড়াছড়ি। বলতে গেলে কোন কাজই করতে হয় না—নিখিলের মনোরঞ্জন ব্যতীত। মাঝে মাঝে তার ইয়ার-বন্ধুদের সামনেও সেজেগুজে বসতে হত।

নীলিমার শ্বশুর রাখালচাঁদ শীল ধনবান হলেও দাম্ভিকতা

শূন্য। কিছুটা স্নেহও। ইদানীং ব্যবসার দায়িত্ব নিখিলের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি পার্কের হরিসংঘে সময় কাটান। গৃহিনী মণিকাদেবী যথার্থ গৃহিনীই বটে। পোষাক-আসাকে চাকচিক্য ও পরিপাট্যে কৌলিণ্যের পরিচয় দেন। গলায় ভারী সোনার হার, হাতে মকরমুখী বালা, চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজ—ধনম্মোক্তার দাম্ভিক বিচরণ। চলা-ফেরা, আদব-কায়দায় বুঝিয়ে দেন, এ বাড়িতে থাকতে হলে তাঁকে সমীহ করে চলতে হবে। নীলিমা বাবার দৈন্যতার কথা স্মরণে রেখে নিজেকে সংকুচিত করে রাখে। তবুও তার গর্ব, সে এতবড় ধনী পরিবারের পুত্রবধূ নিখিল তার প্রেমাস্পদ, স্বামী, দাম্পত্য জীবনের দোসর। একদিন যে প্রেম তার হৃদয়ভূমে অংকুরিত হয়েছিল আজ তা শাখায়-পাতায়-কুসুমে প্রস্ফুটিত। তনুবাসরের নন্দন শয্যায় কন্দর্পের আবাহন অবলেহন, জৈবিক চেতনায় অমৃতের আস্বাদন। আত্মদানে গ্রহণে সে আজ সম্পূর্ণা।

*　　*　　*　　*

মানুষ যখন নিজেকে সুখী ভাবে তখন অলক্ষ্যে বিধাতা হাসেন। অচিরেই সুখ অন্তর্হিত হয়। নীলিমার দাম্পত্য জীবন তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। এবার বিবাহ-বার্ষিকীর দিনটি পালিত হল নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কথা ছিল দুপুরে খেতে এসে নিখিল আর বেরুবে না। বিকালে নীলিমাকে নিয়ে সে বেলুর মঠে বেড়াতে যাবে। নিখিল ফিরল রাত্রি এগারোটার পরে, মত্ত অবস্থায়। এক ব্যবসায়ী বন্ধুর বাড়িতে নাকি পার্টি ছিল। সকালে বলতে ভুলে গেছে। ইদানীং নিখিল প্রায়ই মদ খায়, অভব্য আচরণ করে। এ ঘরে এগুলো নাকি দোষের কিছু নয়। ব্যবসার খাতিরে একটু আধটু খেতেই হয়।

আজকের দিনটাকে উদ্‌যাপন করার আশায় সারাদিন নীলিমা নিখিলের জন্য প্রতীক্ষা করেছিল। এখন ক্ষোভে, অপমানে দুঃখে হুহু করে তার চোখের জল ঝরতে লাগল।

যত দিন যায় নিখিল ক্রমশঃ নীলিমার জীবন থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। সাধারণ ব্যাপারেও আজকাল নীলিমার প্রতি তার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। সুযোগ বুঝে মণিকাদেবীও কঠোর হয়ে উঠেছেন। কথায় কথায় নীলিমার বাপেরবাড়ির কথা তুলে খোঁটা দেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করেন। নিখিলকে কিছু বলতে গেলে সে নীলিমার উপর ঝাঁজিয়ে ওঠে—এ বাড়িতে থাকতে হলে মানিয়ে চলতে হবে।' নীলিমা মুখ বুজে সব সহ্য করে।

নিখিলের মত্ততা বেড়েই চলল। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকল নীলিমার প্রতি অবহেলা ও লাঞ্ছনার পরিমাণ। একদিন নিখিলের কোট হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে নীলিমা কোটের পকেটে একখানা মাঝারি মাপের এ্যালবাম দেখতে পেল। এ্যালবামে অনেকগুলো মেয়ের অশালীন ছবি। তবে কি নিখিলের চরিত্র-দোষও আছে?

ধনীবাড়ির পুরুষদের এটাও নাকি সদ্‌গুণ! কলকাতার বনেদী পরিবারের পুরুষদের অনেক কুকীর্তির কথা নীলিমা শুনেছে। তার বিশ্বাস ছিল নিখিল কিছু আলাদা। এতদিনে তার সে বিশ্বাসে চিড় ধরল। নীলিমা চিরদিনই বই-পাগল। মনোকষ্ট ভুলে থাকার জন্য সে বেশির ভাগ সময় বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে। সেদিন দুপুরবেলায় সে বই পড়ছিল এমন সময় মণিকা দেবী রাগত স্বরে বললেন—বলি, তুমি কত বড়লোকের মেয়ে যে, রাতদিন বই পড়ে সময় নষ্ট করো?

নীলিমা বুঝতে পারে না এতে হঠাৎ তার কি দোষ হল। সে কোন জবাব না দিয়ে শাশুড়ির মুখের দিকে তাকাতেই শাশুড়ি বললেন—আমার ছেলেটা যে দিন দিন নষ্টামী করে বাড়ি ফিরছে তা বুঝতে পারো না?

—আমার কি করণীয় আছে ?

—তোমার কি করণীয় আছে তা আমি বলে দেব ? অমন রূপ যৌবন আছে কি করতে ? স্বামীকে ঘরমুখো করতে পারো না ?

নীলিমা কোন জবাব না দিয়ে ডান হাত মুঠি বদ্ধ করে মস্তকে আঘাত করতে থাকে। এই সময় পঞ্চুর মা এসে তাকে নিরস্ত করে। মণিকাদেবীকে জানায়, "বৌদিমণির পেটে বাচ্চা। এ সময় অমন করলে বাচ্চার ক্ষতি হবে যে !"

—"তাই নাকি ?" মণিকাদেবীর কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন অনুভূত হয়। তার পুত্রবধূর গর্ভে এই পরিবারের বংশধর লালিত হচ্ছে। তাকে তো আর অবহেলা করা চলে না। সকলকে নির্দেশ দিলেন যাতে পুত্রবধূর প্রতি যত্নের ত্রুটি না হয়।

নিখিলের যেদিন পানের মাত্রা কম থাকে সেদিন সে নীলিমার সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করে। নীলিমার শারীরিক কুশল জানতে আগ্রহী হয়। কোন কোন দিন রাত্রে বাড়ি ফিরে সে নীলিমার সঙ্গে গল্প করে। ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে। তবে বেশি থাকে তাদের ভাবী সন্তানকে ঘিরে। ছেলের নাম কি রাখবে তা নিয়েও সে বেশ মাথা ঘামায়। নিখিল ইদানীং বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। এখানে ওখানে সভা-সমিতিতে ডাক পড়ে। পাড়ারই একটি মহিলা সংগঠনের সে পৃষ্ঠপোষক। বধূ হত্যা, নারী নির্যাতন, কন্যা শিশু নিয়ে সে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেয়। তার বক্তৃতা শুনে মহিলারা ধন্য ধন্য করেন। এ সকল সংবাদে নীলিমাও গর্বিত। তার মনের সংশয় বেশ খানিকটা বিদূরিত। এ পরিবারের সকলেই তার কাছে পুত্র সন্তান আশা করে। কিন্তু কন্যা হলেও সে নিখিলের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে না এটাই ভরসা জাগে।

যথা সময়ে নার্সিংহোম থেকে ছুটি পেয়ে নীলিমা বাড়ি ফিরেছে। তার কোলে ছোট্ট পুঁটুলি—তার শিশু কন্যা। গত ক'দিনে নিখিল মাত্র একদিন নার্সিংহোমে গিয়েছিল। তার মুখ ছিল প্রায় বাকশূন্য

থম থমে। নিখিলই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল, কিন্তু চোখাচোখি কিংবা বাক্য বিনিময় হল না। নীলিমা বুঝে গেছে কন্যা হওয়াকে নিখিল মেনে নিতে পারেনি। বাড়িতে ফেরার মুখে না বাজল শাঁখ, না হল উলুধ্বনি। শাশুড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, দৃষ্টি মিনিময়ের পূর্বেই তিনি কোথায় অন্তর্হিত হলেন। দাসদাসীরা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে শুধু উঁকিঝুঁকি মারল। পঞ্চুর মা হাত ধরে নীলিমাকে আঁতুড় ঘরে পেঁৗছে দিল।

এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। নিখিল কিংবা তার মা একবারও নীলিমার সংবাদ নেয়নি। যত্ন-আত্যি যা করার পঞ্চুর মা-ই করছে। তবে নীলিমার শ্বশুর প্রতিদিন বাড়ির বাইরে যাবার আগে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে নীলিমার খোঁজ খবর করেন। নীলিমা এতে খুবই প্রীত এবং মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। পুত্রের বদলে কন্যা হওয়ায় সকলের আশা ভঙ্গ হয়েছে এটা বেশ পরিস্কার। এর পরিণাম যে কী এই ভাবনায় নীলিমা বিভ্রান্ত। পাণ্ডুর আকাশের মতো নীলিমার হৃদয়াকাশও পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। সে জানে না এর শেষ কোথায়! আর শিশু-কন্যার ভবিষ্যৎই বা কি?

এই সময় পঞ্চুর মায়ের ডাক তার কানে পেঁৗছায়—ও বৌদিমণি, শুনতে পাচ্ছ না খুকুসোনা তোমারে ডাকতিছে। নীলিমা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে পায় তার কন্যা জগতের কুটিল রূপ দেখে ভয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে। এক সর্বকালীন স্নেহময়ী মাতৃহৃদয় নীলিমার বুকের মধ্যেও কেঁদে ওঠে। সে শিশু-কন্যাকে বুকে তুলে নেয়। ঠাকুর দালানের দিকে তাকিয়ে তার মনে প্রশ্ন জাগে, বিশ্বজননীর আগমনে সকল হিংসা-দ্বেষ-কুটিলতা দূর হয়ে মানুষের অন্তরে দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি-করুণার উন্মেষ কি ঘটবে না?

বন্ধুবিয়োগ

—ডাঃ কালীপদ চক্রবর্ত্তী

অতি আধুনিক শহর। ইঁট, পাথর, লোহা, সিমেন্ট, চুন, বালি, রঙ—এসব উপাদানে তৈরী বাড়ী। এ রকম বাড়ীর পর বাড়ী আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাগুলো ইঁট, পাথর আর আলকাতরায় মোড়া। মাটির আর সবুজের ঠিকানা বড় একটা মেলে না। এখানে ওখানে দু'একটা ঘাস ও ঐ জাতীয় দু'একটা ঝোপ ভয়ে ভয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে দু'একটা বাড়ীর ঝুল বারান্দায় চিড়িয়াখানার বন্দী পশুদের মত কয়েকটা পোষাকী গাছ চোখে পড়ে।

যতদূর চোখ যায় ঐ একই রকম চেহারা। ব্যতিক্রম শুধু এক জায়গায়। সমীরদের বাড়ীর পেছনে এক টুকরো খালি জায়গা পড়ে আছে। একটা নাম না জানা বড় গাছ ঐ জায়গাটাকে জবর দখল করে দাঁড়িয়ে আছে। সমীরের দোতলার পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে সেটা পরিষ্কার দেখা যায়।

সমীর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, নির্বাচনী পরীক্ষার পর সে বেশীর ভাগ সময় কাটায় তার পড়ার ঘরেই। পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে পুরো দমে। পড়তে পড়তে যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। চোখে পড়ে ঐ গাছটা। বড় ভালো লাগে তার ঐ গাছটাকে। প্রায়ই তার চোখ দু'টো তার মনকে ফাঁকি দিয়ে ছুটে চলে যায় ঐ গাছটার কাছে। জ্যোৎস্না রাতে গাছের সবুজ সবুজ পাতাগুলো রুপোর মত ঝক্‌ঝক্ করতে থাকে। অন্ধকার রাতে তাকে দেখে মনে হয় যেন বিরাট মাথাওলা একটা ভুত জানালা দিয়ে

উঁকি মারছে। ঝড়ের সময় সে প্রাণপনে লড়াই করে বাতাসের সঙ্গে। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজতে তার খুবই আনন্দ।

দিনের বেলায় কত রকমের পাখী দেখা যায় ঐ গাছের ডালে। কেউ নাচে, কেউ গায় কেউ বা অকারণে ঝগড়া করে। সমীর মনে মনে ভাবে এত পাখী আসে কোত্থেকে!

গাছের তলায় দেখা যায় ঘাস-ঝোপ-ঝাড় ইত্যাদির মিতালি। তারই মাঝে ইঁটের টুকরো, মাটি আর ডালপালা দিয়ে মাথা গুঁজবার মত একটা আস্তানা গেড়েছে এক বুড়ো আর বুড়ি। তাদের মলিন ও জীর্ণ বসন আর কংকালসার দেহ দেখে সমীরের মনে বড় দুঃখ হয়। তারা মাটির উনুন বানিয়ে খড়কুটো জ্বালিয়ে কি যেন রান্না করে। মাঝে মাঝে তাদের উনুনে আগুন জ্বলে না। হয়তো সেদিন রান্না করবার মত কিছু জোটে না।

কখনো কখনো অলস দুপুরে কয়েকটা ভিখিরি এসে ঐ গাছের তলায় আশ্রয় নেয়। কোন কোন সময় কয়েকটা দুর্বল ছেলে এসে গাছের ডালে দাপাদাপি করে, ডাল ভাঙ্গে, পাতা ছেঁড়ে। কোন প্রতিবাদ না করেই গাছটা তাদের অত্যাচার সহ্য করে। দু'একটা বেওয়ারিশ কুকুরও মাঝে মাঝে এসে অশান্তির সৃষ্টি করে।

অন্তিম পরীক্ষার শেষে সমীর চলে যায় জব্বলপুরে তার মাসীর বাড়ী বেড়াতে। সেখানে দীর্ঘ অবসর কাটানোর পর খবর পেল তার পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, ফল খুব ভালো হয়েছে। খবর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে যোগ দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি চলে এল। মন তার খুশীর জোয়ারে কানায় কানায় ভরা।

এসেই ঢুকল তার পড়ার ঘরে। উদ্দেশ্য গাছটাকে একবার দেখবে। কিন্তু এ কি! গাছটা গেল কোথায়? তাড়াতাড়ি জানালার কাছে এগিয়ে গেল। দেখল যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত সৈনিকের দেহ যেমন পড়ে থাকে সেরকম গাছটার ছিন্নদেহ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দেখে মনে হল অসহনীয় আঘাতে গাছটা ধরাশায়ী হয়েছে। তার দেহকে কেটে টুকরো

টুকরো করা হচ্ছে। ওখানে মাটি খোঁড়া হচ্ছে আর একটা ইঁটের নতুন খাঁচা তৈরী করার জন্যে। সাহেবী পোষাক পরা কয়েক জন লোক এসব কাজের তদারকি করছে।

ঘরের প্রদীপ নিবিয়ে দিলে যেমন হঠাৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সমীরের মনের আনন্দও তেমনই হঠাৎ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। মুহূর্তমধ্যে তার মনের আনন্দের সাগর পরিণত হয়ে গেল দুঃখের সাগরে।

এই গাছটা ছিল তার বড়ই প্রিয়, ঠিক যেন নিকট জন। দু'জনের অনেক আলাপ হত, কত কথা বলত দুজনে। কিন্তু তাদের ভাষা ছিল নীরব। কেউ তাদের কথা কোন দিন বুঝতে পারে নি। তার মনের ব্যথা বুঝতে পারে এমন কাউকে সে আজও খুঁজে পেলো না। পরীক্ষার ফল জানিয়ে তার কাছে যে চিঠি লেখা হয়েছিল তার মধ্যে অনেক সাধারণ ও খুঁটিনাটি কথাও লেখা ছিল। কিন্তু এই গাছটার কথা কোথাও উল্লেখ ছিল না।

সমীর উদাস মনে তাকিয়ে থাকে তার প্রিয় বন্ধুর দেহের টুকরো গুলোর দিকে। মনে মনে ভাবে—পাখীগুলো এখন যায় কোথায়? গাছের তলায় যাদের আস্তানা ছিল তারা কি মাথা গুঁজবার মত একটু স্থান পেয়েছে এতগুলো ইঁটের খাঁচার মধ্যে? অলস দুপুরে ভিখিরি গুলো আশ্রয় নেবে কোথায়? কুকুরগুলো কি এখনও আসে? ঐ জায়গাটায় আর একটা নতুন বাড়ী মাথা তুলে দাঁড়ালে সে অতটা আলো বাতাস পাবে না, প্রাণ ভরে মুক্ত আকাশ দেখবার সুযোগও থাকবে না। হায় রে সভ্যতা! তুমি একে একে অনেক কিছু গ্রাস করেছ, এরপর কী গ্রাস করবে কে জানে!

নাঃ, সমীর আর ভাবতে পারছে না। বন্ধু বিচ্ছেদের ব্যাথায় তার মন খুব ভারি হয়ে গেছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। নিজের মুখের ওপর নিজেই আস্তে আস্তে দিল জানালাটা বন্ধ করে।

তিতু

অতুল পাল

আমরা একটা পাখী পুষেছি। নাম তিতু, একে চিনবার জন্য বলছি—গলা ও মাথা ছোট। মুখটা ময়ূর ময়ূর ভাব। গোলাকৃতি শরীরে গভীর লোম ও লম্বা পালকে আবৃত। রং কালচে ধূসর। কাক, চিল, টিয়া, ময়না, ময়ূরদের মত লম্বা লেজ নেই। উড়তে অনভ্যস্ত, গুণের কথা বলছি—পোকা-মাকড়, আরশোলা, নেংটি ইঁদুর, ঘরচিতে সাপ তিতু নির্বিঘ্নে ধরে এবং খায় আর আমাদের প্রভুত উপকার হয়, তাই ওকে পুষেছি। অনেকে এদের চিনা মুরগী বলে। তিতু পাখীও বলে।

তিতুকে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে রাখি, অবশ্য সদর দরজার পাল্লা সর্বদা বন্ধ থাকে। আমার স্ত্রী ওর নাম রেখেছে তিতু। "তিতু" বলে ডাক দিলে ঘরের কোণে, খাটের তলে, যেখানে থাক না কেন—কুক্‌কুক্‌ করতে করতে ছুটে আসে। তাতে বুঝি, ওর নাম ও জানে। সারাদিন তিতু স্বাধীন। শুধু আমাদের খাওয়ার সময় ওকে অন্য ঘরে আটকিয়ে রাখি। কারণ, ছাড়া থাকলে লম্বা একটা লাফ মেরে আমাদের খাওয়ার টেবিলে উঠে বড় উৎপাত করে। তিতু মাছ, মাংস, ডাল, ভাত, রুটি, তরকারি সবই খায়। নির্বিচারে খাওয়ার দোষে সোমা রেগে মেগে তিতুকে রাক্ষসী বলে। সোমা আমাদের একমাত্র কিশোরী কন্যা। ওর অভিযোগ, ব্রাহ্মণ বাড়ীর খাদ্যাদিতে সকলেই কিছু না কিছু বাছ-বিচার করে। তিতুর তা নেই, কিন্তু তিতু যে ব্রাহ্মণ নয়—স্রেফ্‌ একটা পাখী সোমা তা বুঝেও বোঝে না। তবে তিতুর খাওয়া নিয়ে সোমার রাগের কারণ অন্য, তিতু মাঝে মাঝে গায়ের লোম ফুলিয়ে গলাটা নিজদেহে

আরো খানিকটা সেঁধিয়ে নিয়ে একটা কিম্ভূৎ কিমাকার রূপ ধারণ করে গোজর গোজর করতে করতে সোমাকে তেড়ে আসে। সোমারও দোষ আছে। তিতুকে খোঁচা না দিলে কিছুই বলে না। তিতু আর সোমার বিরোধটা মিটিয়ে ফেলার জন্য ওর মা অনেক চেষ্টা করেছে।

তিতুর একটা মস্ত দোষ, যত্রতত্র 'টাট্টি' করে। তাই আমি আর সোমার মা বুদ্ধি করে তিতুর জন্য কালাচাঁদ দর্জির কাছ থেকে একটা জামা-কাম প্যান্ট তৈরি করে এনেছি। তিতুর ডানার তল দিয়ে, পেটের নিচ দিয়ে ওর গলার সঙ্গে এক খণ্ড কাপড়ের ফিতের রিং করে বেঁধে দিয়েছি। সারাদিন মল মূত্রাদি প্যান্টের মধ্যেই জমা হয়। প্রথম প্রথম তিতু জামা প্যান্ট পরে ঘরের মেঝেতে খুব গড়াগড়ি করত। বুঝতাম—ওর পছন্দ হয়নি, বিরক্তি ধরছে। একটু ধৈর্য ধরে দেখলাম আর গড়ায় না।

আমাদের তিতু এই প্রথম মানুষের মহোৎসব শ্রীশ্রী শ্যামাপুজো দেখছে। ইতিপূর্বে বিশ্বকর্মা পুজোর বাজনা শুনেছে, দুর্গা পুজোর ঢাকের কাঠি শুনেছে, লক্ষ্মীপুজোর মাইক শুনেছে, ঠিক শুনেছে কি না বুঝাবার জন্য আমি আর সোমার মা ওৎ পেতে দেখেছি। যখনই পুজো মণ্ডপে ঢাকে চিড়বিড় চিড়াং চ্যাং চ্যাং করে তাল তুলেছে অথবা মাইকে উচ্চস্বরে গান ধরেছে, তখনই তিতু মাথাটি এপাশে ওপাশে কাত করে, কখনও ছোট্ট গলাটি লম্বা করে, বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। এই সব ভাবসাব দেখে আমরা ধরে নিয়েছি, ও শোনে, শুনতে জানে। ওর মনে আনন্দ বা আতংক একটা কিছু নিশ্চয়ই জাগে।

তিতুর এসব কিছুতে জ্ঞান হতে না হতে বিশ্বকর্মা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষিত নগরী দ্বারাবতী নির্মাণ করেছিলেন। এই সেই বিশ্বকর্মা, যিনি ব্রাহ্মণ বেশে গোয়ালিনী ঘৃতাচীকে বিয়ে করে যথাক্রমে মাল্যকার, কর্মকার, শাঁখকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধর স্বর্ণকার এবং চিত্রকর এই নয় সন্তানের জনক হয়েছিলেন। দুর্গা,

যিনি মৃত্যুমুখে পতিত স্বামীকে স্তন দুগ্ধে জীবিত করেছিলেন, লক্ষ্মী যিনি অলস ব্যক্তিদের তোষামদ ভালোবাসেন। এ'রা একে একে সদল বলে নিজ নিজ দেশে চলে গেলেন। এলেন দিগ্বিজয়িনী কালী করালিনী এলেন রণ-রঙ্গিনী মূর্তি নিয়ে রুদ্ররূপিনী চণ্ডালিকা। আমরা হাজার হাজার পটকা ধ্বনিতে, আতসবাজি আর নানারকম রং মসলায় রঙ্গিন আলোর ঝর্ণা ধারায় রণজয়ী ক্লান্তদেবীকে অভিনন্দন জানালাম।

কিন্তু তিতুর মধ্যে একটা ভয়ার্তভাব লক্ষ্য করছি। সন্ধ্যা থেকে দোদোমনা আর পটকা বাজির মহড়ায় আমাদের পাড়ায় হুলস্থুল বেঁধেছে। মনে হচ্ছে, মা কালীর সাথে এরাও যুদ্ধ জয় করে, শত্রু বিনাশ করে, বিজয়োল্লাসে ঘরে ফিরছে। বাজির তোড়ে কানে কোন কিছুই শোনা যাচ্ছে না। আমিও সোমার সাথে অনিচ্ছায় লাফাচ্ছি। উপায় নেই, কারণ সোমার চাইতে ওর মাকে ভয় করি বেশী। আনন্দের দিনে আনন্দ না করে, উৎসবের দিনে উচ্ছ্বসিত না হ'য়ে, চুপ করে থাকলে সোমার মা রেগে কাঁই হবে। তারপর কপাল নিয়ে আপসোস করবে। যেহেতু আমার বয়সটা, সোমার মার সাথে যেটা ম্যাচ করার কথা সেটা না হয়ে বেশ খানিকটা বেশী। যাহোক এসব করে ট'রে, আসপাশের গলি ঘুঁচি ঘুরে ২০।২২টা ঠাকুর দেখে ঘরে ফিরেছি তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে।

ঘর খুলে সুইচ বোর্ডে হাত দিয়েছি। সোমা "তিতু তিতু" করে ডাকছে। আলো জ্বলল, তিতু এলো না। সোমার মা দ্বিতীয় বেডরুমে গিয়ে আলো জ্বালালো, কিন্তু তিতু কোথায়?

ওর জল এবং খাবার সবই পড়ে রয়েছে। খায়নি কেন? ও গেল কোথায়? অতঃপর খুঁজতে শুরু করলাম। দরজার আড়ালে, স্নানগারে খাটের তলে, খুঁজে হয়রান হচ্ছি। সোমা আর সোমার মা ডাকতে ডাকতে হয়রান হচ্ছে। অবশেষে টর্চের আলোয় খাটের নিচে, পায়ার আড়ালে দেয়াল সেঁটে চুপ করে বসে থাকা অবস্থায় তিতুকে আবিস্কার করল সোমা। সোমা ওকে বের করে আনার জন্য ঝাড়ুদানির ডান্ডার মাথা

দিয়ে মৃদু খোঁচা দিল। কিন্তু আজ আর দ্বিতীয় পক্ষের বৌয়ের মত জেদী মেয়ে তিতু গোজর গোজর করে তেড়ে এলো না।

বরং আরো গভীর করে আড়ালকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। বাধ্য হ'য়ে আমি খাটের তলায় ঢুকে ওকে টেনে নিয়ে এলাম। তারপর ওকে আদর করে খাবারের বাটীর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। তিতুর সেদিকে লক্ষ্য নেই। ভীরু বুনো হাঁসের মত লাল চোখ দুটি মেলে কোন এক অজানা আশংকায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। এই সময় আমাদের ঘরের পিছনে একটানা দো-দোমার পট্‌পট্‌ পটাস্‌ আওয়াজের সাথে সাথে তিতু এক মরণপন দৌড়ে গিয়ে সেই অন্ধকার কোণটায় লুকালো। আবার তাকে টেনে বের করে এনে খাওয়ানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই তিতু খাবে না। আমি ওকে বুকের কাছে চেপে ধরে আদর করছি। বাইরে চারদিকে বাজি ফুটছে। প্রত্যেকটা পট্‌কার শব্দ তিতুর হৃদপিণ্ডটায় ধাক্কা মেরে আমার হৃদপিণ্ডটায় এসে ঠেকছে। আমি অনুভব করছি। বাজীর শব্দে তিতু ভীষণ ভয় পেয়েছে। প্রত্যেকটা কান ফাটা শব্দে তিতুর হৃদপিণ্ডটা ফাটছে। মানুষ ভয় পেলে ঝাড়-ফুক্‌, তুক্‌তাক্‌ করা যায়, কিন্তু তিতুকে কোন্‌ মন্ত্রে ভয় ভাঙাই? ওকে এখন কোথায় নিয়ে যাব—যেখানে বাজির উৎপাত নেই? এ পাড়ায় এমন জায়গা কোথায় আছে? শুধু এ পাড়াই বা বলছি কেন—এই মুহূর্তে এদেশে এমন কোথাও একটু জায়গা নেই, যেখানে পট্‌কা বাজির বিকট শব্দ পেঁাছায়নি?

এই উৎকট শব্দ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কে যাবে অভিযোগ দায়ের করতে? আর শুনছেই বা কে? তিতুর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সগোত্রীয় পশুপাখী, সবাই তো আতংকগ্রস্থ। ওদের কে কোথায় লুকিয়ে মরছে, তার খবরই বা কে রাখে? মানুষদের আনন্দ যজ্ঞে ওদের মৃত্যুর নিমন্ত্রণ!

সন্ধ্যা থেকে বাইরে ঘুরে ঘুরে আমরা পরিশ্রান্ত। তারপর তিতুকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আমরা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যা হোক এক রাত্রি

না খেয়ে থাকলে তিতু মরবে না। সোমা বলল, "কালীপুজোয় উপোস থাকা ভাল।" ওর মা একটু হেসে বলল, "ঠিক বলেছিস, বামুন বাড়ীর পাখী উপোস করা শিখুক।"

আমি আর কিছু বললাম না। মনে মনে তিতুর জন্য ভয়হারিনী মা কালীকে একবার স্মরণ করলাম এবং আমরা কিছু গলাধঃ করণ করে রাত প্রায় একটা নাগাদ শুতে গেলাম। তখনও বাহিরে বাজির আওয়াজ ও বারুদের গন্ধে বাতাস ভরপুর।

সোমা বেশ ভোরে উঠে খাটের তলায় বসে উচ্চ রবে ওর মাকে ডাকছে। সে ডাকে আমারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। সোমা তিতুকে টেনে আনল বাইরে। তিতু শান্ত হয়ে গেছে। লাল চোখ দুটি বন্ধ। আমি তিতুর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করার সাথে সাথে সোমা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সোমা কাঁদছে এবং বলছে, "আমি আর তোকে খোঁচাব না তিতু। আর কোনদিন বাজি ফাটাব না।"

ওর কান্নায় আমার মন ভিজে আছে গোপন অশ্রুতে। ওর মার চোখ ভরে জল এলো। ওদের অশ্রুজলে সিক্ত তিতুকে আমি পোষ্টমর্টেম করছি। শব্দের আঘাতে তিতুর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে।

তিন কিশোরী

মনুর মার অঙ্গন এখন নিস্তব্দ। মনুর মা রাঁধছে। তার রান্নার গন্ধে বাড়িঘর আমোদিত। মনুর বাবা ঘরে, খাটে শুয়ে আনন্দবাজার দেখছে। মনুর স্কুল মর্নিং-এ। ও এবার অষ্টম শ্রেণীতে। বেলা এখন ৯টা। ··· ফেব্রুয়ারী, '··· সাল। একটু আগে মনুর বাবা পাতকুয়োর চাতালে বসে মাছ কুটেছে। জা'গাটায় তখনও রক্ত, দু'একটা

আঁশও পড়ে আছে। ঠিক ওখানটায় টেঁপি ও পুঁটি মুখোমুখি বসে হাত-পা চাটাচাটি করছে এবং নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করছে।

পুঁটি তিরস্কারের সুরে টেঁপিকে বলল, "তোর মত বেহায়া মেয়ে-ছেলে আমি জীবনে দেখি নি।"

টেঁপি 'ম্যাও' করে গর্জে উঠল, "কী আমি বেহায়া?"

পুঁটি বলল, "তুই বেহায়া নয়! এই একটু আগে মনুর বাবার কাটা মাছে থাবা মারতে গিয়ে একচোট মা'র খেলি। এখন আবার সেই রক্তমাখা জা'গাটায় জিব ঘসছিস। তুই কী শুধু বেহায়া? তোর মত লোভী, পেটুক মেয়েলোক আর ক'টা আছে বল তো?

টেঁপি রাগে গরগর করতে করতে পুঁটির মুখে একটা থাবা মেরে বলল, "আরে বুদ্ধু! সেধে কেউ দেয় না, চুরি ছিনতাই না করলে বাঁচবি না।"

পুঁটি বলে, "ওসব করতে গেলে পিটুনী খাবি।"

টেঁপি বলে, "পিটুনীতে ভয় পেলে না খেয়ে শুকোবি।"

"তাই বলে চুরি ছিনতাই করবি? মৃদু কণ্ঠে পুটি সুধায়।

টেঁপি এবার জোরালো গলায় বলল, "করব, আলবৎ করব। দেখিসনি, মনুর মার কতগুলো ইঁদুর, আরশোলা, পোকা-মাকড় মেরে দিলাম। তবোও কী আমাকে মনুর মা একটু মাছ বা দুধ দিল? মাছের কাটাগুলোও ওরা চিবিয়ে চিবিয়ে রস খেয়ে—তবে আমাদের জন্যি ছাড়ে। এবার বুঝেছিস—এরা কেমন স্বার্থপর! এদের হাড়ি থেকে চুরি, ছিনতাই করে খেতে হবে।"

পুঁটি অসহায় কণ্ঠে বলে, "যাগগে বাবা, ওসব আমার দ্বারা হবে না। পাঁচ বাড়ি মেগে খাব, সেও ভাল।"

এ সময় টেঁপি একটা লম্বা হাই তুলে 'ম্যাও' করে বলল, "সকালে একটু খেলব, তার উপায় নেই, মনু যে রোজ সকালে কোথায় আড্ডা মারতে যায়?" কথা ঘুরিয়ে আবার বলে, "যাবে আর কোথায়—সেই

কী সব জ্যান্ত জ্যান্ত জীবজন্তু ধরে নিয়ে আসবে, আর আমাদের সামনে নাচাবে।"

পুঁটি বলে, "দূর পাগলী, ওগুলো ফলস্। মনু আমাদের ফলস্ মারে। কাঠির মাথায় সুতো জড়িয়ে কাগজের টুকরো, সুপোরির খোসা বেঁধে নাচায়। আর তুইও বোকা বটে—!"

টৌপি ধমক দিয়ে উঠে, "ক্যাবলার মত কথা বলিস কেন? মনু যদি আমাদের ফলস্ই মারবে, তাহলে সামনে এলেই আমার গা শির-শির করে কেন?"

টৌপির কথায় সায় দিয়ে পুঁটি বলে, "আমারও করে বটে, তবে আমি বুঝি—মনু আমাদের ফলস্ মারে।"

টৌপি বলে, "ঝাগ্ গা বাবা, তক্ক ছাড়। চল, মনুর মার রান্নায় একখানা থাবা মেরে আসি।"

পুঁটি আপত্তি জানায়, "না বাবা, আমি যাব না। মনুর বাবা ঘরে আছে। বড্ড মারে, দেখিসনি হুলোটাকে কীভাবে লাঠিপেটা করে তাড়ায়। লোকটা ভারী নিষ্ঠুর।"

টৌপিও কণ্ঠ আর্দ্র করে বলে, "মনুর মাও কম যায় না, বলা নেই, কওয়া নেই, ঝপ্ করে গা'র উপর জল ঢেলে দেয়। আচ্ছা, তুই একটু বোস, আমি ২/১ খানা ইঁদুর মেরে আসি।" অতঃপর টৌপি হেলে-দুলে মনুর মার ঘরে ঢুকছে।

পুঁটি কুয়োর চাতালে বসে দেখছে, টৌপিটা সত্যিই সুন্দরী! সারা গায়ে সাদার উপর কালো আর হলুদে ছাপ মারা রং বাহার। লেজ ভরা এক গাদা লম্বা লোম। সব সময় ফুলে ফেঁপে থাকে। দারুণ দেখতে! মনুরও যদি টৌপির মত একখানা বাহারী লেজ থাকত! মনুর গা'য়ের রংটা একটু কালচে বটে, কিন্তু ওর মনটা ভারী ভাল। হঠাৎ পুঁটির ভাবনায় বাধা পড়ে। মনুদের বাড়ির গেটের তলা দিয়ে হুলোটা ঢুকছে। হুলোর অনেক বয়স হয়েছে। গায়ের লোম উঠে যাচ্ছে। চোখেও ভাল দেখে না। এ বাড়ি, সে বাড়ি করে,

মানুষের ঘৃণা, বিদ্বেষ আর লাঞ্ছনা সহ্য করে, এখনো বেঁচে আছে। হুলো বুড়ো আস্তে আস্তে মনুর মার ঘরের দরজার নিচে এসে বসল। পুঁটি গুটিগুটি এগিয়ে গিয়ে হুলোর মুখোমুখি বসল। হুলো বুড়ো ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হে, আর এক সখীকে দেখছি না যে ?"

পুঁটি উপহাস করে উত্তর দিল, "টেঁপি কি আর চুপচাপ বসে থাকা মেয়ে? সে এখন অনেক কাজে ব্যস্ত। মনুর মার ঘর সাপাই করছে।"

হুলো বুড়ো, "ম্যাও - তাও ভাল। তা আমি বলি কি, তোদের বয়েস হচ্ছে, সমঝে চলা ফেরা ভাল। পাড়ায় টেঁপির খুব বদনাম হচ্ছে, বুঝলি ?"

পুঁটি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "কেন গো দাদু !"

হুলো বুড়ো বলে, "অবশ্যি তোদের বা কী দোষ দেব ? এ তো বয়সের ধর্ম। তবে আমাদের সময়, আমরা হুলোরাই মেদি বেড়াল খুঁজে নিতাম। এখন যুগ পাল্টেছে। তবু ওকে বলিস, হুলো খুঁজতে যেন বড় রাস্তা পার না হয়। দস্যি দানবের মত বড় বড় গাড়ীগুলো যে ভাবে পাগলের মত ছোটে—চাপা পড়লে··ম্যাও···· আর ভাবতে পারছি না।"

পুঁটি লজ্জার কথা এড়িয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, "তা দাদু, তুমি এই বয়সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে খেয়ে বেড়াও কেন ? নিজের বাড়ি যা জোটে, সেই তো ভাল।"

হুলো কাতর কণ্ঠে বলল, "দুঃখের কথা তোকে আর কী বলব, বাড়িতে যাঁরা একটু আধটু কুচো মাছ আনে, তা ওরা নিজেরাই কাটাকুটি শুদ্ধ গেলে। আমার ভাগ্যে জোটে না। তাই এখানে আসি। মনুর বাবা বেশ বড় বড় মাছ আনে। কাঁটাগুলোও বড় বড়। মিথ্যে বলব না—মনুর মা ২/৪টা কাঁটা আমাকেও দেয়।" পুঁটি হুলোর কথায় বাধা দিয়ে বলল, "আচ্ছা দাদু, একটা কথা শুনছি—

মানুষেরা নাকি আইন করেছে, প্রাণী সংরক্ষণ করবে। কোন জীব-জন্তুকে আর মরতে দেবে না?"

হুলো বুড়ো বলল, "আরে ভাই, তা'হলে তো বেঁচে যাতিস্। ও সব আইন আমাদের জন্যি নয়।" হুলোর কণ্ঠস্বর আরো ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল, "কোথায় কোন বনের বাঘ-ভালুক, সাপ কোপের জন্যি। তাদের জন্যি মানুষগুলোর মায়াকান্না! তারা নাকি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে! আমরা কিছুই করি না। আমরা বেড়াল কুকুর সব পরগাছা। আমরা এখন আর কোন উপকারে আসি না। —যতসব…ম্যাও।"

হুলোর কণ্ঠ রাগে ক্ষোভে দুঃখে গরগর করে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে হেঁই হেঁই শব্দ করে মনুর মা পা দাপিয়ে ওদের তাড়া করল। পুঁটি ছুটে গিয়ে নারকেল গাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে মনুর মা'র দিকে চেয়ে রইল। হুলোটা সামান্য একটু পিছু হটে বুক ও মাথা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে ঘাড় কাৎ করে পড়ে রইল। মনু তখন ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরছি। বইয়ের ব্যাগ কাঁধে। উপোসী চোখদুটো ক্ষুধায় কাতর। মনুকে দেখে পুঁটি এগিয়ে যায়। ওর পায়ের কাছে জড় হ'তে চায়। মনু দেখল ওদের ফুলগাছটার কাৎ করা বড় ডালটার উপর টেঁপি শুয়ে লেজ ঝুলিয়ে চোখ বন্ধ করে ঘুমাচ্ছে।

টেঁপি যে কখন মনুর মার ঘর থেকে বেরিয়ে ফুলগাছে উঠেছে, তা পুঁটিও খেয়াল করতে পারেনি। মনু চুপিসারে একটা কাঠি নিয়ে টেঁপির বোগলে খোঁচা দিল। টেঁপি চোখ খুলে মনুকে দেখল কিন্তু গ্রাহ্য করল না। মনু আবার খোঁচাচ্ছে আর চোখ দিয়ে হাসছে। টেঁপি বিরক্ত হয়ে কাঠিটা কামড়িয়ে ধরল। তারপর একলাফ মেরে নিচে পড়ল। মনু উঠোনে পড়ে থাকা একটা দড়ি কুড়িয়ে টেঁপি ও পুঁটির চোখের সামনে নাচাতে লাগল। ওরা সেটা ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু মনু ওদের ধরতে দিচ্ছে না। মনু ওদের বোকা

বানাচ্ছে আর হাসছে। একটু দূরে হুলো বুড়ো এই তিন কিশোরীর তামাসা দেখছে। হঠাৎ মনুর মা ঘর থেকে গর্জে উঠল, "এ্যাই লক্ষ্মী-ছাড়ী, এসেই অমনি বেড়াল নিয়ে পড়লি?" বেহায়া মেয়ের জন্যি জ'লে মলাম। বই পত্তর রেখে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে আমায় রেহাই দাও।"

অপ্রসন্ন চিত্তে মনু দড়িটা টান মেরে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকল।

টেঁপিটা অগত্যা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পুঁটিকে বলল, "তুই দাড়া, আমি একটু ও বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।"

পুঁটি বলল, "যাও, ঠ্যাংগানী খেতে ···।"

- দূর, তোর খালি কথায় কথায় ঠ্যাংগানী" বলেই টেঁপি এক লাফে পাচিলের উপর উঠে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হুলো বুড়ো কাতর স্বরে ডাকল, "ম্যাওও··"। পুঁটি হুলোর ডাকে সাড়া দিয়ে গুটিগুটি তার কাছে গিয়ে বসল।

সহসা "গেল · গেল" রবে গৌর নগরের মোড়ে উচ্চগ্রামে জন কোলাহল উঠল। ওরা উৎকর্ণ হল।

"আহারে কী সুন্দর বেড়ালটাকে চাপা দিয়ে শালা শুয়োরের বাচ্চা পালাল।"

—"আরে ·এ যে মনুদের বেড়াল!"

মনুর মা শোরগোল শুনে ছুটে গিয়ে দেখল। টেঁপি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। রক্তাক্ত। ভয়ানক বীভৎস্য বিকৃত। মনুর মা বুকভরা যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে তাকাল পিছনে। দেখল, মনুর দু'চোখ জবার মত লাল। মনু কাঁদছে।

"ঝাড়বাতির কান্না"

—কাজল মিত্র

ঘাস। ঘন সবুজ ঘাস। উপরে ঝকঝকে আকাশ। নীল জমিতে কালো মেঘের আসা যাওয়া। কালো মেঘের ভালবাসায় সবুজ আরও সবুজ হবে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘাসের বুকের কাঁপন দেখছিল চুমকী। শেষ বিকেল, কনে দেখা আলোয় সবুজ মাঠ, পাকানো রাস্তা, গজিয়ে ওঠা ঝুপড়ি, নারকেল গাছ, ছাড়া ছাড়া বাড়ী— সব নিয়ে প্রকৃতি মোহময়ী হয়ে উঠেছে। পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ। কালো জমিনে লাল পাড়। মোহিনী আলোয় চোখ মেলে চুমকী।

শহর কলকাতাকে এতদূরে টেনে বাড়ানো হলেও এই অঞ্চল এখনও বেশ ফাঁকা। কলকাতার ফুসফুস, এবং আরও খানিক এগিয়ে গেলে তথাকথিত "হৃদয় হীনার" হৃদয়ের সন্ধান মিলবে। বিশুদ্ধ বাতাস, সবুজ শাক সব্জী, তাজা মাছের যোগান দিয়ে চলেছে নীরবে, নিঃশব্দে মহানগরীর হৃদয়বতী মা। আবার এই মাকেই পণ্যা করার ষড়যন্ত্রে মেতেছে কেউ কেউ। ফাঁকা মাঠে চাষের নাবাল জমিতে গজিয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে একটা দুটো পাকা বাড়ী। চুন সুড়কী সিমেণ্ট দিয়ে লোহার বিম পিলার রোপিত হচ্ছে যেন। ফুটপাতে এখনও কিন্তু সবুজ গালচে। পাকা রাস্তার ওপারে একটা বড় কারখানা। মাঠের মাঝে উঁচু মতন একটা ডাঙা জমিতে বেশ কিছু ঝুপড়ি ঘর। চুমকীরা ওখানে অস্থায়ী আস্তানা পেতেছে। সে হাই তুলে পাশ ফেরে। সারা শরীরে রাজ্যের আলিস্যি, জড়তা। কাল সারারাত গাড়ীতে কেটেছে। টুং টাং মিষ্টি শব্দ ভেসে আসছে ঝুপড়ি গুলোর সামনে থেকে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চুমকী চোখ বোজে।

চুমকী তার স্বামী কিষেণলালের সঙ্গে আজই এসেছে কলকাতায়। তাদের দেশ রাজস্থানের জয়শলমীরে। রুক্ষ মরু ধরিত্রী বন্ধ্যা। এক ফোঁটা জলের জন্য চুমকীকে অনেক চোখের জল ঝরাতে হয়। চুমকীর শ্বশুরে বাড়ীর লোকেরা ঝাড়বাতি তৈরী করে। পাইকাররা এসে নিয়ে যায়। অবশ্য বিভিন্ন অংশ রাজস্থান থেকে তৈরী করে আনে। কলকাতায় সেই অংশ গুলি জোড়া দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ঝাড়বাতির ভেতর এখন আর মোম কাঁদে না, সেখানে বিদ্যুতের লাস্যময় হাসি।

টপ্ টপ্ করে গায়ে বৃষ্টি পড়তে চুমকী উঠে বসে। জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সকলে ঝাড়বাতির সরঞ্জাম নিয়ে হৈ হৈ করে ঝুপড়িগুলোতে ঢুকে পড়ল। এত জল, এত বৃষ্টি! চুমকী উঠে দাঁড়িয়ে ভিজতেই থাকে। জিভ বার করে বৃষ্টির স্বাদ নেয়। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই সর্বাঙ্গ ভিজে নেয়ে ওঠে। আনন্দে চুমকীর চোখে জল আসে। নোনা জল, "এ্যাই চুমকী" স্বামীকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে খিলখিল করে হেসে ওঠে। আঠার বছরের চুমকীর মুখে ঝাড়বাতির রোশনাই, হাসিতে ঝাড়বাতির টুং টাং গান। ঝুপড়িগুলোর ভেতর থেকে অনেক মেয়েপুরুষের কোলাহল ভেসে আসছে। দেখতে দেখতে নীচু জমিতে জল জমে যায়। রাস্তা দিয়ে, মাঠ দিয়ে কুলকুল শব্দে জল বয়ে যাচ্ছে। চুমকী দুচোখ ভরে দেখে, সর্বাঙ্গ দিয়ে গ্রহণ করতে চায়। রাজস্থানে জয়শলমীরের গ্রামে রোজ তিন চার মাইল হেঁটে দূর থেকে জল আনতে হয়। গরম কালে একফোঁটা জলের জন্য কত কষ্ট। শাশুড়ী ননদ কত মেরেছে জল না আনার জন্য।

"পারব না, কিছুতেই পারব না গরম বালু ভেঙে মাইল ভর গিয়ে জল আনতে" মল বাজিয়ে ঝমঝমিয়ে চুমকী ঘরে গিয়ে দরজা দিত। কলকাতা প্রবাসী কিষেণলালকে বড় নিষ্ঠুর মনে হত। কিষেণলাল কলকাতার জলের, এই সব নীচু জলা জমির কত গল্প করত। চুমকী কাঁদত। চুমকীর বাপের বাড়ী জয়পুরে। রাজস্থানের এই অঞ্চলে বড় লেক আছে। তেমন জল কষ্ট সে বাপের বাড়ীতে পায়নি। তার

দু'চোখ ভরে অফুরন্ত জলধারা "তিয়াস লাগলে আঁখির পানিই পিও।" ননদ মাথায় কলসী চাপিয়ে জল আনতে যাবার আগে শাসিয়ে যেত। কিষেণলালকে কত মিনতি করত "আমাকে কলকাতায় নিয়ে চল। কলকাতার রাস্তায় বাস চলে, লরী চলে, আবার নৌকাও চলে বর্ষাকালে! আমি নৌকা চাপব জলে পা ঝুলিয়ে।" আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠত। "কি মজা।" "হ্যাঁ মজা বইকি। যারা রাস্তায়, ঝুপড়িতে ঘর বাঁধে তাদের ঘর সব ভেসে যায়।"

"রাস্তায় ঘর বাঁধে কেন?" চুমকী অসহিষ্ণু হয়।

"ঘর নেই বলে।"

"তা বলে রাস্তায় ঘর বাঁধবে?" চুমকীর মুখ থমথম করে। ভেবে পায় না এত জল যে ঘর সংসার ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যাক্ ভাসিয়ে নিয়ে যাক্। জলের সঙ্গে মিতালী করে সে জলেই ঘর বাঁধবে। "আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল কলকাতায়।"

"দূর পাগলী সেই রাস্তায়?" কিষেণলাল কিশোরী স্ত্রীকে কাছে টানে। তার ঠোঁটে নোনতা জলের স্বাদ লাগে।

চুমকীর মনে পড়ল জল আনেনি বলে তার শাশুড়ী তাকে পুরো একদিন জল খেতে দেয়নি। সে মাঠের হাঁটু জলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। "বেহায়া, বেশরম" কিষেণলাল যতই চাপাকণ্ঠে ভৎর্সনা করে, চুমকীর ঝাড়বাতির রোশনাই জ্বলা মুখে ততই হাসির টুং টাং বাজতে থাকে। চুমকী কলকাতার জলের গল্প শুনে স্বামীর সঙ্গে কলকাতা দেখতে এসেছিল। আসতে যদি না দেয় তাই নিজের একটা খবর লুকিয়ে-ছিল। যাই হোক সে কলকাতার জলের প্রেমে পড়ে গেল। সে রান্না করত, রাস্তার কল থেকে জল আনত। ঝাড়বাতির কাজও করত। আর সময় পেলে কাছের একটা পুকুরের পাড়ে বসে দেখত। তাদের গ্রামের অনেক মেয়ে পুরুষ, আত্মীয় পরিজন একসঙ্গে ঝাড়বাতির কাজ করত। কিষেণলালের বাবা দাদাও এসেছে। বছরের কয়েক মাস এখানে থেকে কাজ করে দেশে ফিরে যাবে।

চুমকীর গোপন খবর আর গোপন রইল না। এবার তাকে দেশে ফিরে যেতেই হবে। ঘুমের মধ্যে বিভীষিকা দেখে। মাথার উপরে সূর্য্যের রক্তচক্ষু, পায়ের তলায় গরম বালু। জল না আনলে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, এমন কি খাবার জলও বন্ধ। চুমকী যাবে না কিছুতেই। তার সন্তান কলকাতাতেই জন্মাবে। তাহলে জলকষ্ট পাবে না জীবনে। তার এই অদ্ভুত ধারনা হয়েছে। কিষেণলালের বাবা দাদা রাগারাগি করে। কিষেণলালের মারও দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে। অনিচ্ছুক যুবতী মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে গিয়ে একদিন ঝামেলায় পড়ল তারা। আবার একদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখল। শেষে অন্য আর একদিন পুকুরে একগলা জলে দাঁড়িয়ে রইল। "এগিয়ে এলে আমিও পিছিয়ে যাব।" চুমকী অথৈ কালো জলের দিকে তাকায়। কিষেণলাল ছেড়ে দেয়, "জলেই মরবি তুই।"

"জল আমায় ভালবাসে, আমিও ভালবাসি।"

ভুরু কুঁচকে চপল মতি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কিষেণলালের মনে হয় নেমক হারাম মেয়ে মানুষ।

চুমকী বাতিক গ্রস্তের মতন সময় পেলেই পুকুরে মলপরা মেহেদী রাঙানো টুকটুকে পা দুটি ডুবিয়ে বসে থাকত। জলের ছায়ায় নিজেকে দেখত। গলা জলে দাঁড়িয়ে হাতদুটি ছড়িয়ে দিত দুদিকে। জলে মুখ ডোবাত, ঠোঁট ঠেকাত। পারলে জলকে আলিঙ্গন করে। জলকে পেয়ে যেন পাগল হয়ে উঠত। ইচ্ছে করে জলের বুকে সাঁতার দিতে। কিন্তু মরু কন্য সাঁতার জানে না।

যথাসময়ে হাতপাতাল থেকে একরাশ যুঁইফুলের মত মেয়েকে নিয়ে চুমকী ফিরল। মেয়ের মুখ দেখে কিষেণলালের সব রাগ জল হয়ে গেল। ফুলের মতন ফুলমতিয়া। দেখতে দেখতে মেয়ে একমাসের হল। আর কিছু দিনের মধ্যে তারা দেশে ফিরবে।

সেদিন সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টি শুরু হল। চুমকী মেয়েকে বুকের কাছে নিয়ে বৃষ্টির গান শুনছে। ঝুপড়ির ভেতর অল্প বৃষ্টির সেই অল্প

ছাটে মেয়েকে ভেজায়। "নে নে বেটি, জলকে মেখে নে, কত মিষ্টি, আরাম পাবি।" মুখে চোখে বৃষ্টি পড়তে ফুলমতিয়ার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ পিটপিট করে ঠোঁট ফোলায়। "পাগলী জলপরী আমার রে।" কিষেণলাল ঠাট্টা করে।

মাঝরাতে আর্ত চিৎকার ও কোলাহলে ওদের ঘুম ভেঙে গেল—"কিষেণলাল চুমকী বাইরে এস।" চুমকী মেয়েকে বুকে নিয়ে উঠে বসে। কিষেণলাল বাইরে বেরিয়ে যায়। মাঠে এত জল জমেছে যে উঁচু ডাঙ্গা জমি জলে ডুবুডুবু। অনেক ঝুপড়িতে জল ঢুকে গেছে। সকলে জিনিসপত্র নিয়ে জল ভেঙে রাস্তার ওপারে কারখানা বাড়ীর দিকে চলেছে। চুমকী এবার জলকে ভয় পেল। এ কী সর্বনাশী রূপ। মাদুর কাঁথা বালিশ সমেত মেয়েকে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরে মাঠের জমা জলে পা দেয়। জিনিসপত্র সামলাতে সামলাতে কিষাণলাল চিৎকার করে, "সাবধানে ফুলমতিয়াকে রাখবি।"

কিছুটা এগিয়ে আসার পর একটা গর্তে পা পড়ে চুমকী হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। মেয়েকে বুকে চেপে ধরে চিৎকার করে নিজেকে সামলায়। "হুঁশিয়ার, সাবধান।"

মাল সামলে অন্ধকারে এক কোমর জলের মধ্যে মানুষগুলোকে কেমন অশরীরী বলে মনে হয়। পায়ের তলায় নরম মতন কি একটা ঠেকল। গা শিরশির করে ওঠে।

কারখানার শেডের তলায় ওরা আশ্রয় নেয়। চুমকী মেয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে চায়। বিছানা, কাঁথা, বালিশ তোলপাড় করে কেবল। তারপর তীব্র আর্তনাদে খান্ খান্ হয় অন্ধকার রাত। মাঠের জলের উপর দিয়ে তা বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ে—"আমার ফুলমোতিয়া কোথায় গেল!"

ভোরের দিকে মাঠের জলে ফুলমতিয়া ভেসে উঠল। জল খেয়ে পেটটা ফুলে উঠেছে। চুমকী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। জলে ডুবে জল খেয়েই মেয়েটা মরে গেল। জল খেয়ে মানুষ আবার

মরেও যায় ! তার চোখে মরুভূমির শুষ্কতা। বাষ্পের লেশ মাত্রও নেই। পারলে পৃথিবীর সব জল শুষে নেবে। দু চোখে ধক্‌ধক্‌ করে সূর্যের দীপ্তি। শোকে, ক্রোধে কিষেণলাল চমকীকে আঘাত করে—"সোহাগের জলকে মেয়ে দিয়েছিস, তাই তোর চোখে জল নেই।" চমকী জ্ঞান হারায়।

ক'দিনের মধ্যে চমকী স্বামীর সঙ্গে দেশে ফিরে গেল বাধ্য মেয়ের মতন। প্রথম সন্তানের এরকম অপঘাত মৃত্যু হল, তার লাঞ্ছনার সীমা রইল না। তবে তার মনে আর কোন কষ্ট নেই। "মেয়ে জলে ডুবে জল খেয়ে তবে মরেছে। কত জল ! জল খেতে খেতে শেষকালে মরেই গেল।" চমকী আনন্দে হাসির দমকে ভেঙে পড়ে।

একদিন দুপুরে সূর্যের তাপে জয়শলমীরের গ্রাম ঝলসে যাচ্ছে। বালি তেতে আগুন উঠছে যেন। গ্রামের বাইরে খেজুর গাছের তলায় ঢিবি। চমকী সামনে নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে বসে আছে। দূরে কি চক্‌চক্‌ করছে ! জল ! দু হাত দিয়ে চোখ রগড়ায়। আরে ঐ তো জল ! ছোট ফুলমতিয়া তাতে সাঁতার কাটছে আর খিল্‌খিল্‌ করে হাসছে। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জলের মধ্যে ফুলমতিয়াকে। "ফুলমতিয়া……ফুলমতিয়া……" চমকী বালির উপর দিয়ে সমানে দৌড়াতে থাকে।

অস্বস্তি

প্রদ্যোৎ নাথ সরকার

হাওড়া স্টেশন। একটি ঘোষণা,—"বর্দ্ধমানের কাছে মালগাড়ী লাইনচ্যুত হবার ফলে······ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘোষণা শুনে এক যাত্রী বলে ওঠেন—কেন বাবা, কর্ড লাইনটা কি জন্য? গাড়ীগুলো ঘুরিয়ে দিলেই তো পারে।

ভ্রূ কুঁচকে পাশের জন বলেন—কি করে দেবে দাদা; কর্ড-মেইন দু লাইনেই মাথা রেখে মালগাড়ী মহাশয় শুয়ে পড়েছেন। হুঃ, স্টেশনের নামটা শুনেও বুঝতে পারলেন না দাদা?

এক রসিক ভদ্রলোক এতক্ষণ মিট্‌মিট্‌ করে দেখছিলেন আর পরিবেশটায় মজা আনতে এবং রস ঢালতে অপেক্ষায় ছিলেন। এবার বলেন—দাদা বোধহয় মেমারীর ধার ধারেন না। ভুলে গ্যাছেন। সাত পাক ঘোরালেও ট্রেন ল্যাঠায় আটকা, কোন পাঁকে বর্দ্ধমান যাবেন দাদা!

কণিকা দেবী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন, এবার বিরক্ত মুখে 'আশ্চর্য!' কথাটা উচ্চারণ করে লেডিজ ওয়েটিং রুমের দিকে পা চালান। বসার ইচ্ছায় তাকিয়ে দেখেন কোণের দিকে একটু জায়গা আছে। থাকার কথা নয়, তবু এগিয়ে গিয়ে বসতে যাবেন এমন মুহূর্তে শুনতে পান—আরে! কণা না, তুমি! বসো বসো।

অনেক বছর পর দেখা। সবিতা দেবী খুশীর উচ্ছ্বাসে জায়গাটুকুকে নড়েচড়ে বাড়িয়ে বসতে দিলেন।

কণিকা দেবী বসে হাঁফ ছেড়ে বলেন—হুঃ, কর্তাকে তো খুব ইয়ে

করিস্। দিনরাত তুমি তুমি বলিস। সে অভ্যেসেই আমাকে তুই বলতে পারলি না। কি রে ঠিক কি না বল?

সবিতা দেবী লাজুক চোখে মিটমিটি হেসে বলেন—লজ্জা দেবার অভ্যেসটা দেখছি তোর ঠিক বজায় আছে। দ্যাখ্ কত বছর বাদে দেখা; তুই বলতে কেমন আটকালো। দ্বিধা হচ্ছিল বুঝলি। কিন্তু হ্যারে কণা, তুই রেকর্ড ভেঙে যাকে······

—সেই রে সবিতা, কি মজা দ্যাখ—কলেজে প্রথম কিছুদিন আপনি, আপনি—তারপর তুমি। তুমি-র অপ-মৃত্যুতে এসে পড়ে তুই। এই তুই-তুকারী শেষ পর্যন্ত পুনরায় তুমিতে···কি রে সবিতা, অমন করে তাকিয়ে কি দেখছিস্?

—দেখছি, যে কারণে আমার কথা বলতে দিলি না। হ্যারে কণা! গলায় গলায় ভাব-ভালোবাসা, তুই শব্দটা মামুলী নয় রে। কিন্তু, তুই ছেড়ে যাকে তুই-তুমিতে নিয়েছিলি, তার খবর বলবি? তোর দেহে কোন চিহ্ন দেখছি না যে!

কণিকা দেবী আর পারলেন না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনমনা হলেন একটু। ওয়েটিং রুমে অসংখ্য মহিলাদের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন—তুই যাচ্ছিস কোথায়? আমাকে বসতে দিলি, সে জায়গাটুকু কার জন্য রাখা ছিল? তোর ছেলে না মেয়ে হয়েছে?

সবিতা দেবী বুঝলেন—কণিকা আপন প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চায়। দ্বিতীয়বার কণিকাকে চাপ না দিয়ে ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দূরে আঙুল দিয়ে দেখান—ঐ দ্যাখ, ঐ যে আমার মেয়ে মণিকা, ওর বাবার পাশেই। সবুজ জামা। তোকে ঠিকানা পাঠিয়ে চিঠি দিয়েছিলুম। মেয়ে হোল, আবার চিঠি দিলুম, তোর পাত্তাই নেই। যাক্, যাচ্ছি চোদ্দ বছর বনবাসের শেষ কয়েক মাস কাটাতে বেনারস। এর মধ্যে পারলে একবার যাস্ কিন্তু। এরপর আমরা কলকাতায় বদলি হয়ে আসছি। এবার তোর খবর কিছু বল্।

কণিকা দেবী সবিতা দেবীর স্বামী ও কন্যাকে দেখে কেমন যেন

হয়ে গেলেন। সবিতা দেবীর হাত চেপে ধরে বললেন—হ্যাঁ বলবো। আর পারবো না রে—চেপে রাখতে পারবো না। নিমাই বাড়ুইকে নিয়ে আমার ব্যাপারটা তো তুই জানিস্।

—হ্যাঁ। কিন্তু শেষটা আর জানা হোল কোথায়? সবাই এম. এ. পাশ করলুম। বাবা আমায় বিয়ে দিলেন, গেলাম কর্তার কর্মস্থল বেনারস। তোরা তো আগেই জুড়ি বাঁধা, কিন্তু……।

পুরনো দিনের স্মৃতিটা উন্মোচন করে দিয়ে সবিতা দেবী কণিকার দিকে চোখ তুলে রইলেন। কণিকা দেবী তখন সাজাতে থাকেন অতীতের ঘটনাগুলো। দীর্ঘ কত বছরের ঘটনা। কিন্তু কত তাড়াতাড়ি সাজিয়ে ফেলতে থাকেন কণিকা দেবী। বড় দুঃখের অতীত, বড্ড স্মৃতিকে ঘা দিয়ে আট্কানো, বড্ড জমাট। কণিকা দেবীর মনে পড়ে—

কলেজ রি-ইউনিয়নে কমার্স বিভাগে নিমাই বাড়ুই এবং আর্টস বিভাগে কণিকা চক্রবর্তী বিজয়ী হলো। বিজয়ী দুজন মনের আনন্দে স্বাধীন দেশের নাগরিক বলে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে বালীগঞ্জের লেকে বিশাল দেবদারু গাছের নিচে বসতো ওরা। চলতো প্রেম-পাঠের গভীর তপস্যা। সারা দিনের রোদটা গাছটার উপর দিয়ে চলে যেত। পড়ন্ত বেলায় লাল সূর্যটা আকাশে আর লেকের জলে প্রতিবিম্ব হয়ে যখন দুটো সূর্য হোত, ওদের তখন চোখে পড়তো দুজনার অভিভাবকের তর্জন-গর্জনের চোখ। ওরা ঘরে ফিরতো। একদিন পড়ন্ত সূর্যটার দিকে তাকিয়ে নিমাই কণিকাকে ডাক দিয়ে বলেছিল—আমি কমার্সের ছাত্র। অত ইনিয়ে বিনিয়ে কি বলবো, সিধে কথা বলছি—আমি সূর্য, তুমি তার প্রতিবিম্ব। আজ থেকে তুমি আমার এবং আমি তোমার।

কণা মিষ্টি হেসে বলেছিলো—আর্টস-এ পড়ি বলে ঠাট্টা করছো? এক্ষেত্রে অতশত ভাষা কেউ বলে না। তোমার হিসেবি কথাই ঠিক আছে—আমি তোমার, তুমি আমার। তুই আজ থেকে বিসর্জন।

কোথা থেকে এক দুষ্ট ছেলে ঢিল ফেলেছিল। ঢেউ উঠলো। প্রতিবিম্বটা খণ্ড খণ্ড হয়ে নাচতে লাগলো। নিমাই ও কণিকার দৃষ্টি মজায় নিবদ্ধ ছিল। ঢেউ থামলে স্থির জলে পূর্বের অবস্থা স্পষ্ট হয়। নিমাই "হুঁ" বলে কণিকাকে ডেকে বলে—জানলে কণিকা— একটা শিক্ষা হোল। অনেক বিপদ আসবে। কিন্তু সে সব উতরাতে হোলে স্থির থাকতে হয়। ধৈর্যই হোল সিদ্ধিলাভের উপায়।

সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা। দুজনে উঠে পড়েছিল। পরীক্ষায় পাশের পর অন্যতম নিন্দুক এই সবিতাই বাহবা দিতে হেসে বলেছিল —মাইরী, তোরা ওভার বাউন্ডারী মেরে যা দেখালি সে কি বলি। লেকে তোরা পণ্ডশ্রম করিস নি, পণ্ডপ্রেম করেছিস আমিই বলবো।

উত্তরে নিমাই বলেছিল—এবার তাহলে পণ্ডপ্রেম উদ্ধারে লাগছি, শুভেচ্ছা দিস।

তারপর নিমাই নীড় রচনায় উঠে-পড়ে লেগে গেল। একটা চাকরি বাগিয়ে ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া নিয়ে ফেললো। চমক দিতে কণিকাকে ভাড়া বাসায় নিয়ে গেল। কিন্তু কণিকা আপত্তির কথা শুনিয়েছিলো। শ্বশুরবাড়ী না উঠে সে ঐখানে উঠে শান্তি পাবে না। নিমাই ক্যালেণ্ডারের ছবির মত দু বাহু ঊর্দ্ধে তুলে দেখায় তার পিতার ভুমিকাটা।—তুমি ভেবেছো এমনি করে দু বাহু ঊর্দ্ধে তুলে বাবা আমাদের বলবেন—"আয় বাবা নিমাই, ঘরে আয়।" সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া, "বাহবা, বা দুশ্চিন্তার অবসান।" "নিমাই রে, ওরে নি—মা—ই, কলিকাল বলেই বাবা সন্ন্যাসী হয়ে উধাও হয়ে যাসনি। এ কি কম কথা বাবা নিমাই, আয় বাবা আয় বক্ষে আয়।"

হাসি থামিয়ে কণিকা সেদিন ওর ঊর্দ্ধ বাহু নামিয়ে গম্ভীর হয়েছিল।

নিমাই বলেছিল—তোমার পিতা-মাতার কথাও কিছু অনুমান করো কণা।

কণিকা কণামাত্র আলোকপাত না করে নিমাইকে দেখছিল। নিমাই

বলেছিল—শোন তবে। তোমার পিতাঠাকুর খেয়ে দেয়ে একটু ঢেঁকুর তুলে মুখে পান পুরে 'আ' বললেন। উনি ধার্মিক লোক। সে আমি তাঁর ঘরে বিশ-বাইশটা ঠাকুরের মূর্তি আর ফটো দেখেই বুঝেছি। যা হোক, 'আ' মানে তখন তারপর 'রাম' জপেন কি না কে জানে! ধরো দুজনে উপস্থিত হলাম। আমাদের প্রস্তাব শুনে উনি তখন কি করবেন জানো? মুখ থেকে চিবোনো পান থুক করে ফেলে বলবেন —এ্যাঁ, রাম! রাম! এ কি বলিস রে কণা! একটা বাড়ুই এর বংশজাতকে বর করবি! সামনে থেকে দূর হ, দূর হ। এত লেখাপড়া শিখে এই মতিগতি তোর?"

কণা সেদিন নিমাই-এর কল্পনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে বলেছিল, বেশ তো ঘর ভাড়া করছো—বেশ করছো। চল দেখি বাবা-মায়ের কাছে। সত্যি কি ঘটে দেখে নিয়ে পরে ব্যবস্থা! কিন্তু কার বাপ-মায়ের কাছে আগে উপস্থিত হওয়া যায়?

* * *

আনমনা কণিকা দেবীকে সবিতা আস্তে ধাক্কা দিয়ে বলেন—কি রে, সেই থেকে কি ভাবছিস? কি বলতে চাস বল, ওদিকে আবার ট্রেনের কি হোল কে জানে?

ভাবনায় ছেদ পড়ে। কণিকা দেবী এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—এতগুলো বছর কি ভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারি নি। মনে হচ্ছে, এই সেদিনের।

—সে তো বটেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল বল না। সবিতা-দেবী তাড়া লাগায়।

কণিকা দেবী সবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—জানিস, ও একটা বাসা ভাড়া করেছিল। একটা আধুলী দিয়ে 'টস' করে। প্রথম কার বাপ-মায়ের কাছে গিয়ে আমাদের বিয়ের প্রস্তাব শোনাবো।

—তারপর?

—'টসে' আমার বাবার কাছেই প্রথম যাওয়া সাব্যস্ত হোল। গেলাম

দুজনে। বাবা সব শুনে মাথা গুজে রইলেন। মা বাবাকে না বুঝেই পাশ থেকে বললেন, 'শিক্ষায় দুজনে সমান, আজকাল তো…… ।'

বাবা মাকে ধমক দিলেন, 'তুমি থামো'। তারপর নিমাইকে বললেন —শোনো, মানুষ হিসেবে তোমার পরিচয় দেবার অনেক কিছু আছে, সে আমি মানি। শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি, মেদিনীপুরে জায়গা-জমি। আর আছে পানের বরজ গোটাকয়। সব ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্ন হোল, আমি নিজে খুশী হলেই তো যথেষ্ট হচ্ছে না নিমাই। আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে 'মেদিনী দ্বিধা' হলেও তো তোমাদের চার হাত মেলাতে পারবো না। এ ব্যাপারে আমি অসহায়, সবাইকে নিয়ে থাকতে গেলে…… ।

নিমাই কিছু না বলে পকেট থেকে ওর ঠিকানা লেখা কাগজটা বাবার হাতে দিয়ে বলেছিল,—ঠিকানা রইলো। পালিয়ে কণা ও আমি বিয়ে করছি না, তবে একত্র বসবাসে অঙ্গীকার বদ্ধ। আমরা আসি।

—ও মা তাই নাকি ! তারপর ?

—হ্যাঁ সবিতা। চলে এলাম। গেলাম ওর বাবা মায়ের কাছে। তিনিও প্রথমটা খুশী। কিন্তু জানিস: তিনিও আমার বাবা-মায়ের মতই অসহায়। সেই আত্মীয়-স্বজনের ভয়। তবে বলার ধরণটা একটু অন্য রকম ছিল। ভারী সুন্দর কাব্যিক। ওর নাম ধরে ডেকে বললেন, "নিমাই, কি দুর্ভাগ্য দেখো। বৌমার নাম কণা, কিন্তু কণাটুকুর স্থান ঘরে নেই। তুমি তো জানো, পান চাষ করি। সারা জীবন কেটে যাচ্ছে। ও গাছে কোনদিন ফুল ফোটে না। কি আছে যে দেব, বৌমার প্রণাম নেবো ? জানো তো বাবা, সমাজ বলো, ভগবান বলো, কণার প্রণাম নেবার মত পা নয় আমার। আমার আর কিছু বলার নেই। যা ভালো বুঝবে করবে, আশীর্বাদ রইলো।"

—জানিস সবিতা, আমি আর নিমাই শ্বশুর মহাশয়ের কান্নায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কেঁদে ফেলেছিলাম। শাশুড়ি এসে

চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছিলেন। প্রণাম করে চলে এলাম। কণিকা-দেবী ফুপিয়ে কেঁদে ফেললেন।

—কাঁদিস না কণা, দ্যাখনা, আমার চোখেও জল এসে পড়েছে।

—কাঁদার কি শেষ আছে রে; না শেষ দেখলি। দুজনে তো এলাম, নূতন সংসার পাতলাম, শাশুড়ির শেষ কথাটি মনে প্রাণে স্থান দিয়ে—"তোমার শ্বশুর আশীর্বাদ করেছেন, "ভগবান তোমাদের জয়ী করবেন।"

—তোর শাশুড়ি চমৎকার কায়দায় মত দিয়েছেন। শাঁখা-সিঁদুর দিলেন না? চেয়েছিলি?

—সবে বলেছি—মা, শাঁখা-সিঁদুরটুকু দিয়ে আশীর্বাদ করুন··· নিমাই শাশুড়িকে অর্থাৎ ওর মাকে বলল—না মা, ওসব পরে হবে, আমরা আসি। রাস্তায় এসে আমাকে বলল—দেখলে! বুঝলে কিছু? বাবা-মায়ের মত নিঃস্বার্থ ভালবাসা কেউ বাসে না। তারা সন্তানকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে। দেখলে—বাবা-মা আজ তুই বলতে ভুলে গ্যাছে। "তুমি! তুমি। তুমি নিমাই তো জানো······ আশ্চর্য!"

—আমি বললাম—তাতে হয়েছে কি? আচ্ছা তুই-ই বল সবিতা, প্রেম-ভালবাসা যেখানে গভীর সেখানে না হয় 'তুই' সম্বোধন। কিন্তু নিমাইকে আমি তুই বলতে পারি? হয়তো দু'জনকে একত্রে দেখে শ্বশুর-শাশুড়ি ছেলেকে 'তুমি'ই বলে বলেছে। এতে রাগের কি আছে বল? মাঝখানে বিশ্রী বিদঘুটে কারণে আমার শাঁখা-সিঁদুরটা পরা হোল না। ভালবাসার এ এক বিচিত্র রূপ। অন্তরে যাই থাক বাইরে প্রকাশ করি কি করে?

—সে না হয় হোল, তুই নিজেও তো অন্তত সিঁদুরটা পরলে পারিস। নিমাইবাবুর তাতে কি আপত্তি থাকতে পারে?

—ওরে সর্বনাশ! শুনবি তবে? কি যুদ্ধ ঘোষণাই করল। পদবী নিয়ে যুদ্ধ। "যোদ্ধার মত আজীবন লড়বে। সমাজকে বাধ্য করবে, নামের শেষে পদবী লেখা চলবে না। লিখতে হয় স্যার টাইটুকু

অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান সেটাই নামের শেষে লিখবে।” প্রবণতার মাথা ঘুরুক। ওর যুক্তি হোল, “পদবী লেখার প্রবণতায় সমাজে ফাটল সৃষ্টি করছে; এই কি সমাজবদ্ধ মানুষের সমাজে সবাইকে ধরে রাখার রূপ! প্রেম-ভালবাসাকে পুষ্প মনে করে পুজোয় না লাগিয়ে বলে বিষ্ঠা—বর্জনীয়।” ওর এক কথা, “সমাজে দাঁড়িয়ে বিয়ে দিতে বাপ-মাই যখন পারলো না—ভয় পেল, তখন শাঁখা-সিঁদুরের কাছে ধর্ণা কেন? কোনো দরকার নেই।”

সব শুনে সবিতা দেবী বলে ওঠেন—কণা, যুক্তির কাছে কুটিল সমাজ মাথা নোয়াতে পারে, কিন্তু বিষধর সাপ যদি ফোঁস করে মাথা তুলে কামড় দেয়, সেটা ঠ্যাকাবি কি করে? ঘর বেঁধেছিস্, ঘর বাঁধলে যে……।

—হ্যাঁ বুঝলাম। কিন্তু, কিন্তুটাকেই দাঁড় করাচ্ছি। ছেলে বুঝলি, ছেলে। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ে। বর্দ্ধমান হয়ে দেখা করতে যাচ্ছি। ট্রেনে বিভ্রাট। তোর সঙ্গে দেখা হোল। ছেলে মাধ্যমিক দেবে, মিশনের ফাস্ট বয়।

—কণা, তোর সান্ত্বনার সামগ্রীকে দাঁড় করিয়ে আর কিছু ভাবিস? যা বলতে চেয়ে আমাকে থামালি সে হোল বৈধ-অবৈধের ব্যাপার রে। ঐ জন্যই শাঁখা-সিঁদুর……।

—থাম সবিতা, থাম। তুই শিক্ষিতা। স্বামী তোর বেনারস ইউনিভার্সিটির লেকচারার। তোরাই বল, জীবন-যাপনের অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়ে আমরা একটা সঠিক ঠিকানায় তো আছি। আমাদের ফসলকে তো আমরা অস্বীকার করিনি। বৈধ-অবৈধ প্রশ্নের আর কি কষাঘাত? সমাজ বলিস? সে কবে থেকে রে? প্রথমটা তার কি রে সবিতা? সমাজ চলবে শিক্ষায়-দীক্ষায়। নইলে তো কুকুর বেড়ালের সমাজ! তাহলে বল, উন্নত মনাতে—উন্নত মনাতে, মানসিকতায়, ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ উদার দৃষ্টি নিয়ে জোড়—সেটাই কি বৈধতার চূড়ান্ত নিদর্শন নয়? ক্ষতি কোথায়! কার বা ক্ষতি? তবে হ্যাঁ, ধর্ম

নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলতে পারিস। জোড় বাঁধার ব্যাপারে ভালোবাসার স্বধর্ম রক্ষা করলে মানুষের সৃষ্ট ধর্মটার অবমাননা করা হয় না বলেই আমার বিশ্বাস। সে আমরা···ভুল করিনি। তেমনি ছেলেকে জন্ম দিয়েও ভুল করিনি।

—সাবাস কণা! তোদের ব্যাপারটা যুক্তি-তর্কে-আইনে তুচ্ছ করা দুঃসাধ্য। তবু বলি রে—স্বামী-স্ত্রী। পরিচয় বোঝাতে সমাজ দেখবে শাখা-সিঁদুর। আমাকে ভুল বুঝিস না কণা।

—না রে সবিতা, না। শাঁখা-সিঁদুরের ভ্যালু আছে। তা নিয়ে মাঝে মাঝে ভাবিও।

—তাহলে কণা আমার একটা কথা রাখ। আমার রিকোয়েস্ট। আজকাল বৌ-রা যা করে, তুই সিঁথিতে একটুখানি সিঁদুর দিস।

—বেশ, দেব। তুই আমার বন্ধু। তোর স্বীকৃতিই শিরধার্য। তবু তোকে একটা মনের কথা বলে রাখি। লেকের জলে লাল সূর্য-টাকে এককালে আমরা 'গার্জেনের' চোখ ভাবতাম। একদিন ও বলল, 'সেই সূর্যটা এখন আমি।' তোকে বলছি সবিতা, ও লাল সূর্যের মতো আমার কপাল জুড়ে আছে।

—বাব্বা, ভাব-ভালবাসায় অভিন্ন চূড়ান্ত চিহ্ন। তোদের সংসার দেখলে হিংসে হবে রে কণা!

—কতকাল হিংসে করবি। চিরকালের ব্যবস্থা নিবি তো বল নিমাইকে বলি। প্রেমাবতার নিমাই।

—না বাবা, অমন ভেবে বলি নি। অন্যের সুখ দেখলে কার না হিংসে হয় বল? তাই······।

—সবিতা, একটা কথা রাখবি?

—কি কথা বল। তোর কথা রাখতে অপারগ এ ভাবতেই পারি না। তবে বলে রাখছি—লজ্জা দিস না কিন্তু। তোর যা অভ্যেস।

কণা ঘনিষ্ঠ হতে কাছে গিয়ে সবিতার হাত ধরে বলে—সবিতা, আমার ছেলের সঙ্গে তোর মেয়ের বিয়ে দিবি? দেখ, নিজের বিয়ের

কোনই স্বাদ পেলাম না। কিছুই না, কিছুই না। তুই যদি দয়া করিস……।

—বলেছি না। তুই লজ্জা দিতেই ভালবাসিস। এ কি বিপদে ফেললি বলতো? আমার একার মতে তো……।

—অশ্চর্য!

—কি আশ্চর্য রে কণা?

—আমি তোর কর্তার দিকটা না ভেবেই আবেগে কি সব বলে ফেলেছি।

—তোর দোষ নেই কণা। সতী সাধ্বীরা নিজের কর্তার কথাই ভাবে। ঐ দেখ উনি আসছেন।

প্রফেসর ভবেশ গাঙ্গুলী, সংক্ষেপে ভি. জি.—যা আবার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভি-কে ভেরি, জি-কে গুড় বানিয়ে ভেরি-গুড়-বাবু বলে আড়ালে ডাকে, উনি এসে লেডিজ ওয়েটিং রুমের সামনে দাঁড়ান। ভেতরে না ঢুকে মেয়েকে বলেন—যা মণিকা, তোর মাকে এ দিকে একটু আসতে বল। সবিতা দেবী এগিয়ে গেলে গাঙ্গুলীবাবু বলেন—তুমি শুনেছো! এই মাত্র মাইকে ঘোষণা হোল—কর্ড লাইন মুক্ত। উল্টে পড়া মাল গাড়ী সরিয়েছে। খোঁজ-খবর নিতে যাচ্ছি—মণিকা রইলো। মেইন লাইনটা……। গাঙ্গুলীবাবু চলে যেতে যেতে শোনেন, স্ত্রীর কথা, কিন্তু দাঁড়ান না।

সবিতা বলে—শোনো, গিয়ে কি করবে? যারা কর্ড মুক্ত করেছে মেইনও তারাই মুক্ত করতে লেগে পড়েছে। ফিরে গিয়ে সবিতা দেবী বলেন—সরি কণা। স্বামীর সঙ্গে তোকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিতে পারলাম না। বড্ড ব্যস্ত। লাইনের খোঁজখবরে ছুটলেন।

—ঠিক আছে রে, ঠিক আছে। ঠিকানা তো রইলো। যেতে আর আপত্তি কোথায়। বার্দ্ধক্যেই কি লোকে শুধু বেনারস যায়? আগেও যায় প্রয়োজন থাকলেই। তোর কর্তা কি বলে গেলেন, লাইন-টাইন চালু হোল?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কর্ড'লাইন নাকি মুক্ত হয়েছে। মাইকে বলেছে। খেয়াল করিনি। তুই দাঁড়া। গোছগাছটা সারি। বাকীটা……।

মেয়ে কণিকা বারবার ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করে—উনি কে মা, বল না উনি আমার কেউ হন?

কণিকা দেবী আপন ভাবনায় তখন সেখানেই দাঁড়িয়ে। সবিতা গোছগাছে ব্যস্ত অবস্থায় বলেন—কে হবে! উনি তোর……তোর জলের বোতলে জল কোথায় মণি?

—বাবা এনে দেবে। উনি কে, বললে না তো মা?

—পরে বলছি—উঃ তোর বর-বৌ আর একগাদা খেলনা সামলাতে পারি না বাবা। এতগুলো পুতুল?

মণিকা মুখ টিপে হাসে।

—দাঁড়া এখানে। সবিতা দেবী কণিকা দেবীর দিকে এগিয়ে এসে বলেন—ও মা, ফের কি চিন্তায় মগ্ন রে! আমার মেয়েকে একটু আদর করবি 'চ'।

—এখানে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি রে! আমি কে মণি কতবার জিজ্ঞেস করলো বলিসনি। যেতে গিয়েও একটু দাঁড়ালাম।

—ও হরি! নারী চরিত্র একেই বলে—কেন রে তুই ওর মা-মা-মাসী!

—ধ্যেৎ, বয়েই গ্যাছে মাসী হতে।

এই সময় প্রফেসর গাঙ্গুলীবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকেন—মণি, মণি! ও মা মণি?

সবিতাদেবী কণিকার হাত টেনে বলেন—চ', কি খবর এলো শুনবি।

ওদিকে মণিও দরজার কাছে গিয়েছে। সবিতাদেবী কণিকাকে দেখিয়ে বললেন—আমরা এক সঙ্গে এম এ. পাশ করেছি। বন্ধু, মিসেস কণিকা চক্র—না, না, মিসেস বাড়ুই। ওর কথা কিছু কিছু বলেছিলাম তোমাকে।

কণিকা দেবী সৌজন্যের হাসি দেখান। গাঙ্গুলীবাবু আপদমস্তক কণিকাকে দেখে নিয়ে বলেন—হুঁ, আপনি কর্ডের যাত্রী না মেইনের? দুটো লাইনই ক্লিয়ার হয়েছে।

সবিতা দেবী হেসে বলেন—কণিকা বর্দ্ধমান নামবে। কামারপুকুর ছেলেকে দেখতে যাচ্ছে। মাধ্যমিক দেবে এবার। কোন লাইনের গাড়ী প্রথম ছাড়ছে গো?

—মেইন।

মণিকা মধ্যিখানে বলে—বাবা, কত কথা বললে, কিন্তু ওনাকে ডাকলে না তো বাবা?

—তাই তো! মেয়ের নালিশ শুনে গাঙ্গুলীবাবু ধাক্কা খেয়ে লজ্জিত কণ্ঠে বলেন—বাপের বোন পিসি, মার বোন মাসী, তা কোনটা চাই তোর? তাই বলেই ডাকি!

—আমার দুটোই আছে। আমার বর পুতুলের মা নেই। মেয়ের মা তো আমার মা। ছেলের বাবা তো তুমি হবেই না। আমার শাশুড়ি চাই। এবার ডাকো। কি বলে ডাকবে ওনাকে, ডাকো?

গাঙ্গুলীবাবু হা, হা করে হেসে বলেন—কি পাকা মেয়েরে বাবা তুই! চল, চল ট্রেনে বসে ঠিক হবে। চলুন কণিকা দেবী। সহ-যাত্রিনী তো হোন; তারপর মেয়ের শাশুড়ি, বাঃ বাঃ।

সবিতা দেবী চোরা চোখে কণিকাকে দেখে নেন। তেমনি ভাবে কণিকাও সবিতা দেবীকে দেখেন। অস্বস্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়েন গাঙ্গুলীবাবু। তিনি হঠাৎ ওঁদের দুজনের চোরা চাহনি দেখেও ফেলেন। অস্বস্তি অবস্থার চূড়ান্ত। আক্ ঢাক্ না করে গাঙ্গুলীবাবু বলেন—এতকাল প্রফেসারি করছি, কিন্তু অতীতের শুভদৃষ্টির কথা ভুলি নি। কি ব্যাপার তোমাদের?

কণিকা দেবী সবিতা দেবীকে ঠেলে দেন।

মণিকা দেখে ফেলে বলে ওঠে—কি মজা, তোমার কথায় শাশুড়ি মা মজা পেয়েছেন বাবা। মাকে............।

—'চুপ কর, পাকা মেয়ে।' সবিতা দেবী লজ্জায় পড়ে বলেন। কণিকা দেবীর অবস্থাও তেমনি। গাঙ্গুলীবাবুর অবস্থাও তথৈ-ব-চ।

ওদিকে মাইকে ঘোষণা হয়—মেইন লাইনে ট্রেন·······এক্সুনি···। মেইন-কর্ড একাকার এখন। একটাই পথ। সবাই ট্রেনের উদ্দেশে এগিয়ে চলতে থাকেন।

"ভাঙা মাটি রাঙা মন"

—দিলীপ মুখোপাধ্যায়

পর পর দুটো বছর গেল খরা। বাঁকুড়া জেলার খরার দাপট দুনিয়া জানে, কি জবালা এ খরার। কিন্তু অঘ্রাণ-পৌষে লক্ষ্মী মায়ের পা গজায়। ধান চাল পড়ে থাকে হেথায় হোথায়—বেহিসাবে। কিন্তু ক'টা বছর খরার দাপটে বড় চাষী গুলানও ঘাবড়ে গেল।

পৌষেও আফশোষ কম কিসের—ভাত কুথায় হ'রে গেছে। বাজরা খাও হে, বাজরা। চাল তো একেবারে সনা। গরীবগুল্যা আর ব্যাঁচবেক নাই। ইখানকার বড় লোক গুলার চিন্তা-ভাবনা আরও বেশী। চাষ-বাসেই তাদের আশা-ভরসা, বড় বড় সংসার, ধান না হ'লে বাঁচা বড় দায়। বাসু ঠাকুরের মত বড় লোকগুলার চিন্তা হ'য়ে গেছে দুটা ভাতের ল্যাগে। এই মুলুকটার বড় লোক ঐ বাসু ঠাকুর, উঠানে যার স্যারে স্যারে ধানের মরাই (গোলা)। আগের বছর ঝাঁটিপাহাড়ী থ্যাকে স্যারে স্যারে লরী-টেরাক অ্যাসে সব ধান গুল্যান গুটায়ে লিয়ে গেল—ঘর ফাঁকা করে, তখন কি আর কেউ ভ্যাবেছিল এমন মানুষ-মারা খরা হবেক। অজন্মার বছর। দেবতা কুথায় ছিল লুকায়ে—টোপাটি পড়ল নাই সময়ে। ধানের বীচ রয়ে গেল ঘরেই—মাটিতে আর মাড়াতে হল নাই। জলের জন্যি হা হুতাশ। মাটি কি "বাঁজা" থাকবেক? মাঠ-ঘাট ফুটি ফাটা। তবে দেবতা আসল অনেক দেরীতে। তখনকে চাষের দফারফা..........।

সনা সে বছরটাতে বড় চিন্তাতে প'ড়ে গেল। মনটা তার ক'কায় উঠতে লাগল। বহু সাধ করেছিল—ধার করে, দেনা করে, কর্জ করে, সনা জোত-জমিন বলদ জোড়া জোগাড় করে—চাষ করবেক ভ্যাবেছিল।

সনা চাষী বনবেক। আনন্দ হল সনা'র। সুখে আনন্দে নূতন চাষীর নূতন বউটার কথাটাই মনে পড়ছিল।

মনে মনে ভ্যাবছিল বুড়া বাপটা সারা জীবনটাই পরের দুয়ারে মুনিসের কাজ ক্যরে কাটাইছিল। তার মা-টা সারা জীবন ধরে শুধু কষ্ট করেই গেল। তখন কত ছোট ছিল সনা আর বিমলি। বিমলিটা দুয়ারে বসে বসে তাকাই থাকত কখন মা-টা ফিরে আসবেক কাজ স্যারে। বাপ্-মাটা তখন সনা-বিমলিকে ভুলে গিয়ে বাসু ঠাকুরের হিড়ের কাদায় কচি কচি ধানের গাছ লাগার কাজে ম্যাতে থাকত, তখন ঘরের কচি কচি দুধের ছ্যালা দুটাকে শুকায় শুকায় মারছে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে শুয়ে মাড়ের (ফেন) বাটিটা চাটতে চাটতে বিমলিটা কখন য্যাত ঘুমায়ে। ছোট্ট সনা হাপুস নেয়নে চ্যায়ে দেখত, আঁহ-চাঁহ করত পেরানটা ভুখের জ্বালায়। হাঁড়ির তলানিতে পড়ে থাকা জলটাই চুক্ চুক্ করে খ্যাত সনা বিমলি দুধ মনে করে।

আজকে বার বার সনার মনে পড়ছে দুখের দিন গুলা। বাপটা জীবনভর পরের দুয়ারে খ্যাটে মরল, নিজের বলে কিছুই জানল নাই। যে দু-চার বিঘা ছিল, তাই ঠিকে দিয়ে বিমলির বিয়া দিয়ে দিল ছেছনপুরের গদাই ওঝার বেটার সাথে। বিমলির কপালটা ভালই বলতে হবেক। সনার দু'চোখ দিয়ে আনন্দে জল আসে গেল, বরকে দেখে। হাড় মটা বর। লাল চিক্‌চিকা শাড়ীতে চন্দনের টোপাতে গয়না গায়ে যখন বিমলি কপালে সিঁদুর পড়ল, বিমলি চলে গেল বরের সাথে শ্বশুর ঘরে লাউদুহার ঘাট পেরায়ে—ডাঙার বনের ভিতর দিয়ে, শাল পলাশ আর মহুল বনের ফাঁকে ফাঁকে।

আপন মনেই মনে পড়ছিল—সনার পিছন পারের দিন গুলা। বাপটা আজ সগ্গে গেছে। মা-টাও যাই যাই করছে। বাপ সনার বিয়া দিয়ে গেছে একটা গরীব ঘরের ম্যাইয়ার সাথে। সনার মনে পড়ে যখন কমলি আসল নতুন বৌ হয়ে তার ঘরে। গরীব হলেও কমলিকে কোন দিন দুঃখ দিত নাই। বিয়ার রেতে কমলিকে নতুন

বেনারসীর মোড়কে কুন্তলীন তেলের সুবাসে চনমনা লাগছিল। খুব আনন্দ ল্যাগেছিল সনার, নিজের মনেই সে দিন সে ভ্যাবেছিল কমলির কাঁচা যৈবনটা বাবুদের ক্ষেতে খামারে খাটতে সে দিবেক নাই। রোদে জলে কালি মোম কিছুতেই হ'তে দিবেক নাই। গলাদের (মনিবদের) গিন্নি গুল্যার মত কমলিও ঘরের বউ হয়ে ঘরেই থাকবেক। এক দিষ্টি কমলির দিকে তাকাই ছিল। লজ্জায় কমলির মুখ লাল হ'য়ে গেল। সনা ভ্যাবেছিল কমলির উঁচু উঁচু আপেল ফলের মত রাঙা গাল দুটা টিপে দিবেক কিন্তু পারে নাই সরমে। সনাতন কমলির কাঁচের চুড়ি ভরতি গোল গোল পেলব হাতটা হাতে নিয়ে বলেছিল—"কমলি তুই ভয় করিস্ না, ভরসা করবি—তোকে আমি সুখী করবই"।

কমলি বলেছিল, "তাই হবেক গো, তুমি ছাড়া আর কে করবেক্ গো। তুমি যে আমার পরানের পতি।"

চৈত পরব পেরাই গেল। বোশাখ গেল। জষ্ঠি আসল। বাঁকুড়ায় গা জ্বলা গরম। জল নাই খালে, বিলে, পুকুর শুকায় কাঠ। মানুষ গুলাও শুকনা সন সনা—যেমন কেন্দ কাঠ কালির বরণ। ভাত নাই, মাড় নাই, লঙ্গরখানার লাইনে গমঘাটার কাড়াকাড়ি। গ্যালে হাত দিয়ে তাই ভাবছে সনার মা। আক্কার বাজার। মারগের দিন দুনিয়ায় হাহাকার। আর সনা করব্যেক চাষ! চাষের জগার কুথায়? সনার শ্বশুর গরীব বটে, তবু বড় মুখ করে—বড় ঠাকুরের কাছে সেদিন ব'লে গেল, "আমি ত আছি বিহান, সনাতন তুমার ছ্যালা বটে, আমাকেও তো দেখতে হবেক বিটি দিয়েছি।" সনার মা আরও ভাবে—একদিন এই হাড়ে মাংস ছিল, গতর ছিল, তাই কদর ছিল বাবুদের বাড়ীতে। কাজ কর'তে আগে ড্যাকত তাকে। এখন তো আর সে রামও নাই, আর অযোধ্যাও নাই, দিন ফুরাইছে। পার্টির লোকরা সবাইকে চালাক ক'রে দিয়েছে শিখাই পড়াই। তারা আবার রেতের ইস্কুলে বই পড়ায়, লেখতে শিখায়—তারা এখন আর 'টিপ' মারতে দিবেক নাই বলেছে। আগের দিনে কিন্তুক এমন হুতে নাই। তখন জুলাই

ফুসলাই ভোটটা লিয়ে বাবুদের আর পাত্তা পাওয়া য্যাত নাই। ২ টাকা আর ২ সের গমে বিকায় য্যাত আমাদের গরীব গুলান আর বাবু গুলানের বাড়ত ফুর্তি। গরীব গুলান গতর দিয়ে সনা ফলাই দিত—ডাঙা মাটিতে সেটা কারু মনে থাকত নাই। ভুখা মানুষ গুলান শুখা মাটিতে রক্ত ঝরায়ে সনা ফলাত, কিন্তুক বাবু বড়লোক গুলানের মন কি রাঙায় দিতে প্যারেছিল? পারে নাই আর পারব্যেক নাই, কন দিন—এই আমি বলে গেলাম, তোরা দেকে লিবি। তবে আজ আমার সনারা কি ক'রে বড় হবেক, চাষী হবেক—যার পরবার নাই, প্যাটে ভাত নাই। তবে বড় হবার মনের জোর তো আছে।

সনার মা আরও বলে—এখন তবে যুগ পালটাইছে। বাবুদের বেগার খাটার যুগ ঘুচেছে। তাদের যুগের মনিবদের গলামি এ যুগের সনারা আর কাঁহাতক সইবেক? তাই তারা এখন নুতন করে সব কিছু করবেক ঠিক করেছে। থাকুক সনার বাছারা সুখে শান্তিতে। সনা ফলুক ডাঙা মাটিতে—রাঙা হোক সনার বরণ মাণিক চাঁদে, সনা বাছাদের ঘরগুলা।

জৈষ্ঠের চারা ফেলা হল মাঠে মাঠে। প্রধান বাবুর দয়ায়। বি ডি. ও. অফিস থেকে সনা পেল হাওলত। সার, বীজ, হাল আর কিনলেক বলদ জোড়া। আনন্দে টই-টম্বুর সনা। কমলি বউ-এর মুখে ফুটল হাসির ঝিলিক, যেন রেতের পরে পুব দিকে উঁকি মারেন সুয্যি ঠাকুর—নুক নুকানি খেলার মত।

খরা কাটল। দেবতা নামল ঝরঝরিয়ে। মাঠ ঘাট ভরাই দিলেক। জলে জলাক্কার। জলে থৈ থৈ। হাল জুয়াল হাতে কাজে গেল সনা। সে চাষী হবেক। চাষ ক্যরবেক। সবুজে সবুজে ভরে যাবেক মাঠ আর মাঠ।

ডাঙা জমি গুল্যান ভরে উঠল সবুজে সবুজে। সনার কমলি, 'কমলা'র মত আটকে পড়ল সনার ঘরে। উঠানে পাতা হল লক্ষ্মীর

বেশী। ফসল ফলল। ধান উঠল। সনার বৌয়ের হাসি ফুটল। সনা কথা র‍্যাখেছে।

…………কুপিটার আলোটা দপ্ ক'রে নিবে গেল। সনার বউ লজ্জায় সরে গিয়ে বলল, "তুমি চাষী বটে হে, ডাঙা জমিতেও ধান ফলালে বটে। তুমি সত্যিকারের চাষী বটে। বাহাদুর চাষী।" তবে একটা কথা—ক্যাল একটু সময় ক'রে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে য্যাতে হবেক কিন্তু, নইলে তুমার ফলনটা কমে যাবেক। মনে হয় "রাঙা বাবু" আসছে আমাদের ঘরে।

সনা হঠাৎ চমকায় উঠে বল্লেক, "ইখানটা ডাঙা হলেও আমাদের মনগুলা কিন্তুক রাঙা হয়ে গেছে কমলি। মাটি ডাঙা (উঁচু) হলে কি হবেক, মনগুলা যে মাটির রঙে রাঙা।"

———

হৃদয়ের দাগ

—রীণা দে

ভালোবাসা পাওয়া এক যন্ত্রণা। আর পেয়ে হারানো আর এক যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা দিন রাত কুরে কুরে খায় একটা সুস্থ সবল জীবনকে। তেমনি কুরে কুরে খেয়েছিল দেবুদাকে। দেবুদার নিস্তব্ধ নীরব মুখোচ্ছবি, বেদনার্ত অন্তর অনুভব করে দীপু জিজ্ঞাসা করেছিল দেবুদা, তোমার কি হয়েছে ? সত্যি করে বলো না ?

দীপু দেবুদার ছোট বোনের মতো এবং ওদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো অমলিন। দীপুর প্রশ্নে দেবুদা কিছুটা বিব্রত। হৃদয়ের ক্ষত কে আর খুলে দেখাতে চায় ? কিন্তু অন্তর্বেদনা গুমরে গুমরে কাঁদে যে ! বহিঃপ্রকাশের পথ খোঁজে, ক্ষণিক উপসম কামনা করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবুদার মুখ থেকে গোপন প্রেমের করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসে…………

দিদির বিয়ের বৌভাতে গিয়ে মিঠুর সঙ্গে প্রথম আলাপ। নজর কাড়া সুন্দরী নয়, তবে শরীরে একটা আলগা চটক আছে। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল। গলার স্বরটা একটু ফ্যাসফেসে ধরণের। টনসিল অপারেশনের ফল। তবুও মিঠুকে দেবুর ভালো লেগে গেল। সপ্তদশ বর্ষীয়া তরুণীর তরতাজা তনু সুষমা, সাজের বাহার, সেন্টের মিষ্টি গন্ধ, যুবক দেবুর মন বিহ্বল হয়ে পড়ল। যৌবনের ধর্ম এই। লম্বা সুপুরুষ ফর্সা দেবুর চেহারা দেখে নিমিষেই মিঠুর মনও আকৃষ্ট হল।

সে আকর্ষণ আরও বর্ধিত হল যখন মিঠু জানল দেবু বি.এস.সি. পাশ এবং চাকরির চেষ্টা করছে। আজ না হোক দুদিন পরে চাকরি

হবেই। অতএব প্রেমের স্বাভাবিক নিয়মে দুটি নর-নারী একে অপরের দিকে ধাবিত হয়। সেন্টুর হাতে পাঠানো গোপন প্রেমপত্র পেয়ে মিঠু দরজার অন্তরালে চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত করে সযতনে বক্ষের মোলায়েম শয্যায় রাখে। তারপর খাতার পাতায় মনের আবেগে লিখে চলে সুপ্ত বাসনার কাব্যময় চিত্র। হাতে হাত রেখে তারা দুজনে হারিয়ে যাবে সবুজ বনানীর মাঝে। কিংবা বর্ষাভেজা দিনে মাটির সোদা গন্ধ শুকে শুয়ে শুয়ে করবে অনেক ছেলে মানুষী, খেলবে কত লুকোচুরি খেলা। হারিয়ে যেতে দেবে না যৌবনের এই রঙিন স্বপ্নের দিনগুলিকে। মিঠুর চিঠি পেয়ে দেবুও মনের ক্যানভাসে ছবি আঁকে, চাঁদের আলোয় খোলা ছাদের উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসে মিঠুর হাতে হাত রেখে রচনা করবে অমর প্রেমের কাব্য। অনুকূল বাতাস পেয়ে উভয়ের প্রেমের তরণী ভেসে চলল দিক থেকে দিগন্তে। কোথা দিয়ে তিনটে বছর অতিক্রম করে গেল দুজনের খেয়াল ছিল না। প্রথম ধরা পড়ল মিঠুর বাবা-মায়ের কাছে। এবার তাঁরা মেয়েকে বিয়ে দিতে চান। পাত্র অন্বেষণ চলে। মিঠু জানায় তার পাত্র ঠিক হয়ে আছে, অন্য কোথাও সে বিয়ে করতে পারবে না। মিঠুর বাবা-মা যখন জানলেন দেবু বেকার, তখন বোঝাতে লাগলেন। "মিঠু ভুল করিস না, বেকারের সাথে প্রেম করা গেলেও ঘর বাঁধা যায় না।" কিন্তু মিঠু সিদ্ধান্তে অটল, সে তার প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করতে চায়। দেবুকে চিঠি লিখে বাড়ির পরিস্থিতির কথা জানায়। সেই সঙ্গে দেবুকে আশ্বস্ত করে—"আমাদের এই ভালোবাসা কোন দিন কেউ ভেঙে দিতে পারবে না। যতদিন আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন থাকবে আমাদের এই মধুর প্রেমের নিবিড় সম্পর্ক। তুমি নিশ্চিত থেকো দেবু, আমার ভালোবাসার মালা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না তোমার গলা থেকে। আমার মন-প্রাণ, জীবন-যৌবনের একমাত্র অধিকারী তুমি ভিন্ন আর কেউ নয়।"

সেদিন মিঠু সত্যিই দেবুকে ভালো বেসেছিল এবং ঘর বাঁধার আকুল

বাসনা তার মনে ছিল। কিন্তু বাদ সাধল দেবুর বেকারত্ব। দেবু একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগল। হলেও বা বি.এস.সি. পাশ—আজ চাকরির ভাঁড়ার যে শূন্য। এদিকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে টাইপ শিখে কাকার তদ্বিরে মিঠুর ভাগ্যাকাশে হল নব সূর্যোদয়। একটা মাঝারি মাইনের চাকরি জুটে গেল। প্রথমে মিঠু ভেবেছিল—ভালোই হল, স্বামীর উপার্জনে যদি স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন, দাম্পত্য জীবন চলতে পারে, তবে স্ত্রীর উপার্জনে স্বামীর ভরণ পোষণ, বিবাহিত জীবন নির্বাহ হবে না কেন? কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই মিঠুর মনের পরিবর্তন হতে শুরু করল। বেকার প্রেমিক দেবুর প্রতি আর সে আগের মতো টান অনুভব করে না। বরং মনে হয় বড় ভুল হয়ে গেছে। নিজের প্রতি তার ধিক্কার জাগে। এখন দেবুদের কাঁচা মাটির ঘরে গিয়ে বাস করবার কথা ভাবতেও পারে না। অথচ দু'বছর আগে এই কাঁচা ঘরই ছিল তার কল্পনায় গড়া রাজ-প্রাসাদ। এখন সে প্রাসাদ এক ঘূর্ণিঝড়ে একেবারে ধূলিসাৎ। মিঠুর দিক থেকে বেশ কিছুদিন আগেই চিঠিপত্র দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। দেবু প্রথমে তাকে কয়েকখানা চিঠি দিয়ে তার জবাব না পেয়ে কণিকার হাত দিয়ে প্রাণের আর্তি জানিয়ে মিঠুকে চিঠি দিল। কিন্তু এবারেও কোন জবাব এলো না। কিছুদিন পরে কণিকাই সুসংবাদটা জানিয়ে গেল, মিঠুর বিয়ের দিন ধার্য হয়ে গেছে। মাস দুই আগে 'আশীর্বাদ' হয়ে গেছে দু'ভরি ওজনের হার দিয়ে। পাত্র ওদেরই অফিসকর্মী। লেখাপড়ায় এবং পদ মর্যাদায় মিঠুর সমকক্ষ নয়—এক ধাপ নিচে। জনশ্রুতি, অফিস কলিগদের সঙ্গে 'ট্যুরে' বেড়াতে গিয়ে ম্যাসাঞ্জোরে ড্যামের ও-ধারের জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে ওরা দুজনে বেশ কিছুক্ষণ হারিয়ে গিয়েছিল। যখন ওরা ফিরে এলো তখন অফিসের টাইপিষ্ট মীরা বৌদি মিঠুর মুখ চোখ দেখে বুঝে নিল মিঠুর কৌমার্য আজ এই বাঁধের পাড়ের জঙ্গলে বিধ্বস্ত, কলুষিত। কেউ যদি ইচ্ছা করে কিছু খোয়াতে চায় তাতে কার কি বলার আছে? না সরাসরি কেউ কিছু

বলেনি, কিন্তু গুঞ্জন উঠেছে। অফিসের বড়বাবু শান্তি চৌধুরী অধস্তন কর্মচারীকে ডেকে প্রশ্ন করতেই সে অপরাধ কবুল করেছে। শান্তিদার প্রচেষ্টায় ওদের বিয়ের তারিখ তরান্বিত হয়েছে। নইলে মিঠুর কপালে দুর্গতি ছিল।

'বলিহারি দিতে হয় মিঠুর রুচিকে, তার মুখ বদলের অভ্যাসকে। মনে পড়ে ওর দেওয়া শেষ চিঠিটার কথা। ওর বাবা-মা তখন ওকে অন্যত্র বিয়ে দেবার জন্য চাপ দিচ্ছেন। মিঠুও মরিয়া, দেবুকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। তার চিঠির ভাষায়—"দেবু তুমি আমার বুকের সব ভালোবাসা নিয়ো। অন্তর হতে মুছে দিয়ো না কখনও। এতদিনে পশ্চিমের মেঘটা পূবের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। শুরু হয়েছে ঝড়। প্রচণ্ড ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু। একমাত্র··· হিসাবে তোমাকে ধরেই আছি। এখনও উড়িয়ে নিতে পারেনি হৃদয় থেকে তোমার আমার ভালোবাসা। অনেক ঝাপটা আঘাত আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। তবুও মনের খাতার পৃষ্ঠা থেকে তোমার নাম কেউ মুছে নিতে পারেনি, পারেনি তুলে নিতে একটিও গোপন শব্দ। আমার জীবনের সব কিছুই সংকল্প করে রেখেছি তোমার জন্য। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, যেন সহস্র ঝড়েও আমাদের খেলাঘর উড়িয়ে নিতে না পারে।"

দেবু যখন মিঠুর বিয়ের ছাপানো কার্ড পেল তখন বুকে যেন শেল বিদ্ধ হ'ল। এতদিনের সঞ্চিত মিঠুর দেওয়া চিঠিগুলো বুকে জড়িয়ে দিনের পর দিন কেঁদে বুক ভাসাল। একমাত্র দীপুকে জানানো ছাড়া আর কারো কাছে কোন অভিযোগ করল না। পরে জানা গেল তিনদিন পরে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে মিঠুর বিচ্ছেদ ভুলতে চির ঘুমের দেশে পাড়ি জমাতে চেয়েছিল সে। কিন্তু বাদ সাধলেন বিধাতা। সেই রাত্রেই পাশের বাড়ির কাকলির বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, ওরা ডাক্তারকে খবর দিয়েছিল। লোকজনের নিরন্তর পদচারণা এবং কথাবার্তায় দেবুর মায়ের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল অনেক আগেই। পাশের বাড়ির

বিপদে এখন দেবুর ঘুম ভাঙছে না কেন ? এমন তো হবার কথা নয়। কৌতূহল বশতঃ দেবুর ঘরে গিয়ে ডাকতেই ব্যাপারটা তাঁর নজরে এল, তিনি চিৎকারে বাড়ি মাৎ করলেন। যাইহোক যথাসময়ে ডাক্তারের প্রচেষ্টায় দেবুর প্রাণ রক্ষা হল।

ক'দিন বাদে মিঠুর বিয়ে। দেবু প্রথমে ভেবেছিল যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা রইল না। আর একবার মিঠুকে দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। ধার দেনা করে একটা ছোট্ট আংটি আর একগুচ্ছ গোলাপ মিঠুর হাতে দিয়ে দেবু মনে মনে আশীর্বাদ করল—"দীর্ঘজীবি হও, হও নব নায়কের গর্বিতা বেহুলা সম স্ত্রী। ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দাও কৃষ্ণকান্তের জীবন। আনন্দ ও পবিত্রতায় ভরিয়ে দাও কৃষ্ণকান্তের নতুন সংসার। ভুলে যাও পুরানো সব স্মৃতি।" মিঠু যখন দেবুর দিকে তাকাল তখন দেবু মনে মনে বলল—"দু'চোখ ভরে দেখে নাও তোমার দেবুকে, সে বিশ্বাস ঘাতক নয়। কত ভালোবাসে তোমায়, আজো তুমি তার আপনজন, স্নেহের পাত্রী।" বলতে বলতে দেবুর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। আর না দাঁড়িয়ে সে বিদায় নিল।

* * *

অনেকদিন দেবুদা কিংবা মিঠুর আর কোন খবর দীপু রাখেনি। কার্যোপলক্ষে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে। ইচ্ছা হতে একবার সে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গেল। মায়ের পুজো দিয়ে মন্দিরের সোপান বেয়ে নিচে নামতেই তার দৃষ্টিগোচর হল, কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছে এক নবীন ব্রহ্মচারী। চুল দাঁড়ি গোঁফের অন্তরালে আসল চেহারাটা লুপ্ত প্রায়। একটি শিশুর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে তার মুখে এক অনাবিল হাসি লক্ষ্য করে দীপু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

—আরে দীপু না ?

দীপু বিস্মিত স্বরে জবাব দিল—আরে দেবুদা ! এ কি তোমার বেশ ! এটি কে ? তোমার ছেলে নিশ্চয়ই ?

বিষন্ন হাসি হেসে দেবু উত্তর দিল—না রে এটি আমার ভাগ্নে--মানে মিঠুর ছেলে, ওরা দুজনে বেড়াতে এসেছে, মন্দিরে পূজা দিতে গেছে। আমি এখন মিঠুর দাদা তো… …দেবুর মুখে অনাবিল হাসি।

—দেবুদা, ভগবান তোমায় কি ধাতু দিয়ে তৈরী করেছেন? তোমায় গড় করি! যাক: কেমন আছ? মাসীমা কেমন আছেন? এখন কি করছ-টরছ?

—ভালো, মা চারবছর গত হয়েছেন। এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। রামকৃষ্ণ মিশনে মাস্টারী পেয়েছি, বেলুড়ে আছি। বাড়ির আমার অংশটা অনাথ আশ্রমকে দান করে দিয়েছি।

— তাহলে সংসারের আশা ছেড়ে ছুড়ে এখন পুরোপুরি সন্ন্যাস জীবন?

—হ্যাঁ, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা … … মন আর কিছু চাইল না।

এই সময় দীপু অদূরে মিঠু আর তার স্বামীকে আসতে দেখল। ওর স্বামীর বেঢপ চেহারা মিঠুর পাশে বড়ই বেমানান। দেবুদার দেব-তুল্য চেহারার তুলনা চলেই না। মিঠু কি দেখে যে ভুলেছিল সেই-ই জানে!

মিঠুর হঠকারিতায় দেবুর জীবনের পথ পরিবর্তন সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা যতই প্রসংসা করুক দীপু যেন দেখতে পায় দেবুদার হৃদয় তলে অবিরাম শোণিত ক্ষরণ—অব্যক্ত ব্যথার জমাট অশ্রু। মিঠুর 'হীরে ফেলে কাচে গেরো' দেওয়াকে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

এই বিশ্বসংসারে অনেক ঘটনাই প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে—যার হিসাব কেউ রাখে না। মনে হয় পৃথিবীতে সুখী ব্যক্তির চাইতে দুঃখীর সংখ্যাই অধিক। দুঃখ না থাকলে সুখকে কে চিনত?

কেদার

—হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষ শাস্ত্রী

শান্তশিষ্ট প্রভুভক্ত কেদার। বয়স কম হলেও অতিশয় বুদ্ধিমান। আকর্ষণীয় চেহারার মধ্যে তেজস্বীভাব পরিস্ফুট। সর্বদা প্রচেষ্টা সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলার। কিন্তু গৃহকর্তা মন্মথনাথ সমাদ্দারের মন-মেজাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলা দুস্কর। কর্তাব বকুনি তো আছেই, মাঝে মধ্যে চাবুকের প্রহারও হজম করতে হয়। এ সব তার সহ্য হয়ে গেছে। তবে কষ্ট হয় তখনই যখন কর্তাবাবু রাজু আর পটলাকে শাস্তি দেন, আহার বন্ধ করে প্রহার দিয়ে ঘরে আটকে রাখেন। পড়াশুনায় গাফিলতি কিম্বা বদমাইশীর ফল। ওদের চোখের জলের সঙ্গে কেদারের চোখেও জল ঝরে। ও যে রাজু পটলার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ সময় কর্তার মনের ভাব বুঝে নিয়ে তাঁকে খুশি করতে তৎপর হয়। সদর দরজা খোলা থাকলে তা বন্ধ করে দেয়। হিসাবের খাতা খানা এগিয়ে দেয়। কিম্বা পাড়ার মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট-দেশালাই এনে দেয়। এ সব কাজে সে বেশ পটু। তাছাড়া বাড়িতে কে এল, কে গেল, কেউ ফল-ফুলের গাছের ক্ষতি সাধন করল কি না এ সব দিকে কেদারের তীক্ষ্ন নজর। কর্তা তাই মাঝে মাঝে কেদারের প্রশংসায় পঞ্চমুখও।

সেবার ছোট নাতনির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এক সময় সোনার বালা জোড়া হারিয়ে গেল। অভ্যাগত ব্যক্তিদের সকলেই আত্মীয় অথবা বিশিষ্ট অতিথি। কাকে দায়ী করবেন? কর্তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলেও সম্মানের খাতিরে তাঁকে শান্ত থাকতে হচ্ছে। অবশেষে কেদারই এর সুষ্ঠ সমাধান করে দিল। পরের দিন বাড়ী প্রায়

ফাঁকা হয়ে গেছে। কর্তার মামাত ভাইয়ের শ্যালক ও তাঁর স্ত্রী বাড়ী যাবার জন্য বিদায় নিচ্ছেন। এই সময় কেদার এসে তার ধারালো দাঁত দিয়ে দামী শাড়ির আঁচল কামড়ে ধরল এবং কর্তা বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও সে ছেড়ে দিল না। প্রায় আধঘণ্টা পর বধূটি বালাজোড়া বাক্স থেকে বের করে দিতে তবেই পরিত্রাণ ঘটল। কেদারের গোয়েন্দা-গিরিতে সকলেই তাজ্জব বনে গেল। এই ঘটনায় শুধু রাজু-পটলার কাছেই নয়, কর্তার কাছেও কেদারের গুরুত্ব বেড়ে গেল। ফলে রাজু-পটলার মতো কেদারের উপরেও কর্তার স্নেহধারা বর্ষিত হতে লাগল। পাতের উচ্ছিষ্ট ভাত ডেকে খাওয়ান। মাঝে মধ্যে চাকরের সাহায্যে সাবান দিয়ে তাকে চান করান।

কয়েক বছর পরের কথা। রাজু-পটলা এখন কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। সেদিন ছিল কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। পাড়াময় গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ক্রমাগত ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক—ব্যাঙেদের বিচিত্র ঐকতান। কিছুক্ষণ আগেই একটানা বৃষ্টির সাময়িক বিরতি ঘটেছে। আকাশে এখনও মেঘের ঘনঘটা। অদূরে কৃষ্ণচূড়া গাছের শাখায় শাখায় জোনাকির নিঃশব্দ বিচরণ। সমাদ্দার বাড়ীর সকলেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। শুধু একা কেদার জেগে সদর দরজার পাশে পাহাড়ায় রত। হঠাৎ কেদার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। দরজার বাইরে কারা যেন চুপি চুপি শলাপরামর্শ করছে। সে প্রস্তুত হয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল। একটু বাদেই তার দৃষ্টিগোচর হল, দরজার বাইরে প্রায় জনাবিশেক লোক—লোহার গেট কাটতে ব্যস্ত। ওদের হাতে তরোয়াল, খড়্গ, বন্দুক ইত্যাদি। কেদারের বুঝতে বাকী রইল না, ওরা ডাকাত। মনিবের ক্ষতিসাধন করতে সমবেত হয়েছে। এক দিকে দুশ্চিন্তা—অন্য দিকে আঘাত হানার প্রস্তুতি, কেদার চঞ্চল হয়ে উঠল। পাছে ওরা সোরগোলে পালিয়ে যায় এই আশঙ্কায় চিৎকার করে বাড়ীর কাউকে না জাগিয়ে সে নিজেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিল। লুকিয়ে পড়ল গেটের সংলগ্ন কামিনী ফুল গাছের

ঝোপের মধ্যে। একটু বাদে গেট কেটে তিনজন বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। এদের একজনের হাতে বন্দুক। অন্যদের হাতেও অস্ত্র। কেদার তাক করে লাফ দিল। বন্দুকধারীর ঘাড় কামড়ে মাংস তুলে নিতেই সে বন্দুক ফেলে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল। তৎক্ষণ্যাৎ কেদার বন্দুক মুখে তুলে নিকটবর্তী জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল। তারপর সুযোগ বুঝে চুপি চুপি এসে পুনরায় অক্রমণ করল দ্বিতীয় ডাকাতকে। নাক-মুখ সংলগ্ন অংশ থেকে এক খাবলা মাংস কামড়ে নিয়ে ছুট দিল অন্ধকারে। আহত ডাকাতরা যন্ত্রণায় চিৎকার করতেই বাইরের ডাকাতরা ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করল। ততক্ষণে বাড়ীর লোক-জন জেগে পড়েছে। পাড়া-পড়শীরাও এগিয়ে এসেছে। তৃতীয় দস্যুটি যখন গেটের বাইরে পালাবার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই কেদার তাকে আক্রমণ করে পেটের মাংস তুলে নিল। অতঃপর পুকুরের দিকে তাড়া করে নিয়ে গেল। সে প্রাণরক্ষার তাগিদে পুকুরে ঝাঁপ দিল। ফলে পাড়ার লোকেরা তাড়া করে তাকে ধরে ফেলল। আহত দুই ডাকাতও ইতিমধ্যে বাড়ীর লোকের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের চলার শক্তি ছিল না। একজন অন্ধ হয়ে গেছে।

রাত-ভোর হতেই থানার দারোগাবাবু এলেন। কেদার বুইচি বন থেকে মুখে করে বন্দুক এনে দারোগাবাবুর পায়ের কাছে রাখল। দারোগাবাবু তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল। উপস্থিত সকলেই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে কেদারকে দেখতে লাগল। দারোগাবাবু কেদারকে সদরে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু সমাদ্দারবাবু ও গিন্নীমা রাজী হলেন না। কেদার তাঁদের গর্বের বস্তু। আহত ডাকাতদের স্বীকারোক্তি আদায় করে ক্রমে ক্রমে ডাকাত দলের সকলকে পুলিশ-বাহিনী গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হল

এর কয়েক বছর বাদে দুর্গাপুজার আগে হঠাৎ একদিন কেদারের নামে এক রেজিস্ট্রি চিঠি এসে হাজির। প্রযত্নে মন্মথনাথ সমাদ্দার। সরকার বাহাদুর কেদারের নামে এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা

করেছেন। সদরে গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসার জন্য মন্মথবাবুকে অনুরোধ করা হয়েছে। কেদারকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুরোধ রয়েছে।

কেদার নিকৃষ্ট জীব। তার জন্য এক হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ তার মনিব মন্মথনাথ সমাদ্দার—যিনি এ অঞ্চলে গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর জন্য কোন পুরস্কার কিংবা সামান্য কৃতজ্ঞতা সূচক বার্তা কিছুই নাই। ফলে তিনি নিজেকে যারপর নাই অপমানিত প্রতিপন্ন করে সরকার বাহাদুরের উপর ভীষণ চটে গেলেন। চিঠির মর্মোদ্ধার করে বকশিসের পরিবর্তে গাল-মন্দ করে পিয়নকে বিদায় করলেন। অতঃপর চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে কেদারের পিঠে গোটাকয় উত্তম-মধ্যম দিলেন। বেচারা কেদার হঠাৎ মনিবের এই আচরণের হেতু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

*　　*　　*

রাজু-পটলা পিঠেপিঠি সহোদর ভাই। ছোট থেকেই ওদের খুব ভাব। এই পাড়াতেই থাকত কেদার—ওদের খেলার সাথী। কেদারের বাবার প্রমোশন হওয়ায় ওরা খুলনায় সদরে চলে গেল। রাজু-পটলা প্রথম প্রথম কেদারের জন্য খুব কাঁদত। একদিন সকালবেলা কেদারদের পরিত্যক্ত বাড়ীর সামনে পাওয়া গেল সাদা রঙের তেজী জাতের এক কুকুরের বাচ্চা। তৎক্ষণাৎ রাজু আর পটল তাকে ধরে নিয়ে বাড়ী চলে এল। বাবা-মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে কুকুরটাকে পুষতে লাগল। বন্ধুর কথা স্মরণে রাখার জন্য নাম দিল কেদার'।

এই সেই কেদার। ডাকাত ধরা এবং পুরস্কার ঘোষণার ব্যাপারটা নিয়ে মন্মথ সমাদ্দার কেদারের উপর সেই যে চটে গেলেন—আর তাঁর রাগ পড়ল না। দিনে দিনে অযত্নে কেদারের শরীর ভাঙতে লাগল। তাছাড়া তার বয়সও হয়েছে। আর আগের মতো শক্তি নেই। রাজু-পটলারা চাকরি নিয়ে কলকাতাতেই বসবাস করে। কখনো-সখনো চিঠিপত্রে তারা কেদারের কথা জানতে চাইলেও বাড়ীর চিঠিতে কোন

কথা জানানো হয় না। এদিকে দিনদিন কেদারের স্বাস্থ্য ভেঙেই চলেছে। এখন আর স্নান করানো হয় না। তাছাড়া শরীরের লোম উঠে স্থানে স্থানে ঘা দেখা দিয়েছে। ফলে গা ভর্তি দুর্গন্ধ। এতে সকলেই বিরক্ত। দূর থেকেই নাকে কাপড় দেয়। দূর দূর করে তাড়ায়। কিন্তু কেদার এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও নড়তে চায় না। দিনের বেলা বাড়ীর এদিক ওদিক ঘুরে রাত্রে যে প্রকারেই হোক বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। বাড়ীর চাকর ফেলুরাম কিছুটা তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়।

এমনি করেই দিন গড়িয়ে চলে। কেদারের অসুস্থতা বাড়তেই থাকে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় ছটফট করে। মাছি-ডাঁশ প্রভৃতি পতঙ্গ ওর ঘায়ে বসে কামড়ে আরও যন্ত্রণা দেয়। তখন ওর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে থাকে। ক্রমশঃ বাড়ীর লোকজন ওর শরীরের দুর্গন্ধে বিরক্ত হয়ে পড়ে। গিন্নী পরামর্শ দেন কেদারকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতে। কর্তা গিন্নীর কথায় সায় দেন। পরামর্শ আঁটেন কি করে কেদারকে বাড়ী থেকে তাড়াবেন।

সে রাত্রিটা ছিল বড়ই দুর্যোগের। আকাশ মেঘলা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামছে। আজ কেদারের অসুস্থতাও চরমে পৌঁছেছে। ক্ষতের যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। কিছুতেই স্থির থাকতে পারছে না। জিভ্ দিয়ে লালা ঝরছে। দু'চোখ বেয়ে নেমেছে—জলের ধারা। যন্ত্রণা চেপে রাখতে না পেরে মাঝে মাঝে চিৎকার করতে চাইছে। তখনই মনিবের খড়ম-পিটুনির কথা স্মরণ করে চেপে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক পায়চারী করছে। এমনিভাবে ঘর-বার করতে করতে এক সময় নাটমন্দিরের কাছে যেতেই কেদারের দৃষ্টিগোচর হল মন্দিরের দরজা ভেঙে চোর ঢুকেছে। ঠাকুরের গয়না হাতাচ্ছে। দুর্ভাগ্য কেদারের, দেহে শক্তি নেই চোরকে মুকাবেলা করার। চিৎকার করে বাড়ীর লোকের ঘুম ভাঙাতেও সক্ষম হচ্ছে না—গলনালী ফুটো হয়ে পুঁজ-রক্ত ঝরছে। অসহায়ভাবে কয়েক মুহূর্ত ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে ছুট দিল। কর্তা মন্মথনাথবাবুর দরজার সামনে

দাঁড়িয়ে শেষ শক্তি প্রয়োগ করে চিৎকার জুড়ল। সেই সঙ্গে ঘা-পূর্ণ যন্ত্রণাকাতর মাথাটা দিয়ে পুনঃপুন দরজায় ধাক্কা দিতে থাকল। কর্তার অনুগত চাকর ফেলুরাম মনিবের নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় কেদারকে তাড়াবার চেষ্টা করল ; কিন্তু তাকে হটানো গেল না। কেদারের গোঙানী শুনে গিন্নীমার ঘুম ভেঙে যেতেই তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—এ তো বড্ড জ্বালাচ্ছে দেখছি, ওর মরণ হবে কবে ?

কর্তার ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি যারপর নাই চটে গিয়ে দরজা খুললেন এবং অস্পষ্ট আলোকে কেদারকে লক্ষ্য করে ডান পায়ের খড়ম ছুঁড়ে মারলেন। তারপর আগামীকাল ভোরে ওকে বাড়ী ছাড়া করার শপথ নিয়ে পুনরায় শয্যায় ফিরে গেলেন।

ভোরবেলা সোরগোলে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হল। শুনে অবাক হলেন গত রাতে চোরে ঠাকুরের অলংকার চুরি করে নিয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ মন্দিরে গিয়ে দেখলেন প্রায় লক্ষাধিক টাকার সোনা-রুপার অলঙ্কার চুরি গেছে। ক্ষুন্নমনে ফিরে আসার পথে তুলসীতলায় দেখলেন কেদার শুয়ে আছে। শরীর স্পন্দন হীন। স্থানে স্থানে রক্তের দাগ জমাট বেঁধে আছে। মস্তকে গভীর ক্ষত। সেখান থেকেই রক্তক্ষরণ হয়েছে। এতক্ষণে স্মরণ হল গত রাতে খড়ম ছুঁড়ে আঘাত করার এই পরিণাম। এও উপলব্ধি করলেন, গত রাতে শুধু শুধু কেদার তাঁর দরজায় হানা দেয়নি—চোর আসার সংবাদ জানাতেই সে অসুস্থ শরীর নিয়ে ছুটে এসেছিল, পুনঃপুন সাধ্যের অতীত চেষ্টা করেছে। কিন্তু তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। উপরন্তু তাঁর আঘাতেই কেদারের প্রাণ বিয়োগ ঘটেছে। আপনজন বিয়োগের মতই এক অব্যক্ত ব্যথায় এবং গভীর অনুতাপে তাঁর হৃদয় দগ্ধ হতে থাকে। তিনি সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ পরিহার করে কেদারের পাশে বসে ধীরে ধীরে ওর মস্তকে হাত রাখলেন। তাঁর আঁখি দুটি অশ্রু-সজল হয়ে উঠল।

———

বৃত্তের ভিতর বাহির

সত্যাদেশ আচার্য্য

অন্ধকারে আলোটা ছিটকে পড়লো।

এদিক ওদিক যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। বাসগুলো মোড় ঘুরাতে লাগলো, দোকান-পাট ঝাটপট বন্ধ হয়ে গেল। সামনে কয়েকটি ছেলে ছোকরা বোমা ছুঁড়ে বিরোধী শিবিরকে তাড়া করছে, "কাকা" নাকি ওদের নেতা।

সেদিন আপনিও তো তাড়াতাড়ি দোকানের ঝাঁপটা বন্ধ করে পালিয়েছিন, কি? বন্ধ করেন নি?

আর আপনি? বলেছিলেন, "টেররিষ্টের দল" খুন—খুন যতসব বাড়াবাড়ি।

আচ্ছা বলুন তো—কিসের ভয়—কার ভয়? আপনি নিজেই কি নিজেকে তিলে তিলে খুন করছেন না? যে সুখ শান্তি, যে স্নেহ প্রেম, ভাব ভালবাসায় আপনার মজ্জাগত অধিকার, সে কি আপনি পেয়েছেন? না পাবেন? তবে ভয় কিসের, বন্দির আবার শৃংখলের ভয়?

পরমাণু একটু অন্যরকমের। ভয়কে সে স্বীকার করে না। তবু সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, পুলিশ তাকে ধরবার জন্য যত্রতত্র সাদা পোষাকে লোক মোতায়েন করছে। ওর স্পষ্ট কোন ছবি পর্যন্ত এখনো পাওয়া যায় নি। পুলিশের কাছে ওর যে বিবরণ আছে তা হ'ল পরমাণু একটি ছদ্ম নাম। আসল নাম সমরজিৎ। রোগা লম্বাটে চেহারা, গায়ের রং ঈষৎ ফর্সা, মাথায় তেল বিহীন ঝাকড়া চুল, দাড়ি-গোঁফ সবে মাত্র উঠেছে, ডাগর ডাগর অনুসন্ধিৎসু চোখ। স্পষ্ট-

বাদি, লেখাপড়া কতদূর তা সঠিক জানা না থাকলেও জানা যায় ছেলেটা দারুণ চালাক ও ভীষণ পরিশ্রমী।

আপনার বাড়ীর রকেই নাকি একদা ও আড্ডা জমাত। আজ সেখানে একটা দোকান করেছেন। ব্যবসা এখন ভালই চলছে। জিনিস পত্রের দাম বাড়লে আপনার মনে আনন্দ হয়। একতলা দু'তলা হয়। ভাড়াটে বসিয়ে ভালই রোজগার। ননবেঙ্গলী বা অফিসবাড়ী হলে, খুবই নির্ঝঞ্ঝাট। গ্রামে জমি বাড়িয়ে আর লাভ নেই। তার চেয়ে এই শহরেই আরও দু'একটা দোকান অথবা লেদ মেশিনের কারখানা করতে পারলে সবচেয়ে ভাল। আপনি এখন এসব নিয়েই ব্যস্ত। আর আপনার ছেলে বা মেয়ে? ওরা আপনার খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়, তাই না? এ অবশ্য আপনার কথা, আমার নয়।

ছেলেটার কি জানি নাম বলেছিলেন? হ্যাঁ, মনে পড়ছে অংশুমান, এই অংশুমান আপনার চালাকি ধরে ফেলেছে, কি নিপুণ কৌশলে ভেজাল মিশিয়ে, ওজনে কম দিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে আখের গুছাচ্ছেন এর সবকিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খ ওর নখদর্পণে। শুধু আপনি কেন আজকাল সে আর ঠিক আগের মত কাউকেই বিশ্বাস করতে পারে না।

ঐ যে রাজনৈতিক নেতারা যাঁরা—আমাদের দেশ চালান, না চালান কেন—শাসন করেন, তাদের কথায় ও কাজের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। যে কাজ যে সময় হওয়ার কথা বা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শেষে দেখা গেল তা আর হ'ল না। ঠিক এই সময় তারা অন্য একটি দ্ব্যর্থক পূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করে জনগণকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিলেন। অথচ চিন্তা করে দেখলে বুঝা যায়—এই আমাদের দেশে কত কি ভাল ভাল উন্নয়ন মূলক কাজ করা যায়—এ ভারত সোনার ভারত গড়ে তুলা যায়। কথা ও কাজের এই ব্যবধান অংশুমানকে ক্রমে ক্রমে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেছে। এরই মধ্যে পরমাণুর বন্ধু বলে অংশুমানকে কয়েকবার পুলিশের হাতেও ধরা পড়তে হয়েছে। কিন্তু তাতে পরমাণু সম্বন্ধে

সঠিক কিছু বলতে পারলো না। বেশ কিছুদিন জেল হাজত কাটিয়ে সম্প্রতি একটি সাম্যবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছে।

আর মনোরমা? অনেকদিন পর একা একা ভারত ভ্রমণ করে বাড়ী ফিরে এলো। সে এখন বুঝেছে জীবন ভোগের, ত্যাগের নয়। যতদিন জীবন ততদিন ভোগ, এ পৃথিবী বিলাসের—সাজানো বাগানে বুক উদোম করে উন্মুক্ত হাওয়া খাও। পাশে নেংটা ছেলেটা ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো তো ওর বয়েই গেল। পায়ের তলায় পড়ে কত পোকা মাকড় মরে যায় না? আমরা কি ওদের জন্য কাঁদি, না ওদেরকে কোন হাসপাতালে নিয়ে যাই, না আমরা চলাফেরা বন্ধ করে দিয়েছি! তবুও কি আমরা কোন পশু-পাখিকে নিয়ে মাতামাতি করি না? কুকুরটা একটু বেশী ঝিমোচ্ছে, হাঁচছে, কাশছে বা পাতলা পায়খানা করলে—অমনি কিড স্ট্রীটে ডাঃ কাটোয়ালের নিকট নিয়ে চল। আসল কথা ভালবাসা। যার যাতে ভালবাসা আছে তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। কি, দেয় না? সেদিন তো এই মনোরমাই এক নাগারে অনেকগুলি ঘুমের বড়ি খেয়ে মরতে বসেছিল। রটে গেল মনোরমা পরমাণুকে নিজের করে নিতে চেয়েছিল। পরমাণু বলেছিল—আমি তোমায় নিতে পারি, তোমাকে কিন্তু আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে।

—কোথায়?

—কলিয়ারির ঘন বস্তিতে, গ্রামের না খাওয়া মানুষের মধ্যে, শহরের কালি, শ্যামা বেশ্যাদের পট্টিতে।

—না, আমি পারবো না। কেউ কারোর ভাগ্যকে ফিরিয়ে দিতে পারে, আমি তা বিশ্বাস করি না। নিজের যদি চুম্বক শক্তি না থাকে ধার করা শক্তিতে বেশী দিন চলতে পারে না।

—মানি, কিন্তু যা সুপ্ত তাকে জাগিয়ে দিতে পারলেই তো আমাদের কাজ শেষ।

এসব নিয়েই নাকি পরমাণুর সঙ্গে মনোরমার বিচ্ছেদের সূত্রপাত।

মনোরমা আর বিয়ে করেনি, হয়েছে ভোগী ভ্রমণ বিলাসী। জীবনের যথেচ্ছ গতিপথে নিজেকে এগিয়ে দিয়ে ঘুরে হোটেলে, ক্যাবারে, পার্কে, ম্যানসানে।

বহুদিন পর জেল থেকে "কাকা" ছাড়া পেল। একটানা অনেকদিন সরকারের খানা খেয়ে এখন পৈতৃক রক্তের কিছুটা ভাটা পড়ে গেল। জীবনের আদিম বৃত্তি সহনশীলতা এসে মনের গতিকে কিছুটা শ্লথ করেছে মাত্র বলা যেতে পারে। আর তার সেই যে বিশ্বাস মানুষ হিসাবে মানুষের মূল্যবোধ তার কিন্তু একটুও পরিবর্তন হয়নি। আর সে জন্যই তখনো পার্টিকে বিশ্বাস করে গ্রামে যায়, মিছিলের কথা ভাবে, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে, কথা কয় ভবিতব্য দেশের কথা।

এখন কিন্তু আমরা বুঝে ফেলেছি—আমরা মানুষ, বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের সকলেরই সমান। তবু একটা প্রতিযোগিতা চলছে তোমাকে পিছনে ফেলে আমি কেমন করে এগিয়ে যাব। কিভাবে আমার পাওনাটা আদায় করে নেব।

সামনের শনিবার ময়দানে বিরাট জনসভা। গ্রামের লোকেরা শহর কাঁপিয়ে দেবে শ্লোগানে শ্লোগানে—আমি আপনি বাড়ীর ঝুল বারান্দায় বসে টিপ্পনি কাটব—কলকাতাও দেখা হ'ল আর কলা বেচাও হ'ল। চিড়িয়াখানা দেখবে না? তা আর বলতে! অথচ ওরাই আমাদের দাবিকে সমর্থন করে, চিৎকার করে, মিছিল করে আমাকে আপনাকে কিছু পাইয়ে দেয়। হায় আমাদের মনোবিকার!

এখন অংশুমানের সময় নেই—কাজ—কাজ—কাজ—

দুপুর গড়িয়ে বিকাল, বসন্ত পেরিয়ে গ্রীষ্ম—বর্ষা—দিন—মাস—বৎসর। মনোরমা এখন বুঝতে পারল সময় কখনো কারও জন্য অপেক্ষা করে না। যে কিশোর ছেলেটিকে সেদিনও রাস্তায় খেলা করতে দেখেছিল সে আজ তার খোকাকে হাত ধরে স্কুলে পেঁছে দেয়; যে ফাঁকা মাঠটায় গরু চরে বেড়াতো সেখানে আজ কো-অপারেটিভের সাততলা বাড়ী হয়েছে। সব থেকেও মনোরমা একা, ভীষণ একা, রাত গভীর সে আরও

একা। যেন ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠে—কে আছো, আমাকে বাঁচাও, এ ভীষণ নির্জন অন্ধকার—একা এখানে বাঁচা যায় না। আমরা কেউ বা ওর কথা শুনতে পাই না, কেউবা শুনেও পাশ কাটিয়ে চলে যাই। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে? এভাবে চলতে পারে না। মনোরমা চোখ মেলে। এই অন্ধকারেই শ্লোগান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটি বিরাট মিছিল। মনোরমা দরজা খুলে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে।

আমরা—জগৎ ও জীবন। বৃত্তের ভিতর ও বাহির। আকাশে নীল স্বপ্ন। দিগন্তে আকাঙ্ক্ষার জ্যোতি ভাস্কর। মুক্তি আমাদের নেই। আমাদের মুক্তি হতে পারে না। এই পৃথিবী বারে বারে তার আষ্টে-পৃষ্ঠে আমাদেরকে জড়িয়ে রাখতে চায়। অংশুমান তুমি কি এখানে আছো?

"কাকা" তুমি? ভাবছো ভারতীয় মানসিকতায় কি ফসল ফলবে? এর স্বরূপ কি? বলতে পারো মানুষ কবে মানুষের মূল্যবোধ ফিরে পাবে। মনে মনে উত্তরটা সাজিয়ে নিই। অবিকল্প সংবাদ-পত্রের ভাষায়—আজকাল পরমাণু আর একা একা ঘুরে বেড়ায় না। সঙ্গী হিসাবে এখন মনোরমাকে পেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যাচ্ছে।

চলুন দাদা—আমরাও একবার আমাদের পৈতৃক গ্রামটা ঘুরে আসি।

———

শকুন

সুনীল পাল

ভুবন আইচ লেখাপড়া বড় একটা করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনক্রমে ম্যাট্রিক পাশ করে '৫২ সালে এপার বাংলায় আসেন। কথায় বলে—সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়। ভুবন আইচ দেখতে সুন্দর। তাছাড়া চেহারার মধ্যেও একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ। তাই এ্যাটকিনসন সাহেবের ওষুধের কারখানায় একটি চাকরি জুটিয়ে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি।

ক্রমে ক্রমে ওষুধের কারখানার মালিক এ্যাটকিনসন সাহেবকে হঠিয়ে নিজেই মালিক হয়ে বসেন। এ্যাটকিনসন সাহেব প্রথমে আদালতের সাহায্য নেন তাঁর হৃত সম্পত্তি ফিরে পেতে। শেষে কোর্টের রায় ভুবন আইচের পক্ষে যাওয়ায় সাহেব মানে মানে অষ্ট্রেলিয়া পাড়ি দেন। সদ্য পাওয়া স্বাধীনতার আমেজের ঘোর তখনও কাটেনি। তাই এ্যাটকিনসন সাহেবকে হারিয়ে ভুবন আইচের জয় ব্রিটিশকে হারিয়ে স্বাধীনতার জয়ের মতই আশ-পাশের লোক মনে করতে লাগল।

এই উচ্ছ্বাসের আর একটা কারণ ছিল। ভুবনবাবু পূর্ব পকিস্থান থেকে আগত গুটিকয় উদ্বাস্তুর চাকুরি সেই ওষুধের কারখানায় করে দিয়েছিলেন এবং এই সুবাদে ভুবন আইচ যে শুধু অন্নদাতা তাই নন, দেশপ্রেমিক হিসেবেও তাঁর একটা প্রচার সেই অঞ্চলে হয়ে গেল।

ভুবন আইচ এখন মালিক। দশ পনেরো বছরে তাঁর অবস্থার বেশ পরিবর্তন এসেছে। মফস্বল. কলকাতায় তাঁর এখন তিনতলা বাড়ি। ঘরে ফ্রিজ, টেপ থেকে কত কি! লাঙ্গলবন্ধে বৃদ্ধ মা-বাবাকে

দেখে ফেরার পথে ঢাকায় সেবার তিনি টি,ভি, দেখে এসে সেকী অনুযোগ! স্ত্রীকে বলে উঠলেন,—জানো মণিকা, পাকিস্থানে টি.ভি. এসে গেছে!

ম—টিবি কি গা?

ভু—তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু!

ম—রাগ করছো কেন? আমি কি তোমার মত একটা পাশ দিয়েছি যে সব কিছু বুঝবো।

ভু—এই একটা কিসের! আমি তো তিন-তিনটে পাশ দিয়েছি।

ম—সে কি গা? সেবার তোমাদের লাঙলবন্ধের বাড়ীতে তুমিই তো তোমার মাকে বললে যে তুমি শুধু একটা·········

ভু—চুপ—চুপ—চুপ। আমি এখন কত বড় হয়েছি না—একটা বললে হয়? বলবে তিনটে, বুঝলে—তাতে আমার সুখ্যাত হবে আর তুমিও গ্রাজুয়েট স্বামীর মান্যি-গণ্যি বৌ হবে!

ম—তাই? তবে এখন থেকে আমি তাই বলবো। হ্যাঁ কি বলবো বললে? গ্রাজুট না কি?

ভু—আরে না না, গ্রাজুট না। ও তোমার মুখে আসবে না! জিভ উল্টে যাবে! তুমি শুধু বলবে তিনটে পাশ।

ম—আচ্ছা তাই হবে। আর ঐ যে বলছিলে টিবি নাকি—টিবি কি গা?

ভু—আরে টিবি না! কি অলক্ষুণে কথা রে বাবা! জানো টিবি মানে রাজরোগ, মানে যক্ষ্মা। টি,ভি—এ হচ্ছে টি,ভি।

ম—ও টি,ভি! তার মানে কি গা?

ভু—তার মানে ঘরে বসে সিনেমা দেখা। ঘরে বসে নাচ-গান শোনা!

ম—বল কি? এই আমাদের ঘরে বসে সিনেমা? কবে আনবে? কখন আনবে? বল না গো!

ভু—আরে সেই কথাই তো বলছিলাম! পূর্ব পাকিস্থানে আজ চার বছর হয়ে গেলো টি,ভি এসে গেছে। আর তোদের মুরোদ হচ্ছে না? এদিকে বড় বড় কথা—এ হচ্ছে, সে হচ্ছে—গুষ্টির পিণ্ডি হচ্ছে! হবে কি করে—সব শালা চোর—এদেশে কিচ্ছু হবে না!

রঙীন টিভির আশায় যখন এরূপ কথাবার্তা চলছিল, হঠাৎ তখন দোরগোড়ে রাস্তায় দুটি গাড়ির একটানা হর্ণের কান ফাটানো আওয়াজ। ছেলেমেয়েদের স্কুলের গাড়ী এসেছে। হতাশ মণিকা নিরাশ কণ্ঠে বলে উঠলো, কি আওয়াজ করে না—কানের পর্দা যেন একেবারে ফেটে যায়। বাপি-মাণি তোদের স্কুলের গাড়ি এসেছে। যা তোরা স্কুলে যা!

স্কুল-ড্রেস পরা বাপি-মাণি ওরফে রাজু আর বীথি দোতলার পড়ার ঘর থেকে গ্যাট্-গ্যাট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ীর গেট পেরিয়ে স্কুলের বাসে গিয়ে বসল।

রোজকার মত তার মা কিম্বা বাবা কেউই তাদের এগিয়ে দিতে এলেন না। বাসে উঠতেই সহপাঠীরা বলল—কিরে রাজু, কিরে বীথি, তোদের মা-বাবা কেউই আজ এল না যে। উত্তরে দু ভাই-বোন শুধু ঠোঁট উল্টে জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

খাবার টেবিলে খেতে খেতে সেদিন ভুবন আইচ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, মণিকা, সব সময় শাড়ি পড়ে থাকবে না তো! লোকজন এলে হাউসকোট পড়বে, বুঝলে?

ম—আমি একদিন পরেছিলাম, গরমে ঘেমে নেয়ে আমার অস্থির অস্থির করে!

ভু—দেখ, খানদানী হতে গেলে একটু আধটু কষ্ট সহ্য করতে হয়। দেখ না উকিল মোক্তাররা গলবন্ধ সহ কোট সারাদিন পরে থাকে! আর শোন—শোবার সময় সায়া-ব্লাউজ-শাড়ি চলবে না। শুধু নাইটি পরবে, বুঝলে?

ম—হ্যাঁ, এটা মন্দ বলনি। লজ্জা লজ্জা করলেও খুব হাল্কা হাল্কা লাগে। আর ওতে তোমারও তো খুব সুবিধে হয়! তাই না?

রাজু ঢুকতেই প্রসঙ্গটি চাপা পড়ে গেল। ভুবনবাবু বললেন, বাপি-মাণি তোমাদের আণ্টিকে হোমটাস্ক দেখিয়েছিলে?

সকালের ঘটনায় ক্ষুব্ধ অভিমানী ভাই-বোন খাবার থালায় মুখ রেখেই বললে: হুঁ।

স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসাসূচক ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে জানতে চাইলে· মণিকাও ইঙ্গিতে জানালো যে, সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

রাজু-বীথি ঠাকুরদা-ঠাকুমার কথা তাদের বাবা-মার মুখে অনেকবার শুনেছে, কিন্তু চোখে কখনো দেখেনি। তাই মাকে রাজু একদিন বলল—আচ্ছা মাম্মি, আমাদের ঠাকুরদা-ঠাকুমা দেশের বাড়িতে পড়ে আছে কেন? ওখানে একা একা থাকতে তাদের কষ্ট হয় না?

রাজুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বীথি বলল—হ্যাঁ ড্যাডি, আমাদের তো কত রুম ফাঁকা পড়ে আছে। ঠাকুমা এলে খুব মজা হবে। আমি তার কাছে কত গল্প শুনব—সেই রাজপুত্তুর, সেই রাজকন্যে—সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি।

মণিকা এসব শুনেই একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন—বড় জ্যাঠামি শিখেছ! সব সময় বড়দের ব্যাপারে কথা বলা! কষ্ট হবে কেন? আমাদের লাঙ্গলবন্ধের সম্পত্তি কি কম? ওখানে ওদের কী অসুবিধে হচ্ছে শুনি?

মায়ের ঝাঁঝালো কথায় রাজু-বীথি মাথা নত করে রইল। ভুবনবাবু অনেকটা নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রায় মিথ্যে কথাই বলে ফেললেন—বাপি-মাণি, আসল কথা কি জানো, তোমাদের ঠাকুমা, ঠাকুরদা ওদেশ ছেড়ে আসতে চান না। সারাটা জীবন তো ওখানেই কাটালেন!

রাতে শুয়ে শুয়ে মণিকা বললেন—দেখ তোমার মা-বাবাকে কিন্তু

এখানে আনা চলবে না। ওসব গেঁয়ো ভূত নিয়ে আমি সংসার করতে পারবো না। নাইটি শিথিল করে স্বামীর বুকের পরে মাথা রেখে মণিকা ফিসফিস করে বলতে লাগলেন—কি গো, তুমি যে কিছু বলছো না! শিথিল দেহ এলিয়ে দিয়ে স্ত্রীর কথায় সায় দিতে দিতে ভুবনবাবুর হাত কখন যে বেড-সুইচের দিকে চলে গেছে বোধ হয় তিনি নিজেও তা জানেন না।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর কেটে গেল। পূর্বপাকিস্থানে তখন জয় বাংলা আন্দোলন। ভোটের পর বাঙ্গালী জাতিকে আর দাবিয়ে রাখা গেল না। সামরিক চন্ডনীতি নেমে এল গোটা পূর্ববাংলার বুকে। গভীর রাতের অন্ধকারে ঢাকা শহরের বুকে বুদ্ধিজীবি হত্যা, ক্যান্টনমেণ্ট দখল, উদ্যোগী সাধারণ মানুষের গণহত্যা, দেশের কোণে কোণে মুক্তিবাহিনীর প্রত্যেককে হত্যার উদ্দেশে ডাইনি খোঁজার মত পিছু-তাড়া-করা, প্রাণ ভয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় পাড়ি দেয়া—সমস্ত ঘটনায় বিশ্বের মানুষ স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে গেল।

সেই দলে দলে পাড়ি দেওয়া হিন্দুদের সঙ্গে ভুবনবাবুর বৃদ্ধ বাবা-মাও এপার বাংলায় এসে হাজির হলেন। ইচ্ছামতীর তীরে টাকির শরণার্থী শিবিরে তখন লোক গিজগিজ করছে। তারই একটি তাঁবুতে সবার সঙ্গে দুই বুড়ো-বুড়িরও কোনমতে ঠাঁই হল। নরকের কথা বৃদ্ধ শুনেছিলেন, কিন্তু নরক যে কী বস্তু এবার হাতে নাতে টের পেলেন।

অবস্থা দেখে একদিন বুড়ি বললেন, তুমি এহিনে থাকলে আর বাঁচবা না। চারদিক থনে হাগা-মোতার গন্ধে বাইত বাইত আহে। আর এইসব অখাইদ্য কুখাইদ্য খাইয়্যা তুমি মইর‍্যা যাইব্যা। পোলারে তত্তরি চিডি লেইখ্যা দ্যাও—ও আমাগো জানি নিয়্যা যায়। তাছাড়া আমরাতো অহন পাকিস্থান থনে আইয়্যা পড়চি।

পাশের তাঁবুতে মাঝবয়সী এক বিধবা থাকে—তার নাম বিন্দি। সে একদিন বুড়ো-বুড়িকে বলল—তোমার ছাওয়াল থাহে কনে? কিডা

করে? আশেপাশের তাঁবু থেকে জড়ো হওয়া উদ্বাস্তুরা বৃদ্ধ কী উত্তর দেন তার অপেক্ষায় এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

—ছাওয়াল আমার থাহে কইলক্যাত্তা। শুনচি কারখানার মুরুব্বি। তিনকোঠা পাকা বাড়ি আছে। কথাগুলো বলে গর্ব ভরে বৃদ্ধ সেই বিধবা ও অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পাশাপাশি যারা শুনছিল, তারা এক বাক্যে বলে উঠল—তয় আর দেরী করতে আছ ক্যান? ছাওয়ালরে চিডি লেইখ্যা দ্যাও। জানতি পারে নাই, তাই আহে নাই। জানব যহন, তহন তোমাগো লইয়্যা যাইবো। কিচ্ছু ভাইবো না!

সেই রাতেই লণ্ঠনের কাছে ঝুকে বৃদ্ধ তার ছেলেকে চিঠি লিখতে বসলেন এবং পরদিন বিন্দির হাত দিয়ে তা ডাকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু চিঠির কোন জবাব এল না। ভাবলেন চিঠি ঠিকমত পৌঁছায় নাই। তাই পরদিন জরুরী তার পাঠালেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না।

নিজের ছেলের উপর বুড়ো-বুড়ির খুব ভরসা ছিল। তাই বড় মুখ করে সবাইকে ছেলের কথা বলেছিলেন। ধাক্কা খেয়ে দুঃখে অপমানে তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। সবাই বলল—এ্যাহনকার পোলাপান আগের মতন বাপ-মারে আর দ্যাহে না। ঐ যে দশ নম্বর তাঁবুর কুঞ্জি মাসি। ওরও তো এক পোলা কইলক্যাত্তা কাম করে। আয় পত্তরও তো শুনচি ভালই, কিন্তু মা রে দ্যাহে না।

দিন দশেক তাঁবুতে কাটাবার পর একদিন বুড়ি বললেন—শুনচ, আমি কইছিলাম কি—চল আমরা ফির‍্যা যাই আমাগো লাঙ্গলবন্ধের বাইত্তে।

বুড়ো—কিন্তু এহিন থনে তো অহন যাইতে দিবো না। দেহো না কি রহম গোলাগুলি চলতে আচে।

বুড়ি—তা এহিনেও মরুম—ওহিনেও মরুম। তার থনে নিজের ভিড্যায় মরাই ভালা!

বুড়ো—কিন্তু যাইব্যা কি কইর‍্যা। পুলিশ আটকাইয়্যা দিবো না?

বুড়ি—আগো, দালাল ধইর‍্যা যামু—রাইতে—অনেক রাইতে—যহন কাক পক্ষীতেও ট্যার পাইবো না!

স্ত্রীর কথা মত ভুবনের বাবা সেই রাতেই উদ্বাস্তু শিবির ছেড়ে লুকিয়ে চোরের মত দালালের হাত ধরে ইচ্ছামতীর অপর পাড়ে চলে গেলেন। কিন্তু দালালটি ছিল ছদ্মবেশী রাজাকার। সে নদীর ওপারে কিছুটা উজানে যেয়েই পাক-সৈন্যের হাতে দুই মালোয়ানকে ধরিয়ে দিল। অন্ধকার রাতে অসহায় সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে ইচ্ছামতীর তীরে জঙ্গী পাকসেনা গুলি করে মেরে ফেলল। গুলির প্রচণ্ড শব্দে এবং বুড়োবুড়ির শেষ আর্তস্বরে আশপাশের গাছ থেকে রাতের পাখীরা ছটফট করে কোথায় যেন প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল। আর দূরে একটা রাতের কুকুর কান্নার করুণ স্বরে দীর্ঘ সময় ধরে বিলাপ করতে লাগল।

বুড়ো-বুড়ির মৃত দেহ ইছামতীর জলে ভাসতে ভাসতে টাকির শরণার্থী শিবিরের বিপরীত দিকে, যেখানে নদীর ধার ভেঙ্গে খানিকটা ভিতরে ঢুকে গেছে, সেইখানে আটকে পড়ে রইল। ইছামতী নদী বয়ে তখন প্রতিদিন শত শত মৃতদেহ ভেসে আসছে। তাই আটকে পড়া বুড়োবুড়ির সেই দুটি মৃতদেহের প্রতি কারো কোন নজর পড়ল না।

তিন দিন পরে ঘুরতে ঘুরতে কুঞ্জি মাসি বুড়ির শাড়ির রং দেখে বুঝতে পারে এবং লোকজন পাঠিয়ে সনাক্ত করার পর চোখ মুছতে মুছতে বলে উঠল, আহারে মাসিমার বড় সাধ ছিল নিজের ভিড্যায় মরবো! কিন্তু শেষ ব্যালা তাও অইলো না! সবই কপাল। আর কি সতী-লক্ষ্মী আর স্বামী দুইজনে একসাথেই গ্যালো।

তিন-চার দিনে মৃতদেহ পচে ঢোল হয়ে উঠেছে। তাই দাহ করবার মত অবস্থা ছিল না। তাছাড়া ইছামতীর স্রোতে তখন বয়ে চলেছে দিন দিন শত শত পচা দেহ। তবে ব্যাপারটা সরকারী ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছতেই তারা টেলিগ্রাম করে ভুবন আইচকে তাঁর বাবা-মার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দিল।

বাবা-মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভুবন আইচ ফোন তুলে অফিসকে জানিয়ে দিলেন যে তার পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ ঘটেছে। তাই সাত দিন তিনি কারখানায় যেতে পারবেন না। বাবা মার একসঙ্গে মৃত্যু সুতরাং শোকের প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যেও একটা আলাদা ছাপ। ভুবন-বাবুর পরণে রেশমী কাপড়, গায়ে কাশ্মিরী শাল আর হাতে পশমী আসন। মণিকার পরণে গরদের শাড়ি এবং গায়ে দামী কাশ্মিরী শাল। অগ্রাহায়ণের মাঝামাঝি। তাই আসন্ন শীতের প্রকোপে গুরু-দশাগ্রস্ত অবস্থায় তাদের কী অসুবিধা হবে এই ভেবে তাঁরা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

প্রতিবেশী মিঃ মুখার্জী কোল্ড ড্রিংক খেতে খেতে বললেন—আচ্ছা ভুবনবাবু, কি হয়েছিল বলুন তো—একেবারে এক সঙ্গে দুজনে চলে গেলেন—এ তো ভাবাই যায় না।

আর এক প্রতিবেশী মিঃ সেনগুপ্ত সফট ড্রিংক খেতে খেতে সম-বেদনার সুরে বললেন—মিঃ আইচ, আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের নেই। তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার মৃত বাবা-মার আত্মার যেন শান্তি হয়।

আর এক প্রতিবেশী মিঃ বাসু কফি খেতে খেতে বললেন—ব্যাপারটা তো আমাদের মাথায়ই আসছে না যে, কি করে দু'জন লোক এক সঙ্গে মারা গেলেন!

বাবা-মার দেওয়া চিঠির কথা বেমালুম হজম করে পাকা অভি-নেতার মত ভুবন আইচ বলে উঠলেন, ঐ বর্ডার ক্রস করার সময় কল্যাপস করেছে। বয়সও হয়েছিল। তাই······

—কত বয়স হয়েছিল?

—তা আশি তো হবেই।

—ও দেন ইট ইজ হাই টাইম টু লিভ দিস্ ওয়ার্ল্ড।

—হ্যাঁ তাতো বটেই! কিন্তু কি জানেন—মন মানতে চায় না। তা ছাড়া বাবা মাকে দেখতে পর্যন্ত পেলাম না। বলেই রেশমী

কাপড়ের খোট দিয়ে অশ্রুহীন চোখ বার বার শুধু মোছার ভান করতে লাগলেন।

—নো নো, ইউ মাস্ট নট ক্রাই। আফটার অল ম্যান ইজ মরট্যাল।

ভুবনবাবুর সঙ্গে যখন প্রতিবেশীদের এইসব কথাবার্তা চলছিল, রাজু-বীথি তখন তাদের দোতলার পড়ার ঘরের টেবিলের উপর মাথা রেখে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। তাদের ঠাকুরদা ঠাকুমা তাদের বাড়ী আসার সময় দুজনেই পথে একসঙ্গে মারা গেছেন—এ কথা যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না।

মার ডাকে নীচে এসে তারা দেখল বৈঠকখানায় তাদের ঠাকুরদা ঠাকুমার ফটো জাঁকজমক করে মালা-চন্দন পরিয়ে পশ্চিম দিকের দেওয়ালে টাঙ্গানো হয়েছে। বিলিতী ধুনোর মিষ্টি গন্ধে সমস্ত ঘরটি একেবারে ভুর ভুর করছে। ঘরে ঢুকতেই মণিকা বললেন—এই তোমাদের ঠাকুরদা ঠাকুমা। রাজু-বীথি ফটোর দিকে তাকিয়ে নিশ্চল মূর্তির মত শুধু তাকিয়ে রইল।

প্রতিদিনের মত প্রসাধন সেরে নাইটি পরেই মণিকা শোবার ঘরে ঢুকল। ভুবন অপ্রতিভ হয়ে বললেন—কি গো, তুমি আজও নাইটি পরেছ না কি? মণিকা বলল—কেন তাতে হয়েছে কি? রাতে তো আর কেউ দেখতে আসছে না আমরা কি করছি! এই বলে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন—হ্যাঁ গো, আমাদের দেশের ঘর-বাড়ী, জমিজমা এখন কি হবে?

ভুবনবাবু দেখলেন অন্ধকারে স্ত্রীর দেহে এক অপার্থিব রূপ। নাইলনেরনীল মশারির নীচে নীল বিছানার চাদরের উপর নীল ঢাকনির 'পরে 'ডিম লাইটের' নীল আলোয় মণিকাকে যেন নীল পরীর মত দেখাচ্ছে। লিপস্টীক মাখানো তার ঠোঁটে নীলচে ছোঁয়া, আই-লাইনার মাখানো তার চোখে নীল ছটা, আই শ্যাডো জড়ানো তার ভুরুতল নীল। এমন কি কণ্ঠলগ্ন অবস্থায় তার নাইটি ভেদ করে উপচে পড়া স্তনের বোঁটায়ও কেমন যেন নীলচে ভাব।

এক রাশ নীল চুলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসরত মণিকার কানে কানে ভুবন মদির আবেশে বলতে লাগলেন, জানো মণিকা, তুমি খুব ভাগ্যবতী! শ্বশুর শাশুড়ীর কোন খিদমত তোমাকে খাটতে হল না—অথচ তাদের সমস্ত সম্পত্তি তুমি অনায়াসে পেয়ে গেলে, সম্পত্তি নেহাত কম হবে না; লাখ পাঁচেক তো বটেই। এই একটা ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে আমার কিছু খটমট চলছিল! আজ আপনা থেকেই সব মিটে গেল।

মণিকা কোন কথা না বলে শুধু ঘন ঘন শ্বাস নিতে লাগলেন। বুঁদ হয়ে যাওয়া মাতালের মত ভুবন ঝলকে ঝলকে মদিরা প্রাণ ভরে পান করতে লাগলেন। বাইরে তখন অমাবস্যার ঘন অন্ধকার। বোধ হয় এই লজ্জা প্রকৃতিও সহ্য করতে পারছিল না। তাই চার দেওয়ালের এই কলঙ্ক ময় গোপন কথা গোপনে ঢাকার জন্যই তার এই অন্ধকার পলেস্তারা।

দেখতে দেখতে শ্রাদ্ধের দিন ঘনিয়ে এল। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি। শীত বেশ জাকিয়ে বসেছে। অ্যাটকিনসন সাহেবের কারখানার বর্তমান মালিক ভুবন আইচের বাবা-মার যৌথ শ্রাদ্ধ-শান্তি। শ্রাদ্ধ তো নয়, যেন আগের দিনে রাজ রাজাদের রাজসূয় যজ্ঞ। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব—কারখানার কর্মচারী—সব মিলিয়ে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাপিয়ে গেল।

মালিকের বাপ-মার শ্রাদ্ধ বলে কথা। তাই তিনতলা বাড়ীর দেড় হাজার ফুট ছাদের পরে সামান্য একটু অংশ বাদ দিয়ে প্যাণ্ডেল খাটানো হয়েছে। সেইখানেই সব খাওয়া দাওয়া হবে। এমন সাজানো গোছানো পরিপাটীপূর্ণ আলো ঝলমল প্যাণ্ডেল এর আগে এ তল্লাটে কেউ কখনো দেখেনি।

ভোজ পর্বের দিন সকাল থেকেই লোকজনের আগমন শুরু হল। ধার্মিকের পোশাকে ভুবন আইচ এবং যোগিণীর বেশে তাঁর স্ত্রী মণিকা হাত জোর করে সবাইকে স্বাগত জানাতে লাগলেন। আর অন্যান্য

সমস্ত ব্যবস্থা তদারক করার জন্য রয়েছে অসংখ্য লোক লস্কর। সকাল থেকেই বৈঠক শুরু হয়ে গেল।

ভুবন আইচের বাড়ীতে যখন সব লোকজন চর্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয় কব্জি ডুবিয়ে খাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ইচ্ছামতী নদীর ধারে তাঁর বাপ-মার পচা-গলা মরদেহ কুরে কুরে খাচ্ছিল এক পাল শকুনের দল। নাড়ী-ভুঁড়ি সহ শব দুটো খেতে খেতে শকুনগুলোর ঠোঁটে, মুখে, পাখনায়, পায়ের নখেতে পচা মাংসের অংশ লেগে এক বীভৎস রূপ ধারণ করল। তবু সেই শকুনের দল কখনো উড়তে উড়তে কখনো বা নাচতে নাচতে সেই শব দুটোর কঙ্কাল ভেদ করে খিলু মজা পর্য্যন্ত খেতে লাগল। বিরাট ভোজের পর শকুন দলের সে কি নাচন-কোঁদন।

হাজার হাজার শকুনের মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ শকুন আকাশের বুকে বায়ু তাড়িত হয়ে ভুবন আইচের ছাদের উপর এসে হাজির। পাকা পোক্ত প্যাণ্ডেলের ত্রিপলের উপর প্রথমে সে এসে বসল। প্যাণ্ডেলের উপর কি একটা পড়েছে ভেবে নীচে যারা রাক্ষসের মত খাচ্ছিল, তারা সবাই শশব্যস্ত হয়ে উঠল। তারপরে সেই শকুন উপর থেকে প্যাণ্ডেলের সামনে রাখা ফাঁকা জায়গায় বসতেই ভেতরের সমস্ত লোকের মধ্যে একটা হুলুস্থূল পড়ে গেল।

শকুনের ভয়ে সবাই এদিকে সেদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। খাবার টেবিল ও টেবিল সমেত এ ওর ঘাড়ে পড়ে সেখানে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। অভ্যাগতদের সে কি ভয়াবহ অবস্থা! মরা পচা খাওয়া শকুনের গায়ের দুর্গন্ধে কেউ কেউ বমি করে ফেলল। কেউ বা ভয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে ঠোকাঠুকিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

অতি সাহসী এক যুবক শকুনকে তাড়া করতে গেলে সেই শকুনও ডানা মেলে ঠোঁট ফাঁক করে গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ শব্দ করতে করতে তার দিকে তেড়ে এল। মহিলারা প্রাণ ভয়ে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কেউ চেয়ার টেবিলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কেউ বা বর্জ্য খাবারের টবে

এঁটো-কাঁটার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল। শাল গায়ে এঁটো-কাঁটাযুক্ত দুহাত তুলে প্রাণ ভয়ে যখন "বাবা গো, মা গো" রবে তারা এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা করছিল, তখন এঁটো মুখে তাদের ঠিক শকুনের মতই দেখাচ্ছিল।

প্যাণ্ডেলের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি, চেঁচামেচি পড়ে গেছে। চিৎকার চেঁচামেচিতে রাস্তার এক পথচারী বৃদ্ধ জানতে চাইলেন ব্যাপারটা কী হয়েছে! সিঁড়ি বেয়ে প্রাণ ভয়ে ছুটে আসা—হাতে, মুখে, এমন কি জামা কাপড়ে এঁটো-কাঁটা মাখানো এক ব্যক্তি হাঁপাতে হাঁপাতে অতিকষ্টে বলল—শকুন, মশায় শকুন!

রাস্তার দু'ধারে কাঙাল, ভিখিরি, ভবঘুরের দল অপেক্ষা করছিল ভোজবাড়ীর পরিত্যক্ত খাবারের এঁটো-কাঁটার লোভে। শকুনের কথা শুনতেই কাঙাল ছেলেমেয়ের দল চারদিক থেকে জড়ো হয়ে সেই বাড়ীর দিকে ছুটে গেল। মুখে শুধু এক আওয়াজ—শকুন···শকুন···শকুন।

———

বিবেক সাধু

—শিবানী সোম

ওকালতি করাই বিবেক সাধুর পেশা। নামকরা উকিল, তাই ওকালতিতে তাঁর ভালো পসার। চেহারা সুন্দর, চেহারায় কেমন বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ ভাব। লম্বা, নাক-চোখ টানাটানা, রঙ ফরসা, নাদুস-নুদুস, মাথাভর্তি কোকড়ানো চুল, কথা বলেন কম। ভেবে চিন্তে হাতে কেস নেন। যা নেন সুষ্ঠুভাবে মোকাবেলা করেন। অর্থাৎ মামলায় তাঁর মক্কেল জেতেন। এহেন উকিলকে সহকর্মীরা তো ঈর্ষা করবেনই। অবশ্য এটা আনুমানিক কথা। কারণ, তার শত্রু ছিল কি না তা জানা যায়নি।

আসানসোলে বিবেকসাধুর প্রাচীর ঘেরা দোতলা বাড়ী। সদর দরজা বন্ধ করলে সে বাড়ীতে কারো প্রবেশ করা অসাধ্য ছিল। এক তলায় ভাড়াটেরা এবং দোতলায় বিবেক বাবুরা থাকতেন। ভাড়াটেরা দু' ভাই, দু'জনেই বিবাহিত। ঐ বাড়ীতে আসার পরেই তাঁদের বিয়ে হয়েছে। অনেক দিন তাঁরা মা, স্ত্রী এবং তাঁদের সন্তানদের নিয়ে আছেন। বিবেক সাধুদের সঙ্গে কখনও মনোমালিন্য হয়নি, বাড়ীওয়ালা এবং ভাড়াটেরা সকলেই ভালো, তাই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল।

বিবেক সাধুদের বাবা-জেঠা দুই ভাই। জেঠার কোন সন্তানাদি ছিল না। বিবেক সাধুরা তিন ভাই, তিনজনেই বিবাহিত। জেঠা-জেঠি বিবেককে নিজ সন্তানের মতই ভালোবাসতেন। বাবা মারা গেলে যেমন বিবেক মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধ করেছেন, সেরূপ জেঠা মারা গেলেও করেছেন। এমনি ভাবে একদিন জেঠি মারা গেলেন, বিবেকই নিঃসন্তান জেঠির মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধ করলেন।

জেঠির শ্রাদ্ধের ঠিক চার পাঁচ দিন পর বিবেকের উকিল বন্ধুরা টিকিট কেটে এনে নৈনিতালে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তাঁদের পীড়াপীড়িতেই তাঁদের পরিবার সহ উকিল বন্ধুদের সঙ্গে স্ত্রী ও দুবছরের ছেলেকে নিয়ে বিবেক সাধু নৈনিতালে বেড়াতে যান মনের ক্লেশ দূর করতে। যাওয়ার সময় ভাড়াটেদের বাড়ীর সকলকে দেখাশোনা করতে বলে যান। তখন তাঁকে ঠিক বিবেকানন্দের মতোই দেখতে লাগছিল। পরনে ছিল তাঁর সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী।

তাঁরা নৈনিতালে পেঁছে একটা ভালো হোটেল ভাড়া করলেন। বেশ কাটলো তাঁদের, দু'দিন হৈ চৈ করে, ঘুরে ফিরে। কিন্তু বিবেক একটু মনমরা ছিলেন। সম্ভবতঃ জেঠির জন্য তাঁর মন খারাপ, তাই তিন দিনের দিন তিনি সকলকে বললেন—আমি যাবো না, আমার মন, শরীর দুইই খারাপ, তোমরা সকলে ঘুরে এসো।

টেবিলে তাঁর খাবার ও জল ঢাকা ছিল। দলের সঙ্গে চলতে চলতে বিবেক সাধুর স্ত্রী এবং তাঁর এক বন্ধুর স্ত্রী পিছিয়ে পড়েন এবং সেই মহিলার মেয়ের পারখানা পাওয়াতে তাঁরা হোটেলে ফিরে আসেন। ভেজানো দরজা খুলে দেখেন বিবেক অচৈতন্য ভাবে শুয়ে রয়েছেন, ডাকাডাকিতেও কোন সাড়া দেন না। এদিকে অন্য সঙ্গীরাও তাঁদের না দেখতে পেয়ে ফিরে এসেছেন। বিবেকের বন্ধুরা তাঁকে এমত অবস্থায় দেখে সেখানের হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন এবং বলেন, সেরিব্রাল অ্যাটাকেই নাকি তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। তাঁকে দাহ করে, হাসপাতালের সার্টিফিকেট নিয়ে তাঁরা হোটেলে ফিরে আসেন এবং পরের দিন আসানসোলে ফেরার জন্য সকলে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রওনা দেন। ফিরে এসে শুনতে পান বিবেক সাধু নাকি মৃত্যুর দিন এক উকিল বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বলেন, তাঁর মাকে তিনি দেখতে এসেছেন। বন্ধু অবাক হয়ে বলেন—তুমি না নৈনিতালে গিয়েছিলে? এরই মধ্যে ফিরলে কি করে? উত্তর না দিয়ে বিবেক সাধু স্মিত হেসে চলে গেছেন। সেইদিনই তাঁর ভাইয়েরাও তাঁর ডাক শুনে দোতলার

ব্যালকনিতে গিয়ে তাঁরা দেখেন সেখানে কেউ নেই। এগুলি সত্যি কি মিথ্যে বা কাকতালীয় সে পরের কথা।

এদিকে বিবেকের মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ছেলের বৌকে বলেন—বৌমা, আমার বিবেককে তুমি কোথায় রেখে এলে? এ কথা শুনে বাড়ীর সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বিবেক সাধুর শ্বশুর-শাশুড়ি এলেন নাতি ও মেয়েকে নিতে। বিবেকের দু বছরের ছেলে বায়না ধরলো—মা সিঁদুর পরো, সিঁদুর পরো। সবাই পরেছে, তুমিও পরো। বিবেকের শ্বশুর কেঁদে নাতিকে বললেন—ওরে দাদুভাই, আমার ছবি আর কোনদিন সিঁদুর পরবে না। বাড়ীর সকলেই এতে কেঁদে ভাসালেন। সমস্ত কাজ শেষে মেয়ে ও নাতিকে নিয়ে বিবেকের শ্বশুর-শাশুড়ী চলে গেলেন কলকাতায়।

কিন্তু মৃত্যুটা স্বাভাবিক না রহস্যজনক, না কাকতালীয়? কারণ, জেঠির মৃত্যুর এক বৎসর কাল পূর্ণ হয়নি। সবে শ্রাদ্ধ শেষ হয়েছে। সেই সুযোগটাই কি বন্ধুরা কেউ নিয়েছিলেন? ভেবেছিলেন তাঁর এ সময়ে মৃত্যু ঘটলে কেউ কাউকে সন্দেহ করবে না এই ভেবে যে, জেঠির আত্মাই তাঁর অপত্য স্নেহের বিবেককে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে!

———

আগাছা

—সুজিত মুখোপাধ্যায়

বিকেল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বর্ষাকালের প্রথম বৃষ্টি বেশ জোরেই হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে কলকাতার রাস্তায় জল জমতে শুরু করল। মাঝে বৃষ্টি থামার একটু লক্ষণ দেখা দিলেও সন্ধ্যার পর প্রচন্ড ভাবে বর্ষণ শুরু হল।

ড্রইংরুমের মধ্যে বিশ্বম্ভর দত্ত অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন। সংসারের নিয়মানুবর্তিতা তিনি মেনে চলেন এবং সকলকে মেনে চলার শিক্ষা দেন। বিনা প্রয়োজনে রাত্রি ন'টার পর কারুর বাইরে থাকা পছন্দ করেন না। কারণ, সাড়ে ন'টায় ডাইনিং টেবিলে সকলে উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আজ রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা তবুও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রমেন এখনও বাড়ী আসেনি। তাঁর জেষ্ঠ পুত্র সৌমেন তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। স্ত্রীও অনেকবার বুঝিয়েছেন যে, বৃষ্টির জন্য আসতে পারছে না। কিন্তু বিশ্বম্ভরবাবুর এক কথা—কেন দেরি হবে!

বাইরে গেট খোলার আওয়াজ হল। সম্পূর্ণ ভিজা অবস্থায় রমেন বাড়ী ঢুকলো। ঘরের মধ্যে যেন বোমা ফাটলো—বিশ্বম্ভরবাবু ভীষণ রেগে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—বৃষ্টির জন্য ট্রাম বাস পাওয়া ভীষণ মুস্কিল, অনেক কান্ড করে এসেছি।

—আমার মাথা কিনেছো। বেরিয়েছিলে কেন?

রমেন মাথা চুলকে বলল—যখন বেরিয়েছিলাম তখন বৃষ্টি ছিল না।

বিশ্বম্ভর ধমকে উঠে বললেন— তর্ক কোর না।

ব্যাপারটা বেশীদূর যাতে না গড়াতে পারে সে জন্য সৌমেন রমেনের হাত ধরে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল। জামাকাপড় ছেড়ে তাকে তাড়াতাড়ি ডাইনিং টেবিলে আসার পরামর্শ দিল।

বিশ্বম্ভরবাবুর অন্য ছেলে এবং মেয়ে সবাই কৃতি। বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়র। বড় মেয়ে এম,এ পাস এবং তার বিয়ে হয়েছে ডাক্তারের সঙ্গে। ছোট মেয়ে ডাক্তারি পড়ছে। বিশ্বম্ভরবাবু নিজে আই, এ, এস। ছোট ছেলে রমেন কোন রকমে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলেও এমন নম্বর পেয়েছিল যাতে কোথাও ভর্তি হতে পারলো না। এখন করসপণ্ডেণ্ট কোর্সে ভর্তি হয়েছে।

রাত্রে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে বিশ্বম্ভর ছোট ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছিলেন। স্ত্রীকে কোন কথা বললে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায় না। অথচ এভাবে ছেলেটা বেকার সময় নষ্ট করবে এটাও মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর বংশে এরকম একটি অপদার্থ সন্তান! নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন—"আগাছা"।

স্ত্রী জেগেই ছিলেন এবং বিরক্তভাবে বললেন—আবার কি হ'ল?

—কি আবার হবে? তোমার ছোট পুত্র, বংশের মধ্যে আগাছা হয়ে জন্মেছে।

—ছেলে আমার একার নয়। তাছাড়া তুমি কি মনে কর দিনরাত গালাগাল দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

বিশ্বম্ভর ব্যঙ্গ করে বললেন—ছেলে তোমার আর্টিষ্ট হবে! কাজের মধ্যে কেবল ছবি আঁকা আর ঘুরে বেড়ানো। আজকালকার দিনে এ সব অচল।

রমেনকে নিয়ে চিন্তা সত্যিই বোধ হয় অযৌক্তিক নয়। কোন ভাল কলেজে অথবা ইনষ্টিটুটে ভর্তি হতে না পারার অর্থ এই নয়—যে, হাল ছেড়ে দেওয়া। রমেন হয়তো বুঝতে পারে না—অথবা বুঝতে

চায় না। সে ছবি আঁকায় ডুবে আছে। তার ছবিও সব বিচিত্র রকমের। ভাঙ্গা-চোরা কেল্লা অথবা কোন ঐতিহাসিক স্থাপত্যের ভেঙ্গে পড়া কোন অংশের অর্ধ সমাপ্ত ছবি। তাকে প্রশংসা করেন একমাত্র তার মামা অসিত মিত্র। একটা বিদেশী ক্যামেরা উপহার দিয়ে ওর উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। রমেন বুঝতে পারে তাকে নিয়ে তার বাবার দুশ্চিন্তা। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পড়াশোনায় মন দিতে পারে না। করেস্পণ্ডেণ্ট কোর্সে পাস করে তার যে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয় সেটাও সে ভালভাবে জানে। সে কমার্সিয়াল আর্ট নিয়ে পড়তে চেয়েছিল কিন্তু বিশ্বম্ভর বাবু রাজী নন। তার উপর তাকে মাঝে মাঝে এই "আগাছা" বলে বিদ্রূপ করাটা রমেনের কাছে অসহ্য।

রবিবার সকালে ব্রেকফাস্টের সময় সৌমেন জানালো যে, সে তার পরিবার সমেত—অর্থাৎ সে, তার স্ত্রী বিশাখা এবং মেয়ে পিউকে নিয়ে পনের দিনের জন্য রাজস্থান বেড়াতে যাবে। সঙ্গে খোকা অর্থাৎ রমেনকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

প্রস্তাব শুনে বিশ্বম্ভর খুশী হলেন—এ তো ভালো কথা। আর খোকা যাচ্ছে, তোমাদেরও সুবিধা হবে। কারণ, পিউকে দেখাশোনার একজন দরকার। কোন কাজ না করে হাত পা অকেজো হয়ে যাচ্ছে। অন্ততঃ তোমাদের সঙ্গে ঘুরলে ওর অকারণ আড্ডা বন্ধ হবে কিছুদিন। নিজের ভবিষ্যৎ নিজে বুঝতে পারে না।

সৌমেন বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলে—আপনি খোকাকে নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় আছেন বুঝতে পারছি। চিন্তা আমারও হয়। আমি দু-এক জায়গায় বলে রেখেছি। মনে হয় ট্রেনি হিসাবে সুযোগ পেয়ে যাবে। একবার কোন বড় কোম্পানিতে যদি যোগ্যতা দেখাতে পারে তাহলে ওকে নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে না।

—ওকে কোন কোম্পানি নেবে? ওর কোনদিকেই যোগ্যতা নেই।

—বড় এ্যাডভার্টাইসমেণ্টের ফার্মে কমার্শিয়াল আর্টিস্টের সব সময় প্রয়োজন। খোকার আঁকার দিকে যথেষ্ট ঝোঁক আছে এবং

ভালই আঁকে ; চেষ্টা করলে উন্নতি করবে। বিশ্বম্ভর বাবু এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে চান না। রমেনকে নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিল, বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ছোট ছেলেকে তাঁর মনের মত করে মানুষ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিজের কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকায় সেভাবে নজর দিতে পারেননি। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন এ ভাবে ভেঙ্গে যাবে কল্পনাও করতে পারেননি।

রমেন কিন্তু ভীষণ খুশী এবং উত্তেজিত। সে তার পড়ার ঘরে সমস্ত সরঞ্জাম জোগাড় করতে শুরু করে দিল। এই পড়ার ঘরের মধ্যেই তার জগৎ। এর মধ্যে পড়াশোনা ছাড়া ছবি আঁকা এবং ফটো ডেভলপ করার সব কিছু বর্তমান। কারণ, ডেভলপ সে নিজেই করে। রমেন ছবি ভালই আঁকে, কিন্তু সাধারণ ছবি ছাড়া সে অন্য ধরণের কিছু ছবি আঁকে যার বৈশিষ্ট আছে। ঐতিহাসিক স্থাপত্যের কিছু অর্ধভগ্ন অথবা অর্ধসমাপ্ত অংশের ফটো তুলে সেটা এনলার্জ করে এবং চার্ট পেপারে এঁটে দেয় ; তারপর পেন্সিল ও তুলি দিয়ে অর্ধভগ্ন অথবা অর্ধসমাপ্ত ছবির বাকি অংশ খুব যত্ন করে আঁকে। তারপর সম্পূর্ণ কাগজটার ফটো তোলে। যেটা দেখলে ভাঙ্গা অথবা অর্ধ সমাপ্ত অংশ নজরে পড়ে না।

গত বছর দিদি ও জামাইবাবুর সঙ্গে উত্তর ভারতের দিল্লী, আগ্রা ইত্যাদি ঘুরে এসে এই ধরণের বেশ কিছু ফটো ও ছবি তৈরী করেছে। তার বাড়ীর সকলে প্রশংসা না করলেও তার মামা ভীষণ প্রশংসা করেন। খুব গর্ব করে বিশ্বম্ভরবাবুকে বলেন—রমেন কিন্তু দারুণ ছবি আঁকে। ও একটা জিনিয়স—দেখবেন একদিন খুব নামডাক হবে।

বিশ্বম্ভর বাবু রেগে গিয়ে বললেন—জিনিয়স কথাটা যেখানে সেখানে প্রয়োগ করা চলে না। তোমার মত মেনে নিলে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী মানুষ জিনিয়স। ভাগ্নের প্রতি স্নেহ ভালবাসা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু অন্ধ স্নেহ ভাল নয়। তোমার ভাগ্নে আমার বংশে একটি আগাছা।

অসিতবাবু ক্ষুব্ধ মনে চলে আসেন। ভায়ে রমেনকে বলেন—যেমন চালাচ্ছিস চালিয়ে যা। তোর ব্যবস্থা আমি নিশ্চয় করব। আমি প্রমাণ করব, তুই অপদার্থ নয়।

রাজস্থানে এসে রমেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। জয়পুরের কেল্লা, হাওয়া মহল, উদয়পুরের প্যালেস ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থাপত্যের সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। কোন দিকে হুঁশ নেই। ক্যামেরার স্নাটারের আওয়াজ আর পেন্সিলের স্কেচ করার সুক্ষ্ম আওয়াজ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

বিরক্ত হয়ে বৌদি বললেন—ব্যাপার কি বলতো, কেবল এই সব ছবি তুললেই হবে? আমরা যে এখানে বেড়াতে এলাম তার নিদর্শন থাকবে না? আজ আমাদের ছবি তুলতেই হবে।

অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলের ছবি তুলতে হ'ল।

তারপর মাউণ্ট আবু—বিখ্যাত দিলওয়ারা টেম্পলের মধ্যে গিয়ে রমেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল—এত অপূর্ব শিল্পকলা! সে তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কি সম্পদ ভারত বর্ষের স্থাপত্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তার বারবার মনে হতে লাগলো এখানে না এলে তার সাধনা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। রাজস্থানের আরও অনেক জায়গায় বেড়ানো হ'ল। রমেনের আগ্রহের জন্য বাধ্য হয়ে সৌমেন পনের দিনের জায়গায় আরও তিনদিন বাড়িয়ে দিল। অবশেষে ফেরার পালা—অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়ে রমেন কলকাতায় ফিরলো। রাজস্থানের অভিজ্ঞতা ও সঞ্চয় কালাবিলম্ব না করে সে তার কল্পনাশক্তি ও বাস্তবের সংমিশ্রনে নিখুঁত শিল্পীর মত তাতে নতুন রূপ দিতে শুরু করে দিল। কোন দিকে তার খেয়াল নেই। জগতের অন্য কিছুর সঙ্গে তার সাময়িক সম্পর্ক ছিন্ন। অন্যদিকে বিশ্বম্ভর বাবু প্রচণ্ড রেগে আছেন। তিনি ভেবেছিলেন যে কিছুদিন ঘুরে এলে হয়তো রমেনের পরিবর্তন হবে এবং বাস্তব জগতে ফিরে আসবে। কিন্তু সবটাই তার ভুল। রেগে গিয়ে সৌমেনকে বললেন—খোকা

কি নিজের ভবিষ্যৎ বুঝতে পারছে না? তুই তো বুঝিয়ে বলতে পারিস?

—আমি কি চেষ্টা করি না? তবে কি জানেন—চট্ করে পরিবর্তন আসা সম্ভব নয়। ধৈর্য্য ধরে রাখতে হবে।

—কি বলছিস্? বছরের পর বছর বসে কাটাচ্ছে—কোন দিকে হুঁশ নেই, কেবল ছবি আঁকা ছাড়া। আমার ছেলে এত অপদার্থ হবে কোনদিন কল্পনাও করিনি। আর কত ধৈর্য্য ধরব?

ইতিমধ্যে অসিতবাবু এসে হাজির। বিশ্বম্ভর বাবু তাঁকে দেখে ব্যঙ্গ করে বললেন—এই যে শকুনি মামা, ভাগ্নের খবর নিতে এসেছেন। ভাগ্নে আপনার প্রচুর উন্নতি করছে।

অসিতবাবু মৃদু হেসে বললেন—আপনি নিশ্চয় আপনাকে ধৃতরাষ্ট্র ভাবছেন না। যাক্ একটা কাজের কথা বলতে এসেছিলাম। আমার বিশিষ্ট বন্ধু এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভুপেশ চৌধুরী আজ বিকেলে আমার সঙ্গে এখানে আসবেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্য ও শিল্পকলার ওপর গবেষণা করে প্রচুর নাম করেছেন এবং ভারত সরকারের সহযোগিতায় কাজ করছেন। রমেনের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক।

বিশ্বম্ভর বাবু হতাশ ভাবে বললেন—এই সব শিল্পকলা বাদ দিয়ে খোকার মধ্যে বাস্তব চিন্তা আনতে পারলে ওর উন্নতি হতে পারতো। অন্ততঃ নিজের রোজগারের একটা পথ খুঁজে পেত।

বিকেলে ভুপেশ চৌধুরী এলেন—শান্ত, সৌম্য চেহারা এবং অত্যন্ত অমায়িক। বিশ্বম্ভর দত্ত তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তায় বোঝা গেল ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্যের শিল্পকলা ও অনুসন্ধানের গবেষণা ছাড়া তিনি সেগুলো রক্ষা করার কাজেও অগ্রণী। এত ব্যস্ত জীবনেও নতুন কিছুর সন্ধানের প্রচেষ্টা সব সময় করে থাকেন। এক সময় ওঁরা রমেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভুপেশবাবু সময় নষ্ট না করে ওর কাজ দেখাবার আগ্রহ জানালেন।

অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন—চলো রমেন তোমার ছবি দেখা যাক্। আরে এই জন্যেই তো এখানে আসা। রমেন প্রবল উৎসাহের সঙ্গে তার সংগ্রহ দেখাতে শুরু করে দিল। ভুপেশ চৌধুরীর মত বিখ্যাত লোক তার কাছে আসতে পারে এটাই আশাতীত।

ভুপেশবাবু গভীর আগ্রহের সঙ্গে রমেনের কাজ দেখতে লাগলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন—"অপূর্ব"। তারপর অসিতবাবুকে উদ্দেশ্য করে কললেন—এর শিল্পকলা এবং কল্পনাশক্তি দুটোই প্রবল। আর দুটোর মিশ্রণে যে রূপ দিতে পেরেছে সেটা ওর উচ্চ ক্ষমতার নিদর্শন। আপনি ওকে নিয়ে সোমবার আমার অফিসে আসবেন—সঙ্গে অন্ততঃ বারটা ভাল সম্পূর্ণ ছবি।

যথারীতি সোমবার অসিতবাবু ও রমেন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ভুপেশ চৌধুরীর অফিসে সময় মত পেঁাছে গেলেন। দেখে মনে হ'ল ভুপেশবাবু ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ঘরের মধ্যে আরও তিনজন ভদ্রলোক বসে আছেন। ওদের আসতে দেখে বলে উঠলেন—আরে এসো এসো, তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।

অন্য তিন ব্যক্তির সঙ্গে রমেনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল। ওরা প্রত্যেকেই প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের ওপর গবেষণা করছেন। রমেনের সংগ্রহ ও শিল্পকলা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সকলে দেখলেন। রমেনের সঙ্গে নানারকম আলোচনা করতে লাগলেন।

এক সময় ভুপেশবাবু প্রশ্ন করলেন—তুমি কলকাতার বাইরে অর্থাৎ দিল্লী অথবা অন্য জায়গায় কাজ করতে প্রস্তুত আছো? অবশ্য তোমার পছন্দমত কাজই পাবে। ভারতের স্থাপত্য ও প্রাচীন শিল্পকলার ওপর পরীক্ষা এবং গবেষণা। এর জন্য পারিশ্রমিক ভালই পাবে। ভারত সরকারের বেতন খারাপ নয়।

রমেন সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল—সুযোগ পেলে এবং আমার মনের মত কাজ পেলে আমি যে কোন জায়গায় যেতে প্রস্তুত।

—সাবাশ, এটাই আমি চাই। তুমি নিশ্চয় পারবে।

ভুপেশবাবু এস. টি. ডি লাইনে দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হবার পর জানালেন যে, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার বিভাগে তিনি কথা বলেছেন—ওরা সম্প্রতি কিছু পোষ্টের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এবং সাতদিন পরে যোগাযোগ করার দিন স্থির হয়েছে। অতএব দেরী না করে দিল্লী যাবার ব্যবস্থা কর। কার সঙ্গে কোথায় দেখা করতে হবে আমি চিঠিতে সব লিখে দিচ্ছি। সঙ্গে বায়োডাটা এবং এ্যাপ্লিকেশন।

কোথা থেকে কি ভাবে সব যোগাযোগ হচ্ছে রমেন ভাল ভাবে বুঝে উঠতে পারছে না।

বিশ্বম্ভর বাবু সব শুনে কোন মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। কেবল বললেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর—কখনও যেন কারুর দয়া নিয়ে বাঁচার প্রয়োজন না হয়। বিশ্বম্ভর বাবু আসলে খুশী নন—রমেন যে পথে যাচ্ছে তাতে তার বংশের মুখ উজ্জ্বলের কোন সম্ভাবনা নেই।

অসিতবাবু রমেনকে নিয়ে দিল্লীতে পেঁছে গেলেন। ভুপেশবাবুর চিঠি থাকার ফলে ওদের কোন অসুবিধা হয়নি। রমেনের এ্যাপ্লিকেশন এবং বায়োডাটা সব ঠিক জায়গায় জমা হয়ে গেল এবং বোর্ডের সামনে একটা নিয়মমাফিক ইণ্টারভিউ হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ রমেনের কাজ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কলকাতায় ফিরবার পনের দিন পরে রমেন এ্যাপণ্টমেণ্ট লেটার পেল। দশদিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে। কর্তৃপক্ষের লোকের বিশেষ প্রয়োজন বোঝা গেল। সব যেন ম্যাজিকের মত হয়ে গেল। এত দ্রুত সব কিছু পালটে গেল যে, সেটা কেউ উপলব্ধি করতে পারছে না। রমেনের কাছে এটা তার জীবনের প্রথম স্বীকৃতি, এতদিন সে একটা দুশ্চিন্তা ও দোটানার মধ্যে কাটিয়েছে। আজ তার নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়ে গেল। সে সামনে এগিয়ে যাবার পথ খুঁজে পেয়েছে—কোন বাধাই তাকে থামাতে পারবে না। তার সারা জীবনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

দিল্লীতে কাজে যোগ দেবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। রমেনের প্রবল কল্পনাশক্তি ও শিল্পকলা তার যোগ্যতা প্রমাণ করল। কর্তৃপক্ষ তাকে প্রচুর সুযোগ দিয়েছে এবং সে তার সদ্ব্যবহার করেছে।

বিশ্বম্ভর বাবু শূন্য মনে সব কিছু মেনে নিয়েছেন—তার স্বপ্ন কোন দিন সফল হ'ল না। তিনি আর প্রতিবাদ করেন না। রমেনের চলে যাবার প্রায় এক বছর কেটে গেছে। মাঝে একবার ছুটি নিয়ে কলকাতায় ঘুরে গেছে। বাইরে কলিং বেলের আওয়াজে বিশ্বম্ভর বাবুর চিন্তায় বাধা পড়ল। দরজা খুলে দেখলেন পোস্টম্যান। চিঠি নিয়ে ভেতরে এসে কাঁপা হাতে খামটা খুললেন। দিল্লী থেকে রমেনের চিঠি—

শ্রীচরণেষু বাবা,

আপনার টেলিফোন বোধ হয় ঠিক নেই, অনেক চেষ্টা করেও লাইন পেলাম না। আপনি জেনে খুশী হবেন যে, ভারত সরকার আমাকে স্কলারশিপ দিয়ে দুই বছরের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাচ্ছে। এ মাসের পঁচিশ তারিখে যাওয়া—সময় খুব অল্প এবং এর মধ্যে পাশপোর্ট ভিসা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। ইচ্ছা থাকলেও সময়ের অভাবের জন্য আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারছি না।

প্রণাম নেবেন।

—আগাছা—

চাবির খোঁজে

-জ্যোতি ঘোষ

যাব তমলুক। অফিসের একটা জরুরী কাজে।

বিশাল সরকারী বাসটা যখন মেচেদা পেরিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দে সোনাকুড়ির পথ দিয়ে এগোতে থাকল, অভিভুত হয়ে গেলাম। এমন সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়েনি এর আগে।

চারপাশ সবুজে ছোপানো। ধানক্ষেতের মাঝে মাঝে পানের বরোজ। বাঁশঝাড়, কলাবাগান, আম—অশ্বত্থ, তাল—নারকেল—সুপারি গাছে মোড়া কুঁড়ি ফুলের মতো ছোট্ট গ্রাম সোনাকুড়ি। গ্রামের নামও এতো সুন্দর হয়!

কপালের ঘাম ভুরু পেরিয়ে চোখের পাতায় নেমে আসছে। জুন মাসের ভ্যাপসা গরম। বর্ষা এখনো নামেনি। আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখমুখ মুছে বাসের জানালায় ফিট করে রাখলাম চোখদুটি। আর মনে মনে কামনা করতে লাগলাম। বাসটা যেন ধীরেসুস্থে লো-গিয়ারে যায়। এমন ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি, কোথায় দেখতে পাব?

যাহোক, ডিমারীহাটের সংলগ্ন ক্ষেতগুলির সবুজের ঘাটে স্নান করে বাস এসে থামল মানিকতলার মোড়ে। এখানে নেমে রিক্সায় বা পাঁশকুড়া-তমলুকের বাসে তমলুক শহরে যেতে হবে।

মালপত্র সামলে নিয়ে রিকশায় উঠতে যাব, এমন সময় পকেটে হাত দিয়ে চক্ষু চড়কগাছ—আমার সুপার কোয়ালিটি ব্রিফকেসটার চাবি পকেট হাতড়ে পাচ্ছি না! না, পকেটমারি হয়নি। কেননা ট্রাউজারের বাঁ পকেটে মানিব্যাগ ঠিকই আছে, যদিও মানি তাতে সামান্যই। রুমালে মুখ মুছবার সময় ছোট্ট চাবিটা ডান পকেট থেকে অজান্তে পড়ে

গেছে বাসের মধ্যেই। বাস ততক্ষণে অনেকটা পথ হলদিয়ার দিকে এগিয়ে গেছে। আমার মায়ার শরীর জুড়ে এখন কোলাঘাটের হাই-টেনশন তার।

রিকশাঅলার কাছে কখন পেঁীছে গেছি জানি না। দরদর করে শরীরে ঘাম বইছে। এখন উপায়? ব্রিফকেসটা যে ভাবেই হোক খুলতে হবে। লক ভেঙে ফেলে খোলাটা ঠিক হবে না। বড়ো দামী ও শখের ব্রিফকেস। নিশ্চয়ই শহরে ব্রিফকেস কোম্পানীর অনুমোদিত কোনো দোকানে কিছু একটা ব্যবস্থা থাকবে। অফিসেই আগে যাওয়া যাক, সেখানে সহকর্মীদের থেকে কিছু সহায়তা ও পরামর্শ নিশ্চয়ই পাব।

ঘর্মাক্ত মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি দেখে মোড়ের রিকশাঅলা বলে উঠল—কি বাবু, তমলুক যাচ্ছেন তো? কোর্টের কাছে?

আমি ছোট্ট করে জবাব দিলাম, হ্যাঁ। সে তার লুঙ্গি হাঁটুর ওপর দু-ভাঁজ করে ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে রিকশার সীটে বসে পড়ল। ধড়াক ধড়াক করে তার তাপিমারা পক্ষীরাজ নিয়ে এগিয়ে চলল আমার অফিসের দিকে।

সৌজন্য বিনিময়ের পর অফিসের সহকর্মীরা খুবই সহায়তা করলেন। সকলেই প্রায় একবাক্যে বললেন, এমন দামী ব্রিফকেসের চাবিটা হারানো খুবই অবিবেচনার কাজ হয়েছে! কার মুখ দেখে উঠেছিলেন মশাই? দু'একজন অবশ্য বললেন, ভীমার বাজারের দিকে একটা ব্রিফকেসের দোকান আছে। তবে অন্য কোম্পানীর, দেখুন যদি সেখানে কিছু সুরাহা হয়।

মনে একটা আশা নিয়ে আর একটা রিকশা ধরলাম, অফিসের মুখেই। রিকশাঅলা ছেলেটি চৌকশ। সে তার রিকশাটিকে দারুণ সাজিয়েছে। রিকশার হাতলে লাগিয়েছে একগুচ্ছ রেক্সিনের ফিতে আর তিন চাকার প্রত্যেকটির কেন্দ্রে গোলাকার মালা। সীটের নীচে সামনের

দিকে এক নামী অভিনেত্রীর প্রমাণ সাইজের আবক্ষ ছবি। আবক্ষ ছবি বলব না বক্ষ ছবি, সেটা অবশ্য রীতিমতো ভেবে দেখার বিষয়। যাহোক পান চিবুতে চিবুতে এক ঝলক পিক ফেলে চুন লাগানো পানের বোঁটা দাঁতে কেটে ছোকরাটি প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কোথায় যাবেন বাবু।'

আমি তখন তাকে ব্রিফকেসটা দেখিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম। সে মা কালীর মতো জিভ কেটে বলল, এই তো কদিন আগে সে-ই ভীমার বাজারের কোম্পানীর ব্রিফকেসের মেকানিক এসেছিল। তার এক বন্ধুর ব্রিফকেস সারাই হল। এখন আবার মাস খানেক বাদে হয়তো তার শুভাগমন হবে। কলকাতার তালা—মেকানিক তাবু, আমাদের চলে সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ার।

সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ারই হোক কিংবা সার্বিক ইঞ্জিনীয়ারই হোক আমার এখন উপায় কি? আমার মাথায় সাত পাঁচ চিন্তা। এই ব্রিফকেস খোলা না হলে অফিসের কাজ শুরু করাতো যাবেই না, রাতেই বা থাকা-খাওয়া করব কি করে?

রিকশাঅলা ছেলেটি ট্যারা চোখে আমাকে একবার মেপে নিল। তারপর বলল, 'বাবু কিছু মনে না করেন তো বলি। শালগেদ্যার দিকে এক ওস্তাদ চাবির মিস্ত্রী আছে। দারুণ হাত। আপনার ওটা খুলতে পারবে কিনা জানি না, তবে একবার 'টেরাই' তো করতে পারেন?

আমি অগত্যা তার রিকশা চেপে রঘুনাথ জীউর পুরনো মন্দির পেরিয়ে শালগেদ্যার দিকে এগোলাম। রঘুনাথ জীউকে দেখার উপায় নেই মন্দির সংস্কার বিহীন। বাইরে রিকশা থেকেই পেন্নাম ঠুকলাম। এমন বিপদে কখনও কোন মানুষ কোনদিন পড়েছে? হায় কপাল!

গলির প্রান্তে বেশ কয়েকটা এঁদো পুকুর পেরিয়ে রিকশা দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তা সরু—রিকশা আর এগোবে না। আমি রিকশা থেকে নামলাম। ব্রিফকেসসহ, রিকশাঅলাকে অনুসরণ করে হাঁটতে হাঁটতে পেঁছিলাম ছোট্ট এক পুকুরের পারে 'দোলকলমি, ভেরেণ্ডা আর আকন্দের বিচ্ছিন্ন বেড়ার আড়ালে ছোট এক মাটির ঘরে। আমাদের

দেখেই পুকুরের পাড় ঘেঁষে ব্যাঙাচির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলল উদোম গা কয়েকটা ছেলেমেয়ে।

'কত্তা কোথায়?' জিজ্ঞেস করতেই মাথায় কাপড়টা টেনে এক মহিলা বলল, মাছ ধরতে গেছে, কাছেই।' একটা ন্যাংটো বাচ্চাকে ইশারা করতেই সে মিলখা সিং-এর মতো দৌড়ে গেল তার বাবাকে ডেকে আনতে।

খানিক বাদে হাজির হয়ে ওস্তাদ মিস্ত্রী ব্রিফকেসটা ভালকরে দেখতে লাগল। একপাল বাচ্চা কাচ্চা গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে আমাদের। তারা ব্রিফকেস দেখে যেই না তাতে হাত বোলাতে শুরু করেছে, ওস্তাদ 'এই হারামজাদারা' বলে এক হাঁক পাড়ল। আর তক্ষুনি সব আশে পাশে ছুটে পালিয়ে আবার খানিকটা এগিয়ে এসে জুল জুল করে তাকিয়ে ব্যাপার কী ঘটতে যাচ্ছে দেখতে লাগল।

বয়েস হয়েছে ওস্তাদের। বাচ্চাগুলো কোন্ পক্ষের কে জানে। সাদা দাড়ি বুলিয়ে সে বললে, 'শক্ত কাজ বাবু। ওনেক গ্যাঁড়াকল আছে এই লকে। যাক দেখছি।

এই বলে বিবিকে ওস্তাদ মালপত্রের বাক্স দিতে বলল। একটা ছোট্ট ভাইস, একটা উখো আর একটা কৌটোয় বার্নালের কেরোসিনের ল্যাম্প সে বার করলে। চাবির একটা বড়ো রিং বার করে অগুনতি ফুটো করা পাতলা চাবির আকৃতির পাত থেকে সে একটা বেছে নিল মাপসই পাত। তারপর কেরোসিনের ল্যাম্পের শিখায় বারবার পাতটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কালি মাখিয়ে, তারপর আবার লকের ছ্যাঁদায় ঢুকিয়ে বহুক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর উখো দিয়ে এদিক সেদিক ওপর নীচ পাতটিকে ঘষে ঘষে ঘণ্টা খানেক বাদে, ইয়া আল্লা, বলে সে ব্রিফকেসের তালা খুলে দিল। আমার তো ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। যাক, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। কিন্তু ও তো গানের ওস্তাদ নয়, তাই ভর দুপুরেই, এই একটা দেড়টা হবে, চাবির ওস্তাদের কেল্লা ফতে!

ওস্তাদ একটা বিড়ি ধরিয়ে তারপর সুখটান দিতে থাকল। ইতিমধ্যে, আমার হাতে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দিয়েছে সে। আমি নানা

ভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম—না, চাবিটি ঠিকই তৈরী করেছে। বারবার লাগিয়ে দেখলাম, ব্রিফকেসের লক্‌ ঠিক খুলে যাচ্ছে।

এখন পারিশ্রমিকের প্রশ্ন। ইতিমধ্যে একপাল ছেলেপিলে আবার গোল করে দাঁড়িয়েছে চারধারে। তারা আর নড়বে না। রিকশাঅলা আমার হয়ে বলল, 'কতো দেবেন বাবু তোমাকে?'

মিস্ত্রীসাহেব দাড়িতে হাত বুলোয় কি পারিশ্রমিক চাইবে আন্দাজ করতে পারে না। কি ভেবে বলল, 'দেন আপনার যা মর্জি।'

বলে কি, যা আপনার মর্জি! কোম্পানীর মেকানিক হলে ত্রিশ-চল্লিশ টাকার বিল তো করতই। যাক সে নিজে কি বলে তার জন্যই পীড়াপিড়ি করতে লাগলাম।

অনেক ভেবে সে বলল, 'বাবু, মজুরি আর কি চাইব বলুন। আপনি তো বিপদে পড়েছেন, তাই অনেকক্ষণ চেষ্টায় খুলে দিলাম। দ্যান গোটা দশেক টাকা।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে তাই দিলাম। রিকশাঅলা এতো অল্পের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে ফিরতি পথে বলল, একেবারে আহাম্মক বাবু, একেবারে আহাম্মক। দেখছেন তো ওর ঘরদোর আর ছেলেমেয়েদের পোশাক আশাক। ওরা চিরকাল গরীবই থাকবে বাবু।'

এঁদো পুকুরগুলো পার হয়ে এলাম। কি চমৎকার কচুরি ফুল ফুটেছে পুকুর ভর্তি। মনে হয় একদল হাল্কা বেগুনি রঙের পাখি বসে আছে। আর সেই পুকুরের পাড় আলো করে খেলে বেড়াচ্ছে ওস্তাদের ন্যাংটো সরল শিশুরা।

ছোকরা রিকশাঅলার কতোই বা বয়েস! জীবনের কতোটুকুই বা সে বুঝেছে। আমাদের কাছে, যারা টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সুখের চাবি সবসময়েই হারিয়ে যায়। যে চাবির খোঁজ আমরা পাই না। অথচ, এঁদো পুকুরের ধারে বুড়ো ওস্তাদ দোলকলমির আড়ালে তার বিরাট দিল দিয়ে আসল চাবির খোঁজ পেয়ে গেছে।

"সুশিস্মিতা"

—সমীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কটক শহরের রবীন স্‌ কলেজের বিজ্ঞান শাখায় পড়াশ্‌না করে অরিন্দম আর স্‌শিস্মিতা। অরিন্দমের বাবা সঞ্জয় গণেশান এই শহরেই উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। স্‌শিস্মিতার বাবা অনিল রাউত রায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পৈত্রিক বিষয়-আশয়ের মালিক। তাঁর আর্থিক কৌলিণ্যের পাশে সঞ্জয় গণেশান নগন্য ব্যক্তি।

অরিন্দম ছোট থেকেই কবিতা-ছড়া লেখে। কলেজ ম্যাগাজিনের লেখা পড়ে স্‌শিস্মিতা অরিন্দমের প্রতি আকৃষ্ট হল। পরিচয় আগেই ছিল। এখন তা হৃদ্যতায় পরিণত হল। ক্লাস বিরতির সময় চিফ্‌ ক্যাণ্টিনে, লাইব্রেরীতে কিংবা অপরাহ্নে দিঘীর পাড়ে ওদের দ্‌জনকে একত্র দেখা যেতে লাগল। স্‌ন্দরী তর্‌ণী স্‌শিস্মিতার সঙ্গলাভে অরিন্দম গর্বিত। দ্‌-একজন প্রতিপক্ষও জ্‌টে গেল। কিন্তু স্‌শিস্মিতা অরিন্দমকেই অন্‌গ্রহ করল।

ওরা দ্‌জনেই ভালোভাবে বি,এস,সি পাশ করে বের্‌ল। এই সময় অনিল রাউত রায় মেয়ের বিয়ের জন্য ভালো ভালো সম্বন্ধ দেখতে লাগলেন। কিন্তু স্‌শিস্মিতা মাকে জানালো, তার পাত্র ঠিক হয়ে আছে। তাঁরা যেন তার বিয়ের চেষ্টা না করেন। কথাটা অবিলম্বে অনিলবাব্‌র কানে উঠল। তিনি মেয়ের ধৃষ্টতাকে মেনে নিতে রাজী নন। অতএব শ্‌র্‌ হল জেরা এবং স্‌শিস্মিতার গতিবিধির উপর বাধা নিষেধ।

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস অতিবাহিত হল। বসন্তকাল আগত। শাখায় শাখায় ফ্‌লের সমারোহ। ফ্‌লে ফ্‌লে মৌমাছির গ্‌ঞ্জন। মানব-মানবীর হৃদয় কন্দরে প্রেমের ফল্গ্‌ প্রবাহিত। এমন দিনেই

বৃন্দাবনে চির প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালাদের নিয়ে হোলি খেলেছিলেন। শ্রী রাধিকার দেহ ও মনকে রঞ্জিত করেছিলেন। আজ সেই উৎসব। পাড়ার বান্ধবীরা সুশিস্মিতাকে ঘর থেকে টেনে বের করে রঙ মাখিয়ে একসা করে দিল। কিন্তু সে কাউকেই বাধা দিল না। মনে মনে ভাবল, অরিন্দমই তাকে রঙ মাখাচ্ছে। অরিন্দমের জন্য সারাটা দুপুর উন্মনা হয়ে কাটিয়ে বিকাল হতেই আবীর নিয়ে সে পথে বেরুল। আজ সে বে-পরোয়া, কারো বারণই সে শুনবে না।

অরিন্দমও আজ মরিয়া। গত চার মাস সে সুশিস্মিতাকে দ্যাখেনি। অনেক দিনই সুশিস্মিতাদের বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটেছে, কিন্তু দেখা পায়নি। ইতিমধ্যে বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে জেনেছে, অনিল-বাবু মেয়েকে নজর বন্দি করে রেখেছেন। তিনি তার উপরও ক্ষেপে আছেন। বাগে পেলেই শায়েস্তা করবেন। কিন্তু মন মানে না। ভয়ে ভয়ে এই পথে আসা-যাওয়া করে।

মাঝ পথে ওদের সাক্ষাৎ হল। দু'জন দু'জনকে পেয়ে উচ্ছ্বাসিত। ওরা একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা নদীর ধারে চলে গেল। নির্জন নদী তীরে ঝাউ বীথির মাঝে সুশিস্মিতা আবেগ সহকারে অরিন্দমের হাতটা মুঠোয় নিয়ে বলল—অরি, প্লীজ তাড়াতাড়ি আমায় উদ্ধার করো। নইলে আমার মরা মুখ দেখতে হবে।' ওর দু'চোখে অশ্রু টলটল করছে।

অরিন্দম সুশিস্মিতাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল—কেঁদোনা লক্ষ্মীটি! আর কেউ আমাদেরকে আলাদা করতে পারবে না। কথা শেষ করে অরিন্দম সুশিস্মিতার সিঁথিতে সিঁদুরের বিকল্পে আবীর মাখিয়ে দিল।

সুশিস্মিতা তৈরিই ছিল। অরিন্দমের পায়ের উপর আবীর ছড়িয়ে দিয়ে তাকে প্রণাম করল। নির্জন নদী তীরে ওদের ফুলশয্যা পাতা হল। সাক্ষী রইল আকাশের পূর্ণ শশী।

সে রাত্রে সুশিস্মিতাকে নিয়ে অরিন্দম বন্ধু শিবাশীষের বাড়িতে উঠল। পরদিন রেজিস্ট্রি করে বাড়িতে গেল। কিন্তু একদিন বাড়িতে

থেকেই আবার তাকে সুশিস্মিতাকে নিয়ে পালাতে হল। অনিঙ্গবাবুর লোকজন সঞ্জয় গণেশানকে শাসিয়ে গেছে সুশিস্মিতা এবং অরিন্দমকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। অনিলবাবু এ বিয়ে মানেন না। তিনি মেয়েকে অন্য ছেলের সঙ্গে পুনরায় বিয়ে দেবেন।

*　　　　*　　　　*

গত তিন মাস হল অরিন্দম রায় বাহাদুর রোডের এই ছোট্ট ঘরে সুশিস্মিতাকে নিয়ে সংসার পেতেছে। ঘরে আসবাব পত্র কিছু নেই বললেই চলে। ঘরটাও স্যাতসেতে। নাম মাত্র ভাড়ায় এর চেয়ে ভালো ঘর পাওয়া সম্ভব নয়। বাড়ি থেকে আসার সময় সুশিস্মিতা নগদ টাকা কিছু না আনতে পারলেও সঙ্গে কিছু গয়না এনেছিল। অরিন্দমের মা কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন। এই দিয়ে এই ক'টা মাস চলেছে। কিন্তু আর চলার উপায় নেই। এর মধ্যে অরিন্দম চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু চাকরি পায়নি। তবে একটা ওষুধ কোম্পানীতে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভের এ্যাপ্রেন্টিসশিপ করছে। সামান্য স্টাইপেন্ড।

সামনের বাড়ির দোতলায় এক ভদ্রলোক থাকে। নাম বিপুল পাকড়াশী। অরিন্দমের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। মাঝে মধ্যে এ বাড়িতে আসে। অরিন্দমও চাকরির জন্য তার কাছে যায়। বিপুল একটি মাঝারি ধরণের হোটেলের ম্যানেজার। একদিন সে জানাল, তাদের হোটেলে মহিলা রিসিপ্টশনিষ্ট-এর পোষ্ট খালি হয়েছে। স্মার্ট, সুন্দরী, গ্রাজুয়েট এবং ইংলিশ-হিন্দিতে কথাবার্তায় পারদর্শী এমন কোন মহিলা পদটির জন্য আবেদন করতে পারে। মাইনে ভালোই। কিন্তু কিন্তু করে অবশেষে সুশিস্মিতা দরখাস্ত করল। পদটিতে যা যা প্রয়োজন সবই তার আছে। বরং বাড়তি কিছুও আছে। সে টেলিফোন অপারেটিং, টাইপ-শর্টহ্যান্ড ইত্যাদি কাজ জানে।

ইন্টারভিউতে সুশিস্মিতা যোগ্যতার পরিচয় দিল। অলক্ষ্যে বিপুলের সুপারিশও খানিকটা সহায়তা করল। যাই হোক সুশিস্মিতা চাকরিটি পেয়ে গেল। দরখাস্ত করার সময় অরিন্দম কোন আপত্তি

করেনি। কিন্তু চাকরিটি পাবার পর তার মন খারাপ হয়ে গেল। স্ত্রীকে কাজে পাঠাতে তার মন সায় দিল না। তার মনোভাব বুঝতে পেরে সুশিস্মিতা বলল—তোমার ভয় নেই, আমি কারো সাথে পালাব না। মনে রেখ, তোমায় ভালোবেসে বিদেশে এসেছি।

—ভয়ের জন্য বলিনি, তোমার কষ্ট হবে। কলকাতার বাস জার্নি'র ধকল তুমি সইতে পারবে না। তোমার চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া আমার কোম্পানী শিগগিরই আমাকে 'এ্যাবজর্ভ' করে নেবে।

—'এ্যাবজর্ভ' হয়ে গেলে তখন না হয় ছেড়ে দেব'। ছাড়তে কতক্ষণ?

এরপর দ্রুতগতিতে সময় কেটেছে। অরিন্দমের চাকরি পাকা হলেও সুশিস্মিতা চাকরি ছাড়েনি। যৌথ প্রচেষ্টায় ওরা একটা ফ্লাটবাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে উঠে এসেছে। দামী আসবাবপত্রে ফ্লাট সাজিয়েছে। ওদের জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাওয়ায় অরিন্দম আর স্ত্রীকে চাকরি ছাড়তে বলে নি। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ মানেই ভবঘুরের চাকরি। কখনও এ শহরে—আবার কখনও অন্য শহার। দূরে গেলে সেই শহরের হোটেলেই তার রাত কাটে। অতএব স্ত্রী যদি কাজ নিয়ে মেতে থাকে সেই ভালো। স্বামী যখন দিনের পর দিন দূরের শহরে হোটেলে রাত কাটায় তখন একাকী শয্যায় সুশিস্মিতার চব্বিশ বছরের যৌবন হা-হুতাস করে। অরিন্দম ফিরে এলে বলে—'তুমি রিপ্রেজেন্টে-টিভের চাকরি ছেড়ে দাও। এই শহরে ছোটখাট কিছু করো, বাইরে রাত কাটিয়ো না, প্লীজ!'

অরিন্দম আশ্বস্ত করে বলে—"তাই হবে সুশি। এবার এখানে একটা কিছু ঠিকই জুটিয়ে নেব।" কিন্তু বাস্তব বড় রূঢ়।

বিপুল পাকড়াশীর বয়স কত বোঝার উপায় নেই। বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত তাও কেউ জানে না। সুন্দর মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এবং রীমলেস চশমায় তাকে তরুণই মনে হয়। দামী পোষাক-আসাকের সাথে দামী সেন্ট ব্যবহার করে। হোটেলের মালিক কাপুর সাহেবের সে বড়ই প্রিয় পাত্র। তার প্রচেষ্টায় নাকি হোটেলের উত্তরোত্তর

শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এখানে শুধু থাকা-খাওয়াই নয়, অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও আছে। আছে সুন্দরীদের আনাগোনা। ব্যবসার স্বার্থে তারা প্রত্যেকেই বিপুল পাকড়াশীর কৃপাপ্রার্থী এবং আজ্ঞাবহ। এ সব সুশিস্মিতা যে, জানে না তা নয়, তবে সে এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। কারণ, বিপুল আজ অবধি কোন অশালীন প্রস্তাব দেয়নি। উপরন্তু সে তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে। মাঝে মাঝে 'ওভার-টাইমের' বিল পাইয়ে দেয়। মাঝে মধ্যে গাড়িতে লিফ্‌টও দেয়। প্রথম প্রথম আপত্তি থাকলেও ইদানীং সুশিস্মিতার এসব গা-সহা হয়ে গেছে। তবে মাঝে মাঝে বিপুল তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে খুব করে দ্যাখে। তখন ওর মায়াবী দৃষ্টিতে এবং সেণ্টের মিষ্টি গন্ধে সুশিস্মিতার মনটা কেমন অবশ হয়ে যায়।

নভেম্বরের বাইশ তারিখে কাপুর সাহেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাত্রিবেলা হোটেলে ঘটা করে পার্টি হল। হোটেলের সব কর্মচারী ছাড়াও বাইরের বহু অভ্যাগতরা এতে অংশ নিল। আমোদ-প্রমোদের অঢেল আয়োজন। যে যা খুশি খেতে পারে। যাকে খুশি তাকে নিয়ে নাচগান কিংবা হোটেলের ঘরে রাত কাটাতে পারে। অবশ্যই উভয়ের সম্মতিতে। এই প্রথম বিপুল এবং ড্যান্সার লিলির অনুরোধে সুশিস্মিতা সুরার পাত্রে চুমুক দিল। সামান্যই। বিপুল এবং লিলি খেল অনেক বেশি। খাওয়া শেষ করে লিলি বলরুমে গেল। সুশিস্মিতা বাড়ি যেতে চাইল। চলতে গিয়ে সে অনুভব করল তার পা টলছে। বিপুল তাকে ধরে নিয়ে গাড়িতে নিজের পাশে বসাল।

মধ্যরাত্রির কলকাতা। লোকের পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। বিপুলের শরীর সুশিস্মিতার শরীর ছুঁয়ে আছে। উভয়ের শরীরে শুধু সুরার মাদকতা নয়—জেগে উঠেছে সম্ভোগ মদিরার নেশাও।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে সদর রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিপুল বলল—তুমি এখান থেকে এটুকু হেঁটে যাও। এত রাতে আমার সঙ্গে তোমাকে দেখলে অরিন্দম রেগে যাবে, আমাকে ভুল বুঝবে।

—বন্ধুক, আমি এত রাতে একা হেঁটে যেতে পারব না। তুমি আমার সঙ্গে চল।

—কিন্তু............

—বলছি তো তুমি চল।

বাড়ির দরজায় পেঁছে তালা ঝুলতে দেখে বিপুল নিশ্চিন্ত হল। ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—অরিন্দম বাড়ি নেই?

—না, আজ পাঁচদিন হল শিলচর গেছে। এরপর বিকারের ঘোরের মধ্যে সুশিস্মিতা বিপুলের হাত ধরে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

* * *

প্রায় শেষরাতে সুশিস্মিতার ঘুম ভাঙল। বেশবাস অবিন্যস্ত। মত্ত হস্তি যেন কমল বন তছনছ করে গেছে। নেশার ঘোর কেটে যাওয়ায় একে একে সব মনে পড়ছে। তার সর্ব শরীরে ক্লেদের ছাপ। তারই প্রশ্রয়ে বিপুল তাকে উচ্ছিষ্টে পরিণত করে গেছে। অরিন্দমের জন্য তার মন হাহাকার করে উঠল। অরিন্দম তার প্রিয়তম, তার প্রেমের দেবতা। তাকে ভালবেসে সে ঘর ছেড়েছিল, দেশ ছেড়েছিল। কত কষ্ট সয়ে, কত ধৈর্য্য ধরে এই সংসার গড়ে তুলেছিল। ক্ষণিকের মদালসায়—নেশার ঘোরে সে কি ভুল করে ফেলল! এ দেহ-পুষ্পে আর দেবতার পুজা হবে না। তার গর্ভে লালিত হচ্ছে তাদের প্রেমের পারিজাত। নিজের সঙ্গে তাকেও সে কলুষিত করেছে। কিন্তু বিপুলকে সে দোষী করতে পারছে না। তাকে প্রশ্রয় না দিলে বিপুল এতখানি সাহস পেত না। এই শুরু হল। এবার থেকে বিপুল বে-পরোয়া হয়ে উঠবে, তাকে নিয়ে যখন খুশি ছিনিমিনি খেলবে। তার চাকরি নিয়ে, সম্ভ্রম নিয়ে ব্ল্যাকমেল করবে। সে অসহ্য! "হায় ঈশ্বর, এ আমি কি করলাম! এ দুনিয়ায় বিশ্বাস ঘাতকের স্থান নেই।" সুশিস্মিতা চোখের জল মুছে গলায় ফাঁস লাগাল।

———

সারদার ছেলে ভাল নেই

—কল্যাণী চক্রবর্তী

সোনার আংটিতে হীরে বসানো। তাতে সূর্যের আলো সাতখানা হয়ে ঠিকরে পড়ছিল। পাটভাঙ্গা ধুতি-পাঞ্জাবী, পাশে ভি, আই, পি স্যুটকেশ······সব কিছুতে লোকটির বিত্তবানের লেবেল সাঁটা। ধুলো ঘ্যাসের গুড়োর মধ্যে লোকটি চিৎপাত। সন্দীপ দেখে প্রথমে বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। এক সময় ধীরে ধীরে লোকটির পাশে উবু হয়ে বসে। সন্দীপ ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে লোকটির শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কি না। মনে হয় নিথর নিষ্পন্দ। সন্দীপ লোকটার বুকে হাত দিয়ে ধুক-পুক শোনার চেষ্টা করে, এবারও মনে হয় লোকটার দেহে প্রাণ নেই। অসহায় ভাবে পড়ে থাকা সোনার আংটি পরা হাতটা কোলে তুলে নাড়ী পরীক্ষা করে। সাড়া শব্দ পায় না। সাহায্যের জন্য সন্দীপ দাঁড়িয়ে রাস্তার দুদিকে দৃষ্টি বোলায়। বহু দূরে দুজন লোককে যেতে দেখে। আবার লোকটার পাশে বসে। এবার হাঁটু মুড়ে বসে, লোকটার বুকে জোরে জোরে হাত দিয়ে মালিশ করতে করতে বলে, বলেই চলে পাগলের মত··· এই যে দাদা, এই, এই যে শুনছেন, শুনছেন? আপনার বাড়ী কোথায়? কোথায় যাচ্ছিলেন? শুনছেন?

হঠাৎ লোকটা হাঁ করে। বন্ধ চোখ দুটো খুলে যায়। চোখের তারা দুটো যেন কি খোঁজে। সন্দীপের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। মনে হয় মৃত শরীরটায় হঠাৎ কোন অশরীরী আত্মা ভর করেছে। ভয়ে সন্দীপের লোকটাকে ফেলে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিছুটা এগিয়েও যায়। কিন্তু তার বিবেক বাধা দেয়। একটা প্রায় অর্দ্ধমৃত লোকটাকে এমন জনমানব শূন্য রাস্তায় ফেলে

সে চলে যাবে! ভেবে পিছন ফিরে তাকায়। লোকটার হাতের আংটির হীরার দ্যুতি দূরেও সন্দীপের চোখে ধাঁ-ধাঁ লাগায়। কে যেন তাকে আবার ফিরিয়ে আনে লোকটার পাশে।

*　　　*　　　*

মেশিনের আওয়াজ থেমে যেতে সন্দীপ ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকায়। ওর মা সারদা শাড়ীর আঁচলটা টেনে ঘাম মুছতে মুছতে হাঁপায়। বাবার কথা সন্দীপের মনে পড়ে না। ছোট্টবেলা থেকে মেশিনের আওয়াজ আর ক্লান্ত মায়ের দীর্ঘশ্বাস সন্দীপের কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত একটা অভ্যস্ত ব্যাপার। তবুও পড়তে পড়তে ফিরে না তাকিয়ে পারে না। সারদা ক্লান্ত মুখে ম্লান হাসি টেনে বলে—আর পারি না, তোর পরীক্ষা হলে আমার ছুটি।

সন্দীপ উৎসাহিত হয়ে বলে—হ্যাঁ মা, পরীক্ষাটা হয়ে গেলে, যাহোক একটা কাজ জোগাড় করে নেবো। তোমাকে তখন কিছু করতে দেবো না।

সারদা আঁৎকে উঠে বলেন—সে কি দীপু, তুই এম,এ পড়বি না!

—সে পরে ভাবা যাবে। তোমাব বিশ্রাম দরকার।

—না দীপু, তা হয় না। তোকে প্রফেসর হতেই হবে। এই স্বপ্নেই তো আমি উদয়স্ত খাটি। ভালখাবার, প্রাইভেট মাস্টার কিছু দিতে পারিনি, তবুও তুই তো কেনোদিন স্কুলে ফার্স্ট ছাড়া সেকেণ্ড হ'সনি। এমন মেধাবী ছেলে ক'জন মা পায়। তুই যে, সারদা-নন্দন। মিশনের মহারাজের কথা ভুলে গেলি? তোকে মানুষ হতে হবে।

সন্দীপ হাসতে হাসতে বলে—কেমন মানুষ, মা?

সন্দীপ স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে বি,এ পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা খুব ভালও দিয়েছিল; কিন্তু রেজাল্ট এলো ইনকমপ্লিট। কতদিন ধরে কলেজ, ইউনিভার্সিটি, কত লোকের বাড়ী যে, ছোটাছুটি করেছে, তার ঠিক নেই—কিন্তু রেজাল্ট জানতে পারেনি। প্রফেসর কর, সন্দীপকে খুবই স্নেহ করেন। উনি ওকে আবার পরীক্ষা দিতে বলেছেন। রেগে ইউনিভারসিটির বিরুদ্ধে কেস করতে বলেছেন।

দুঃখে, ক্ষোভে, সন্দীপের মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছিল। মুখে কিছু বলেনি, তবে মনে পড়েছে ভারতীয় সংবিধানের চৌদ্দ নম্বর অনুচ্ছেদের কথা। ওর পাশ কমবিনেশানে তো পলিটিক্যাল সায়েন্স ছিল। রাইট টু ইক্যুয়ালটির কথা। 'আইন সমূহ কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার অথবা আইনের সমতার অধিকার।' সব মিথ্যে, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। যার টাকা নেই, যার অন্নের সংস্থান নেই, সে করবে নালিশ! ওসব সংবিধানে যত্নে সাজানো রয়েছে বড়ো লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য।

সন্দীপ কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ঘোরাঘুরি—মানসিক অশান্তি—সব কিছু মিলিয়ে ভীষণ ক্লান্ত ছিল। সংসারের কথা, মায়ের কথা কিছু ভাবেনি। কর স্যারের কথা মত, রাতে বাড়ী ফিরে মাকে বলেছিল, মা, স্যার আবার পরীক্ষায় বসতে বলছেন। কাল ফর্ম ফিলাপ। তোমার কাছে টাকা আছে তো?

—টাকা!

সন্দীপের কি মনে হতে, মায়ের কাছে গিয়ে বসে। আজ মায়ের মুখটাতে ক্লান্তি-ভাবটা খুব বেশী মনে হয়। ও আশংকায় মায়ের কপালে হাত রাখে। সারদা একটু সরে গিয়ে বিমর্ষ গলায় বলে, —আমার জন্যে ভাবিস না দীপু, আমি ভাল আছি। এতদিন জানতাম পরীক্ষায় হয় পাশ করে, না হয় ফেল করে। তোর এ কেমন ধারা ব্যাপার হলো? এমন ভাল পরীক্ষা দিলি, তোকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে! চিন্তায় আমি তো এতদিন কোন কাজ কবতে পারিনি। টাকা আবার কোথা থেকে দি বলতো? তোর এমন হবে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সারদা কেমন আচ্ছন্নের মত বিড়-বিড় করে চলে।

তুই এম,এ পড়বি, কলেজে পড়াবি—এইসব ভেবেই তো আমাব সব খাটা-খাটুনি। আর খাটতে ইচ্ছে করে না।

সন্দীপ মায়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখে গায়ে জ্বর নেই। ভাবে, তবে মার কি হ'ল। ও ছুটে বাড়ীয়ালী মাসিমাকে ডেকে আনে।

মাসিমা খুবই বৃদ্ধা। সারদাকে স্নেহের চোখে দেখেন। উনি সন্দীপের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—ক'দিন ধরেই তো কান্নাকাটি করছে। নাওয়া-খাওয়াও ঠিকমত করছে না। চল্ দেখি।

তারপর ডাক্তার ওষুধ—কোথা থেকে দশ বারো দিন চলে যায়। মা ভাল হয়ে ওঠেন, আবার ঘরে মেশিনের আওয়াজও শুরু হয়; কিন্তু সন্দীপের আর পরীক্ষা দেওয়া হলো না। হলো না মাকে বিশ্রামের ফুরসৎ দেওয়ার। সেই থেকে দু বছরর ধরে সন্দীপ চাকরীর জন্য কত ভাবেই না চেষ্টা করে চলেছে। চাকরী পায়নি। কেউ কেউ উপযাচক হয়ে ব্যবসা করার পরামর্শ দিয়েছে। ব্যবসার কথা সন্দীপও ভাবে। ভাবে কিন্তু চিন্তাটা আর মস্তিষ্ক থেকে বাইরে বেরোনর রসদ পায়নি। তবে মাস দুয়েক হলো তিনটে টিউশনি পেয়েছে। তাও নিজের কেরামতীতে নয়। দু'টো তার দু বন্ধু দিয়েছে, বাকীটা বাড়ীয়ালী মাসিমা ঠিক করেছেন। আজকালকার নতুন ইংরাজী নাকি স্কুল শিক্ষক ছাড়া কেউ পড়াতে পারে না—তাই সন্দীপকে কেউ প্রাইভেট টিউটর হিসেবে ডাকে না। আর ও-তো অর্ডিনারী বি,এ পাশ, উপরের ক্লাসের বেশী টাকার টিউশনীর কথা ভাবতেই পারে না। যা পায় তাও মায়ের হাতে দেওয়া আর হয়ে ওঠে না। প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার জন্য ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পোস্টাল অর্ডার কিনতেই বেরিয়ে যায়।

সেদিন ব্যাংকের পরীক্ষার জন্য রীজনী টেস্টে টিক মারছিল—সময় ধরে। এমন সময় সারদা এসে পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে-ভয়ে বলে, একটা কথা শুনবি?

দেখছো, টাইম ধরে করছি? কি কথা তোমার? ভণিতা করার আবার কি হলো?

সারদা কিছু না বলে, রান্না ঘরে চলে যায়। সন্দীপের কথাটা বলে ফেলেই খুব খারাপ লাগে। জানে তার মা বড়ো অভিমানী। বাইরের জগৎ যতই তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করুক, তাতে তার আঘাত তেমন বাজে না। কিন্তু সন্দীপের একটু রুক্ষ স্বরও তার কাছে খুব

ক্ষুণ্টর। আজকাল সন্দীপ মায়ের সঙ্গে বড়ো বেশী খারাপ ব্যবহার করছে। কেমন খিটখিটে লাগে, কিছু ভালো লাগে না। পৃথিবীর উপর দারুণ আক্রোশে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে সমাজটাকে ভেঙে তছনছ করে দিতে—কিছুই পারে না; পারে শুধু দুর্বল মায়ের উপর চোটপাট করতে। তাই করে। কিন্তু আজ মায়ের জন্য বুকটা ব্যাথায় টনটনিয়ে ওঠে। খাতা বই সরিয়ে রান্নাঘরে আসে। দেখে, জলচৌকিতে বসে উদাস চোখে বাইরে তাকিয়ে আছে—দু'চোখে জলের ধারা। সন্দীপ মায়ের অভিমান ভাঙাবার জন্য চুপি চুপি পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে। মুখে কিছু বলতে পারে না। তবে বুঝতে পারে, মায়ের চোখের জলের সঙ্গে তার চোখের জলও মিশে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ না কতক্ষণ—সারদা, সন্দীপ কেউ বুঝতে পারে না। সারদা অনেক দিন পরে সন্দীপকে ছোট্ট সন্দীপের মত আদর করে গালে চুমু খেয়ে বলে,
—এ মা, এত বড়ো ছেলে কেমন করে কাঁদছে দ্যাখো!

সন্দীপ ভিজে গলায় বলে—আমি তোমাকে শুধু কষ্টই দি। আমার দ্বারা তোমার কোন সাধই পূর্ণ হবে না। আমি অক্ষম, অধম একটা অপদার্থ।

সারদা ছেলের মুখে হাত দিয়ে বলে—অমন বলিস না। আমার খুব কষ্ট হয়। দেখিস তোর সুদিন আসবেই। লক্ষ্মী সোনা আমার, একটা কথা শুনবি?

—বলো।

—বাড়ীয়ালী দিদি বলছিলেন……।

—ও মা, তোমার এখনো অভিমান গেল না? বলোনা কি বলছিলে।

—না, তুই তো আবার এই সব বিশ্বাস করিস না। তাই—!

সন্দীপ হেসে বলে—তোমার ছেলেকে মাদুলী পরাবে? চাকরীর জন্য!

—মাদুলী নয় রে। খুব ভাল একজন জ্যোতিষীর কথা শুনেছি। উপরের দিদি বলছিলেন, 'মাধব, সুরেশ ওদের নাকি ওনাকে দেখানোর

পরে চাকরী, প্রমোশন এই সব হয়েছে। এই জ্যোতিষি অনেক লেখাপড়া জানে। কোন ভড়ং নেই। উনি নাকি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেখেন। আমার ইচ্ছে তোকে একবার দেখানোর। যাবি?

সুদীপ কিছু বলে না, কি যেন ভাবে। সারদা আরও কি সব প্রশংসার কথা বলে চলে, জ্যোতিষের অদ্ভুত দিব্য দৃষ্টি সম্পর্কে। কুপিত গ্রহের প্রতিকার করলে সব ঝামেলা মিটে যায়।

সুদীপ মাকে খুশী করানোর জন্য বলে—আচ্ছা, তোমার যখন এই জ্যোতিষির উপর এত বিশ্বাস, তাহলে চলো, আমার ভবিষ্যৎ শুনেই আসি।

—গেলে আজই চল। দিদি যাচ্ছে।

সাধারণ চেহারা। মাঝ বয়সী ভদ্রলোক। জ্যোতিষী পরিচয় না না দিলে বোঝা যায় না। কোন বিশেষ পোষাক, তিলক বা রুদ্রাক্ষের মালা কিছু নেই। শার্ট-প্যান্ট পরা, মুখে পান। সুদীপের হাতটা অনেকক্ষণ আতস কাঁচ দিয়ে দেখেন, হাতের রেখা টিপে টিপে পরীক্ষা করেন। তারপরে সারদা দেবীকে প্রশ্ন করেন—আপনি তো ওর মা? ছেলের জন্ম তারিখ জানা আছে?

সারদা সুদীপের জন্ম তারিখ, সময়—সব বলে। ভদ্রলোক কাগজে ছক কেটে কিসের অংক করে। দু'একটা বই খুলে কি সব দেখে। তারপর সুদীপকে বলে—বলুন কি জানতে চান?

সারদা বলে—ছেলেটা আমার পড়াশুনায় এমন ভালো, পরীক্ষাও দিল ভাল, কিন্তু রেজাল্টে কিসব গন্ডগোল—জানাই গেল না। ছেলেটার আমার কপালই খারাপ। হবে না—দুঃখী মার ছেলে তো!

সুদীপ মাকে থামিয়ে বলে—ইনকমপ্লিট রেজাল্ট। আর কমপ্লিট হলো না। চেষ্টা অনেক করেছি, কোন লাভ হলো না।

ওর কথার মধ্যেই সারদা বলে—দেখুন, শীগ্গিরই একটা চাকরী পাবে কিনা।

ভদ্রলোক বিড়বিড় করে, চতুর্থ আর দশম নিয়ে সমস্যা। চতুর্থে

কেতু, মঙ্গলের অষ্টম দৃষ্টি—ঝঞ্ঝাট হবে। একাদশ, একাদশে অষ্টম পতির দৃষ্টি। খুব ভাল হবে, তবে, ভোগ রয়েছে। গ্রহরত্ন ধারণ অবশ্যই করতে হবে। হীরা পড়লে খুব ভাল হবে। হ্যাঁ হীরা পরো।

সুদীপ বলে—ক্ষেপেছেন, আমি পরবো হীরা! দেখছেন আমার চটির অবস্থা? চটি কেনার ক্ষমতা নেই, হীরার তো অনেক দাম!

—বিকল্পতে ভাল হবে না। শ্বেতপলা, এ্যকোয়া মেরিন এসবে হবে না। আসলে তোমার আসল হীরারই প্রয়োজন। পরে দেখো, দারুণ ফল পাবে—এটা তোমাকে গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি।

সারদা দুঃখীত মুখে বলে—হীরা কেনার সামর্থ নেই আমাদের।

ভদ্রলোক চিন্তান্বিত মুখে বলে—এটাই তো সমস্যা। গ্রহরত্নের যা দাম—ক'জন তা কিনে পরতে পারে। তবে তুমি মূল ধারণ করে দেখতে পারো। আবার ভদ্রলোক গভীর মনোনিবেশে ছকটি দেখেন। কি সব আপন মনে বলেন। সারদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলেন—আপনার ছেলের হাতে হীরা আপনিই আসবে। আসতেই হবে। মৃতের সম্পত্তি হবে। মস্ত বড়লোক হবে। জীবনে অনেক উন্নতি করবে।

*　　*　　*

সুদীপ কতক্ষণ লোকটার পাশে বসে নিজের কথা ভাবছিল খেয়াল নেই। হাতের ঘড়ির দিকে তাকায়, এগারোটা। সামনে-পিছনে কোন মানুষের চিহ্ন নেই। এই হাইওয়ে রোডটা আধ খাপছা হয়ে বহুদিন হলো পড়ে আছে। রাস্তাটা ঘ্যাস ফেলে করেছে। ঘ্যাসের মধ্য থেকে মাঝে মধ্যে কয়লা কুড়াতে মেয়েরা আসে। মাঝে মধ্যে দু'একজন চাপা পড়ে মারা যায়, তখন আবার ওদের আসা কমে যায়। সুদীপ সকালের দিকে পড়াতে যাওয়ার সময় শর্টকাট করার জন্য এই রাস্তা দিয়ে প্রায়ই যায়। আজ কয়লা কুড়াতে আসা মেয়ে শিশুদেরও দেখা যায় না। লোকটার গায়ে হাত দিয়ে প্রথমে ও চমকে যায়। বুঝতে পারে বেশ কিছুক্ষণ হলো লোকটা মারা গেছে। সুদীপ ভেবে পায় না, এখন ওর কি করা উচিৎ। বাড়ীতে খবর দেওয়ার কথা ভেবে লোকটার

পাঞ্জাবীর পকেটে খোঁজ করে, কাগজপত্র কিছু নেই। একটা রিংয়ে চাবি। চাবিটা দিয়ে স্যুটকেশ খুলে ও হতবাক হয়ে যায়। টাকা, অনেক অনেক টাকা। সুদীপ কল্পনাতেও কখনো এত টাকা একসঙ্গে দেখেনি। কিন্তু ঠিকানা, ঠিকানা তো কোথাও নেই। সুদীপ থানায় খবর দেবে ভেবে উঠে দাঁড়ায়। পরক্ষণে মনে পড়ে, এখান থেকে থানা অনেকটা পথ। খবর দিয়ে ফিরে আসতে প্রায় একঘণ্টা। ততক্ষণে অন্য কোন লোক এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারে। সে কি টাকাভরা স্যুটকেশটা মাড়িয়ে চলে যাবে। স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে চলে যেতে গিয়ে লোকটার দিকে ফিরে তাকায়। হাতের হীরার আংটি চমকায়। লোকটার মুখটা বন্ধ। কিন্তু সামনের দু'টো দাঁতে আলো ঠিকরায়। মনে হয় লোকটা হাসছে। সুদীপের অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত জ্যোতিষির কথা মাথায় খেলে যায়, 'মৃতের সম্পত্তি লাভ।' আংটিটা তার প্রয়োজন। উবু হয়ে বসে লোকটার অনামিকার আংটিটা খোলার চেষ্টা করে। আঙুলটা শক্ত হয়ে উঠেছে, সুদীপ ঘেমে নেয়ে ওঠে, খুলতে পারে না। কিন্তু হাল ছাড়ে না। চেষ্টা করতে করতে নিজের বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ভাবে, কি দোষ, ও তো আর কাউকে খুন করে টাকা ছিনতাই করছে না। এই লোকটার এখন অর্থের কোন প্রয়োজন নেই অথচ তার খুব প্রয়োজন। অর্থহীন লোককে এই সমাজে সবাই রাস্তার কুকুরদের মত দেখে। সৎ সুন্দরের স্থান এখানে নেই। কেউ কারো কথা ভাবে না। তার আজ এই অবস্থার জন্য দায়ী কতগুলো শিক্ষিত লোকের উদাসীনতা। তারা তো ভাবলো না, রোল নং ক্যাল দু'শ একের কি হ'ল ? তখন তো আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করতো। মা'র জন্য পারেনি। আধুনিক সমাজের এই নমুনা। এখানে চিল শকুনের মত লড়াই করে বাঁচতে হবে—না হলে আত্মহত্যা। সুদীপের ছায়াটা এখন একেবারে পায়ের নিচে। মনে ভয়, যদি কেউ এসে পড়ে—কিন্তু আংটি তো খুলছে না। সুদীপ ভাবে, লোকটা মরেও ছাড়ছে না। দূরে কালোমত মানুষের মাথা

কি? সুদীপ উত্তেজনায় কাঁপে। তাড়াতাড়ি খুলতে চেষ্টা করে, পারে না।

সুদীপের মনটা বড়ো নরম। মায়া-দয়াও বেশী। সবাই বলে, সারদার ছেলের মত এমন আদর্শবান ছেলে আজকাল দেখা যায় না। নিজেও কোন কাজ অন্যায় মনে হলে, তা আর করতে পারে না। কোন অন্যায় কাজ করবে ভাবলেই বিবেকানন্দের বাণী ওকে তাড়া করে ফেরে। তাঁর আহ্বান মনে পড়ে—'এসো মানুষ হও।' নিজের মনে, আংটি খোলার চেষ্টা করতে করতে বলে—স্বামীজি, এই পচন ধরা সমাজে তোমার বাণী নিয়ে সুদীপরা হারিয়ে যাবে। তাদের জায়গা আর কি এখানে আছে?

দূরে কালো মাথাটা এবার পুরোপুরি মানুষের অবয়ব নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। সুদীপ উত্তেজনায় জোরে বলে ওঠে—ব্যাটা, আমি থাকতে তুই বড়োলোক হবি—তা হবে না। তাড়াতাড়ি উবু হয়ে লোকটার অনামিকায় প্রাণপনে দাঁত বসায়।

কাটা আঙুলটা দূরে গাছ গাছালীর মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে কাক-শকুনের ঝাপটা ঝাপটি কানে বাজে। নিজের অনামিকায় আংটি গলাতে-গলাতে চোখ যায় মৃত লোকটির আঙুলহীন জায়গায়। ভিতর থেকে বমির মত বিবেকানন্দের বাণী বেরিয়ে আঁসে—'ভবিষ্যতে ভারত প্রাচীন ভারতের চেয়ে অনেক বড় হবে।' হবে হয়তো। সুদীপ স্যুটকেশ হাতে বাড়ীর দিকে দ্রুত এগিয়ে চলে। বাড়ী পেঁছনর মধ্যে আর বাণীগুলো নিশ্চয় বদহজম হয়ে উঠে আসবে—এটাই সুদীপের বিশ্বাস।

———